কবিগুরু গ্যেটে

(চরিতকথা ও সাহিত্য-পরিচয়)

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আবদুল ওদুদ

ভারত সাহিত্য ভবন

২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
ভারত সাহিত্য ভবন
২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩

মূল্য ঃ
প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

বাংলা ১৩৩৬ সালে ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য-সমাজে" গ্যেটে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে এই গ্রন্থে অবতরণিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য গ্যেটের বিরাট জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই কল্যাণীয় আবদুল কাদির যখন ১৩৩৭ সালে তাঁর "জয়তী" প্রকাশ করেন তখন তাতে গ্যেটের কিছু বিস্তৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করি। "জয়তী" বন্ধ হয়ে গেলে "প্রদীপে" ও পরে "ছায়াবীথি"-র কয়েক সংখ্যায় এই লেখা চলে। এই ভাবে ধীরে সুস্থে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত গ্যেটের প্রথম জীবনের পরিচয় একরকম দেওয়া হয়। সেই দিনে ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহোদয় আমার জন্য গ্যেটে সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর সেই প্রীতি আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

প্রায় সাত বৎসর পরে পুনরায় গ্যেটের আখ্যায়িকা আরম্ভ হয়—প্রধানত আবদুল কাদিরের আগ্রহে আর "শিশমহলের" তরুণ সম্পাদকের তাগিদে। "শিশমহল" বন্ধ হয়ে যেতে দেরী হয়নি ; কিন্তু এই মহাজীবনের প্রতি আমার নবীভূত অনুরাগ যে মন্দীভূত হয়নি এজন্য নিজেকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করছি।

গ্যেটে সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোনো গ্রন্থ নেই বল্লেই চলে—তেমন বিস্তৃত আলোচনাও নেই। কিন্তু বাংলার একালের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্যেটের যোগ নিবিড়। বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন গ্যেটের জীবনের সমৃদ্ধি আর রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর যে যোগ তা এত গভীর যে তাকে আত্মিক যোগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মাত্র একজন বড় কবি নন, আমাদের একালের বাংলার বা ভারতের জীবন-সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর সেই সাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে আমাদের অতীত ও বর্তমানের বোধ, ভবিষ্যতের আশা, আর জগতের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ। এ সম্বন্ধে দেশের চিন্তাশীলরা ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছেন। হয়ত সেই চেতনাই আমাকে দুঃসাহসী করেছে একালের ইয়োরোপের ভাব ও জীবন-খনির এই মহামূল্য হীরকের সন্ধানী হতে। এই সুপরিজ্ঞাত ও সুপরীক্ষিত হীরকের সঙ্গে তুলনায় আমাদের নবলব্ধ হীরকের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হবে এই আশায় আমি আশান্বিত হয়েছি ; আর কালে কালে সবাই হয়ত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের যে নবমানবিকতার সাধনা—New Humanism—পাশ্চাত্ত্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল

গ্যেটে, আর প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যার ব্যাপকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে।

এই গুরু ব্রতের উদ্‌যাপনায় যে সামর্থ্যের যোজন দুর্ভাগ্যক্রমে তার অভাব আমাতে যথেষ্ট। জার্মান আমি জানি না, তাতে গ্যেটের মূল রচনার সৌন্দর্য উপলব্ধির ভাগ্য আমার হয়নি। তবু পশ্চাৎপদ হইনি প্রধানত এই মহাপুরুষেরই অভয়দানে—তিনি বলেছেন অনুবাদে যে সাহিত্য মর্যাদাহীন হয় সে-সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়, আর তার সঙ্গে আমার অন্তরের এই প্রত্যয়ে যে এই প্রতিভার প্রতি রয়েছে আমার অশেষ শ্রদ্ধা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুবাদ ও অনুরাগ সাধারণত অবিশ্বাস্য, কিন্তু আসলে হয়ত এ দুটি কম নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা, সত্য দুর্জ্ঞেয়, যা নিয়ে আমাদের কারবার তা মোটের উপর অনুবাদ আর অনুরাগের মতো ব্যাপার। অবশ্য এই অনুরাগের সত্যকার মূল্যও বিবেচ্য, তবে সে-বিবেচনার ভার আমার পরে নয়।

গ্যেটের সাহিত্যেরও পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি কেননা তাঁর জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁর অপূর্বসমৃদ্ধ জীবন আমার স্বদেশীদের সামনে উন্মোচিত করা—সেই জীবন পরমমনোহর রূপ ধারণ করেছে তাঁর সাহিত্যে। সেই জীবনকে খ্যাতনামা দিনেমার সাহিত্যিক ব্রাণ্ডেস (Brandes) বলেছেন উৎকৃষ্টতম মানবতার বিগ্রহ—the incarnation of humanity at its loftiest. বহুদিন পূর্বে কার্লাইল ও এমার্সন এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছিলেন আর একালে ক্রোচেও প্রকারান্তরে এই মত সমর্থন করেছেন। আমরা এই মত পুরোপুরি স্বীকার করি আর না-ই করি এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই যে একালের মানুষের যে ব্যাপক জীবন-বোধ ও বিশ্ব-বোধ তার এক মহা মন্ত্রদ্রষ্টা ও দৃষ্টান্ত-স্থল এই গ্যেটে। পতিত ভারতের সৌভাগ্যক্রমে তারও কোলে একালে এমন দুই জীবনবাদী ও বিশ্ব-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, আর তার দুর্ভাগ্যের বড় কারণ হয়ত এই যে এই বরেণ্য ভারত সন্তানদের নির্দেশ আজো তাঁদের স্বদেশীয়দের অনেকের চোখে পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করেনি। গ্যেটের স্বস্থ ও সবল মুক্তবুদ্ধি হয়ত আমাদের দেশকেও সাহায্য করবে জীবনের দায়িত্ব, প্রতিভা, ধর্ম, স্বদেশপ্রেম, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ ও যোগাযোগ, সব কথাই আরো ভাল ক'রে বুঝতে, যেমন ইয়োরোপের ও আমেরিকার চিৎপ্রকর্ষ তাঁর প্রভাবে লাভবান হয়েছে। বুদ্ধ কবীর আকবর রামমোহন রবীন্দ্রনাথ —ভারতের এই পঞ্চ জাগ্রত আত্মার মণ্ডলে স্থায়ী আসন লাভ করুন ইয়োরোপের জাগ্রত আত্মা গ্যেটে।

যে শক্তিমান জাতির ভিতরে গ্যেটের জন্ম আজ তার গতি হয়েছে তাঁর নির্দেশের বিপরীত পথে। তাঁর স্বজাতির এই দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। জগতে এমন ঘটনা নূতন নয়। ভারতের ঋষি বলেছিলেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, কিন্তু সেই

ভারতে দেখা দিল উৎকট অস্পৃশ্যতা ; মুসলমানের লাভ হয়েছিল এই নির্দেশ—ধর্মে বল-প্রয়োগ নিষেধ, কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে মতের অসহিষ্ণুতা আজো চোখে পড়বার মতো। এই সব অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-বিপত্তির ঊর্ধ্বে সত্য আর সত্যময় জীবনের প্রসন্ন অধিষ্ঠান যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝার দুর্যোগে অবিচলিত সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের মহিমা।

গ্যেটের প্রথম জীবনের কাহিনী তাঁর আত্মচরিত থেকে সংগ্রহ করেছি, আর তাঁর শেষ বয়সের "একেরমান ও সোরে-র সঙ্গে আলাপ" থেকে সংগ্রহ করেছি তাঁর বহু অমূল্য বাণী। তাঁর যেসব চরিতকারের সাহায্য গ্রহণ করেছি তাঁদের নাম গ্রন্থমধ্যে সসম্মানে উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে লুইস (Lewes) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক, আর সবাই একালের লোক। কিন্তু পুরাতন হলেও লুইসের গ্রন্থ আজো মূল্যবান। ব্রাণ্ডেসের গ্যেটে-চরিতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পরে তথ্যের দিক দিয়ে লুইসের মূল্য হয়ত কিছু হ্রাস পেয়েছে কিন্তু বিচারের দিক দিয়ে নয়। হিউম ব্রাউন (Hume Brown) বেশ সরল সহজ। পল কেরাসের (Paul Carus) বইখানি বহু-চিত্রভূষিত, গ্যেটের বহু কবিতার অনুবাদও তাতে রয়েছে। রবার্টসনের (Robertson) দুইখানি গ্রন্থই কতকগুলো প্রবন্ধের সমষ্টি, তাঁর Goethe in the Twentieth Century বইখানি আমার বেশী কাজে লেগেছে। লুড্‌ভিগের (Ludwig) গ্রন্থ বোধ হয় সব চাইতে জনপ্রিয়। তা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তাঁর মত সব সময়ে গ্রহণ করতে পারিনি। মনে হয়েছে তিনি কিছু বেশী তত্ত্বপ্রিয়। ক্রোচের (Croce) বইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু বিচারের পরিচ্ছন্নতায় সব চাইতে মূল্যবান। এক হিসাবে তাঁর গ্রন্থ লুডভিগের গ্রন্থের প্রতিবাদ। লুডভিগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গ্যেটের জীবনে প্রায় চিরকাল ধরে চলেছে দেবাসুরের তীব্র সংগ্রাম, কিন্তু ক্রোচে দেখাতে চেষ্টা করেছেন : গ্যেটের প্রতিভা অল্প বয়সেই এক অসাধারণ সমুন্নতি লাভ করেছিল আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল—সংগ্রাম এক হিসাবে চিরকালই তাঁর জীবনে চলেছিল কিন্তু অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের পালার অবসান হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। গ্যেটের জীবনের ঘটনা পরমঅর্থপূর্ণ হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত এই মতের উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজসাহী কলেজ গ্রন্থাগার ও কতিপয় বন্ধুর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ও সহৃদয় বন্ধুবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি। জার্মান গ্রীক প্রভৃতি নামের প্রতিলিখনে যথাসম্ভব ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবর্তী হয়েছি। তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

বইখানি যাঁদের কাছে আকারে বড় মনে হবে তাঁরা এটি ধারাবাহিকভাবে না

পড়ে যখন যেখানে খুশী পড়তেও পারেন। ভলটেয়ার তাঁর এক বড় বই এইভাবে পড়বার জন্য পাঠকদের আহ্বান করেছিলেন। আমি আহ্বান করছি আমার নিজের কৃতিত্বের স্পর্ধায় অবশ্য নয়—কেননা এ ক্ষেত্রে আমি মুখ্যত আহরণকারী—আমার বিষয়টি অসাধারণভাবে সারবান ও রসাল এই ভরসায়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

পুনশ্চঃ—স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় মূল "প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানে"র একটা বড় অংশের সঙ্গে আমার অনুবাদ মিলিয়ে দেখেছেন। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জার্মান প্রাইমারে"র লেখক কবিবৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস মহাশয় অশেষ শ্রম স্বীকার করে মূল "ফাউস্‌ট" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, "প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানে"র অবশিষ্ট অংশ আর "অনুরাগত্রয়ী"র সঙ্গে আমার অনুবাদ মিলিয়ে দেখেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বত্রই মাজাঘষার প্রয়োজন হয়েছে খুব কম। এই সহৃদয় বন্ধুরা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। বন্ধুবর হরগোপাল মূল বইগুলো সংগ্রহ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর লেভি ও কলিকাতা-প্রবাসী জার্মান-দন্ত-চিকিৎসক ডকটর পল এম্ ডক্‌টরের গ্রন্থাগার থেকে। এঁদেরও ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি।

ফাল্গুন, ১৩৫১

সূচী

চিত্র-সূচী

অবতরণিকা

ক্রোচে তাঁর 'গ্যেটে' গ্রন্থে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার-বিশ্লেষণের পরে বলেছেন : সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমবর্ধনের ধারায় গ্যেটের কি স্থান তা নির্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য এই অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি, কারণ, তাঁর মতে, প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান, পরে পরে যাঁরা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নতুন-কিছু সৃষ্টি করেন আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারীর স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নেই। তবু তিনি স্বীকার করেছেন :

> গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যবিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবোধ চিত্তে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল আধুনিকতার বহু দিক।

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর Hero and Hero-worship গ্রন্থে Hero as man of letters অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন আর গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়, যে মরুভূমির মহামানবের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেও গ্যেটের প্রতিভা যে উচ্চতর গ্রামের, এসব কথা বলবার পর বলেছেন—গ্যেটের কথা থাকুক, আপাতত কেউ তাঁকে বুঝবে না, এই বলে তিনি রুসো বার্নস্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য কীর্তনে মনোনিবেশ করেছেন।—কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে আধুনিকতার—modern spirit-এর—এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি বুঝতে পারলে গ্যেটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance-সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন ইয়োরোপের রেনেসাঁস (নবজন্ম) কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ঘটনা, বহু লক্ষণের দ্বারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দের কাহিনীই নয় তার সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্যতাও—টলস্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতকগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ তর্জনী নির্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে রেনেসাঁস-কাহিনী মোটের উপর মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্রের শ্যামশ্রী-ভূষিত হবার কাহিনী, মানুষের মর্ত্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুখ-সম্ভোগের এক মধুর গভীর কাহিনী। কিন্তু এই রেনেসাঁস-পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালী ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্মানী তা থেকে বহুদিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্মান্দোলন—Reformation—আপাতদৃষ্টিতে যা বহুদিক দিয়ে রেনেসাঁসের বিপরীতধর্মী। অষ্টাদশ

শতাব্দীর জার্মানীর যে Classicism—প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা—তারই সঙ্গে বরং রেনেসাঁসের আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মানীর এই প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের পরিচয় লাভের চেষ্টা তার পূর্ববর্তী ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলনের বিপরীতধর্মী বোধ হলেও আসলে এটি রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এক সমন্বয়। এই প্রাচীন-গ্রীকশিল্পের পুনরুজ্জীবনবাদীদের সৌন্দর্যানুরাগ রেনেসাঁসের কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের। এই পুনরুজ্জীবনবাদীদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক লেসিঙের (Lessing) একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। শিল্পতত্ত্ব বোঝার জন্য তিনি লিখেছিলেন 'লাওকোওন' (Laokoon)—এক জগদ্বিখ্যাত বই যদিও আকারে ক্ষুদ্র—তিনিই বলেছিলেন :

> ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণজ্ঞান অন্য হাতে প্রযাসের অনন্ত দুঃখ এই দুটি নিয়ে বলেন, কোন্‌টি নেবে বল, তাহলে বলবো, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাতেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রযাস।

একটা দেশের বা জাতির নবজন্মে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে গাছে নতুন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখীর আনন্দ গান, বর্ষায় দেখতে দেখতে নদীনালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে, একটা জাতির নবজন্ম-কালেও তেমনি একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান নবজন্মে দেখতে পাই—চিত্রের ক্ষেত্রে এজর (Esar) ভিঙকল্‌মান (Winklemann), সঙ্গীতে মোৎসার্ট (Mosart) বেটোফন (Bethoven), সাহিত্যে লেসিঙ্‌, ক্লপষ্টক (Klopstock) ভীলাণ্ড (Wieland) হের্ডর (Herder) গ্যেটে (Goethe) শিলার (Schiller) শ্লেগেল (Schlegel), দর্শনে কাণ্ট হেগেল ফিক্‌টে শোপেনহাউয়র, ইত্যাদি। এ যেন দেখতে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ বিরাট পর্বতমালা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

লুইস বলেছেন :

> সাহিত্যিকদের চরিত্রে সাধারণত যেসব দুর্বলতা দেখা যায় সেসবের মধ্যে ঈর্ষা প্রধান, এই ঈর্ষা গ্যেটেতে ছিল না বলা চলে; যেসব গুণ মহত্বের অলঙ্কার সেসবের মধ্যে ঔদার্য প্রধান, এই ঔদার্য গ্যেটেতে ছিল অপর্যাপ্ত।

এ আদৌ অতিরঞ্জন নয়। এই অসাধারণ প্রতিভা তাঁর প্রতিভার ভার অবলীলাক্রমে বহন করেছেন, কত সহজভাবে তিনি বলেছেন :

> শুধু নিজের উপরে নির্ভর করে খুব উঁচুদরের প্রতিভাও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু অনেক সাধুসংকল্প ব্যক্তি এই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারে না, তার ফলে তাদের মৌলিকতার স্বপ্ন নিয়ে অর্ধেক জীবনে তারা অন্ধকারে হাৎড়ে কাটায়।... আমি যা

করতে পেরেছি তা শুধু আমার নিজের জ্ঞানের ফলেই নয়, আমার চারপাশের শতসহস্র ব্যাপার ও ব্যক্তি আমাকে যে সব উপকরণ জুগিয়েছে তারও ফলে। মূর্খ ও পণ্ডিত, উদার-মন ও সংকীর্ণ মন, বালক যুবক বৃদ্ধ, সবারই কাছ থেকে জেনেছি কি তারা অনুভব করেছে, ভেবেছে, কেমন করে' তারা জীবন কাটিয়েছে, কাজ করেছে, আর কি অভিজ্ঞতা তাদের লাভ হয়েছে। অপরে যে ফসল পত্তন করে গেছে, হাত বাড়িয়ে তা সংগ্রহ করার চাইতে বেশী কিছু আমি করিনি।

তাঁর পূর্ববর্তী ভিঙ্কল্মান্ লেসিঙ্ হের্ডর প্রভৃতির কাছে তাঁর ঋণ বারবার তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি এমন অপরিসীম-কীর্তি-মণ্ডিত না হতেন তবে তাঁর পূর্ববর্তীদের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হবার সুযোগ কম ঘটতো—যেমন কোনো পরিবারকে লোকচক্ষে গৌরবমণ্ডিত করে তার বহু স্বল্পকীর্তি সন্তান নয় তার একজন অতুলকীর্তি সন্তান।

তাঁর গুরুদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রুসোর নামও উল্লেখযোগ্য। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বনামধন্য দার্শনিক স্পিনোজার নাম। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুরা যতখানি তার চাইতে অনেক বেশী তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা—বিশেষ করে তাঁর প্রণয়-ব্যাপার। এই প্রেমের দহন তিনি প্রায় সারা জীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে এই দুই প্রবল ধারা বিদ্যমান—একটি জ্ঞান অন্বেষণ অপরটি প্রেম-বিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে' আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে ভুল বোঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশ-বাসীরাও বহুকাল পর্যন্ত তাঁকে হীন রঙে রঞ্জিত করে এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটি আরো জটিল এইজন্য যে আমাদের সংস্কার অনেক বিভিন্ন তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন না হই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ফন্ষ্টাইন-পত্নীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্ক। তাঁর চরিতকারদের কেউ কেউ এটিকে বলেছেন এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক—আত্মিক প্রেম—অপরে এ মত স্বীকার করেননি। তেমনিভাবে অদ্ভুত যুবতী বন্ধুপত্নী মারিয়ানা ফন ভিলেমর এর সঙ্গে তাঁর প্রীতির যোগ যা বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল ইরাণী-কবি হাফেজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান (West-Eastern Divan) রচনায়। কিন্তু এ-সবের জন্য যাঁরা তাঁকে স্বৈরাচারী বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে অনেক সাহিত্যিকের মতো আমাদেরও বেধেছে বিশেষ করে' এই কারণে যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিফলিত হয় যাতে সেই কাব্যে গ্যেটে যেসব প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন সেসবে ফুটেছে অপরিসীম পবিত্রতা আর অলোভ। এখানে দুটি দৃষ্টান্তের

উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর নবযৌবনের 'তরুণ ভের্টরের দুঃখ'-এ (Sorrows of Young Werther) নায়ক ভের্টর বিবাহিতা শার্লোটের প্রতি অনুরাগে আত্মহারা, সে এক জার্মান মজনু্য কিন্তু সেই ভেটরই শার্লোটকে লক্ষ্য করে এক জায়গায় বলছে :

> তার প্রতি আমার ভালবাসা নিষ্পাপ, পরম পবিত্র নয় কি ? আমার অন্তরাত্মা কি কখনো একটি পাপচিন্তার দ্বারাও কলুষিত হয়েছে ?

আর তাঁর বৃদ্ধ বয়সের 'স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী' (Elective affinities) উপন্যাসে নায়ক এডুয়ার্ড তার স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে ওটিলীর প্রেমে পাগল হয়েছে; কিন্তু ওটিলী তার কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, ওটিলীর একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে সে নিজেকে বাঁধছে।

ক্রোচে বলেছেন বটে ফাউস্ট প্রথম খণ্ডে মার্গারেটের সম্পর্কে ফাউস্টের লোভ উৎকট হয়ে উঠেছে, ফাউস্ট তার সমস্ত জ্ঞানান্বেষণ বিস্মৃত হয়ে দূতীর সাহায্যে মার্গারেটকে আয়ত্ত করছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে ক্রোচে এ ক্ষেত্রে কিছু অতিশয়োক্তি করেছেন। দূতী এবং তার আনুষঙ্গিক কদর্যতা অবশ্য পরিহার্য, কিন্তু প্রথম কয়েক দৃশ্যের বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত ফাউস্ট বাস্তবিকই যে বদলে ভোগলিপ্সু হয়ে পড়েছে তা সত্য নয়। মার্গারেটের প্রেমে বাস্তবিকই সে আত্মহারা, মার্গারেটের কক্ষে গোপনে প্রবেশ করে' সে নিজের ভিতরে এক রহস্যময় পরিবর্তন অনুভব করছে :

> আর আমি ? কিসের প্রবল আকর্ষণ আমাকে
> এখানে এনেছে ?
> কি গভীর আন্দোলন চলেছে এখন আমার অন্তরে !
> কি চাই আমি ? কেন হৃদয় আমার এমন
> উদ্‌বেলিত ও ব্যথিত ?
> হায় ফাউস্ট ! চেনা যায় না আর তোমাকে।
>
> এখানে কি কোনো জাদু-বাষ্প আছে ?
> আশুতৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম
> কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত !
> হাওয়ার প্রতি পরিবর্তনের খেল্‌না কি আমরা ?

গোটের অগণিত প্রেম-কাহিনীর তাৎপর্য বোঝা কিছু সহজ হবে তাঁর ঐ সব উক্তি স্মরণে রাখলে :

> পবিত্র বন্ধনে ধরা দিতে চাও না —
> তাহলে হে যুবক, অভ্যস্ত হও সংযমে।

এই ভাবেই রক্ষা পাবে তোমার স্বাধীনতা,
আর প্রেমহীন হবে না তোমার অন্তর।

ভাল সে বাসে না কাউকে ;
তার প্রেমের স্বপ্নকে সে দিয়েছে আমাদের নাম।

বৃথা গর্জন করে প্রবৃত্তির বন্যা
কঠিন অজিত উপকূলের সামনে,
বেলাভূমে ছড়ায় তা কবিত্বের মুক্তা
লাভ হয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত ধন।

কিন্তু এমনিভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করা সম্ভবপর হলেও আমাদের দেশে নর নারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা সহজ কি? তবে যেদিন আমরা নারীর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি স্বীকার করবো সেদিন হয়ত আমাদেরও ধারণা করা কঠিন হবে না যে গ্যেটের প্রেম ও প্রযাস মানুষের সাধারণ জীবনেরই ব্যাপার।

ফরাসী ভাবুক এমিয়েল গ্যেটে সম্বন্ধে বলেছেন :

> তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের গ্রীক, ধর্মবোধের আত্মিক বেদনা তাঁর কাছে অজ্ঞাত···জগতের বঞ্চিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের প্রতি তিনি প্রকৃতির মতোই উদাসীন।

কিন্তু গ্যেটে সম্বন্ধে এই ধরণের মত—এক সময়ে বহুলপ্রচলিত—যে অভ্রান্ত নয় এমিয়েল নিজেই তা সেদিনের ডায়ারির শেষে ব্যক্ত করেছেন :

> এই সব জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি একটা ধারণা করা অনুচিত।

এই ধরণের মত সম্পর্কে গ্যেটের এই উক্তি স্মরণীয় :

> যে সব চাইতে অনুভূতি-প্রবণ কেবল সে-ই হতে পারে সব চাইতে কঠিন ও নির্বিকার ; কেননা তার পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত করা···আর বহু সময়ে এই বর্মে সে পীড়া বোধ করে।

বলা হয়েছে গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেম বিধুরতা ও জ্ঞান-অন্বেষণ বিদ্যমান। এ ব্যাপারটি গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের গভীর অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর একটি চেতনা যেন বসে' বসে' তাঁর সেই মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য বাস্তব-প্রীতি—এই যেন গ্যেটে-প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু মের্ক (Merk) তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : বাস্তব যা তুমি তাকে দাও কাব্যরূপ। তাঁর কাব্যসৃষ্টির এর চাইতে সুন্দর পরিচয় আর দেওয়া যায়

না। কিন্তু তাঁর এই বাস্তবপ্রীতি কেন তথাকথিত বস্তুতন্ত্রতায় পর্যবসিত হলো না সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই :

> প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ, সে একই সঙ্গে তার প্রভু ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্যে; আর প্রভু এই কারণে যে এই সব পার্থিব সামগ্রী সে উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করে তার উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে। সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তার মনোভাব ব্যক্ত করে। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতে নেই; এটি শিল্পীর নিজের মনের ফল, অথবা ফলসঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।

গ্যেটের এই ধরণের মতামত অনুসরণ করে ডক্টর রুডোল্‌ফ্‌ ষ্টাইনর গ্যেটে সম্বন্ধে একটি ছোট বই লিখেছেন, তাতে গ্যেটেকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন এক নব সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা রূপে। তার মূল কথা কতকটা এই : প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত—শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ। এ সম্পর্কে তিনি গ্যেটের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

> প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তরলোকে আর এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে, সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপনায় নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ এ সবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্পসৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্তির পাশে লাভ করে এক বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস সত্য রূপে, তাহলে এর লাভ হয় এক স্থায়ী প্রভাব শ্রেষ্ঠতম প্রভাব—কেননা বহু শক্তির সম্মেলন-ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তিরূপে এ যে নিজেকে বিকশিত করে তোলে সেইজন্য জীবনে যা কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই এর নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এই ভাবে মনুষ্য-মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে' মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেব-মহিমা।

ডক্টর ষ্টাইনর তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছেন এই :

> সৌন্দর্য পার্থিব আচরণে এক দিব্যসামগ্রী নয় বরং দিব্য আবরণে পার্থিব সত্য।

'একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো বহু উক্তি আমরা পাব, তাঁর এই কয়েকটি গভীর উক্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য:

> সাময়িক কবিতাই আদি ও সব চাইতে অকৃত্রিম কবিতা।

> প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবি সত্যপ্রীতি।

> প্রত্যেক ব্যাপারে আমি এমন কিছু খুঁজি যা থেকে প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর। • বন্ধ্যা সত্য সত্য নয়।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় Poetry শীর্ষক লেখায় কবি-দৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে Absolute Vision -শুদ্ধ দৃষ্টি, আর Relative Vision আপেক্ষিক দৃষ্টি। এই শুদ্ধ দৃষ্টির দৃষ্টান্ত লেখক দেখেছেন শেক্‌স্‌পীয়রে ও হোমরে। শুদ্ধদৃষ্টি বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি ও বিবৃতি -কবি নিজের রাগদ্বেষ একেবারে ভুলে' গিয়ে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির মর্মে প্রবেশ করে' তাকে বুঝছেন, রূপায়িত করছেন। -এইভাবে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে শুদ্ধদৃষ্টি লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কিনা, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়র ও হোমর এই শুদ্ধদৃষ্টির মুহূর্তেও শেক্‌সপীয়রত্ব ও হোমরত্ব বর্জিত হয়েছিলেন কি না, সহজেই বোঝা যায়, তা সন্দেহের বিষয়। তবে এই আত্মবিলোপ মানুষ হিসাবে কবির পক্ষে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সত্যকার শুদ্ধ দৃষ্টি, অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে যথাসম্ভব অনাবিল চেতনা, গ্যেটের চাইতে হোমরে ও শেক্‌স্‌পীয়রের বেশী নয়।†

যৌবনেই গ্যেটে বলেছিলেন:

> আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব মন্দ হব, তোমাদের যত আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

এই যার সাধনা, প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই, গ্যেটে শুধু' কবি নন। তিনি বিজ্ঞানবিদ্—বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে—চিত্র সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, এমনকি মরমী সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত। আর তাঁর এই বহুমুখী আদর্শ ও অনুভূতি সামঞ্জস্য লাভ করে' তাঁর ব্যক্তিত্বকে দান করেছে এক অপরূপ মহিমা। জনৈক আধুনিক ইংরেজ লেখক (John Macy: The Story of the World Literature) তাঁর প্রতিভার মর্যাদা নিরূপণ করেছেন এই ভাবে

> আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি, যে কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই

† ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় শেষ অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন। যাঁরা নৈতিক পদ্ধতির চাইতে কাম্য জ্ঞান করেন নৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পবিবর্তে চান আন্তর্জাতিক সহযোগ, সাহিত্যে জীবনে রাজনীতিতে ও চিন্তায় স্বপ্নচারিতার চাইতে বেশী মর্যাদা দেন প্রয়োজনের অনুশীলনকে, তাঁরা এই একটি লোকের জীবন দৃষ্টান্ত ও রচনা থেকে—তাঁর দৈবাৎ-রচিত চিঠিপত্র ও বচন-কণিকাও এই সব রচনার অন্তর্ভুক্ত—অফুরন্ত প্রেরণা বীর্য ও আলোক লাভ করবেন।

গ্যেটে নিজেও বলেছেন :

যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের ধর্মগ্রাহী হয়েছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি একপ্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন।

প্রচলিত ধর্মে আস্থাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন তার গৌরব অসাধারণ। ফাউস্‌টের মুখে (তার প্রিয়া গ্রেটখেনের প্রতি) তাঁব এই উক্তি ভাবুকদের জন্য বিস্ময় ও আনন্দেব প্রস্রবণ :

স্পর্ধা করে তাঁকে ব্যক্ত করবে!
বলবে কে : তাঁকে জানি, তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে অস্বীকার করবে কে তাঁকে!
বলবে কে, বিশ্বাসী তাঁতে নই!
সর্বধর
সর্বাশ্রয়
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে আমাকে নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশেব খিলান?
পায়ের নীচে অবিচলিত ধরণী?
সামনে জ্বলছে না কি বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা
চিরদিনের তারা?
চোখ কি আমার তাকাচ্ছেনা তোমার চোখে, দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছনা তুমি মনে প্রাণে
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য!
পূর্ণ হোক সেই বিরাট শক্তির দ্বারা তোমার হৃদয়।
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিয়ো এর—
আনন্দ হৃদয় প্রেম ভগবান যা খুশী।

আমি অক্ষম এর নাম দিতে !
অনুভূতিই আমার সব :
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলি
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অপর দুটি বিখ্যাত উক্তি এই :

যারা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টিধর্মী হতে পারে কেবল তারাই।

যদি ভালবেসে থাক বিজ্ঞান আর শিল্প
তবে অন্তরে পেয়েছ ধর্ম,
যদি প্রয়োজন বোধ না কর এর কোনোটিতে
তবে বন্ধু, ধর ধর্মের পথ।

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতি-প্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু মনীষী ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন :

> মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবন, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজনও যে আছেন যিনি মানবপ্রকৃতির সবক্ষেত্রের জ্ঞানে অদ্বিতীয় হয়েও জাতিতে জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু ঊর্ধ্বে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে' আমি জ্ঞান করি।

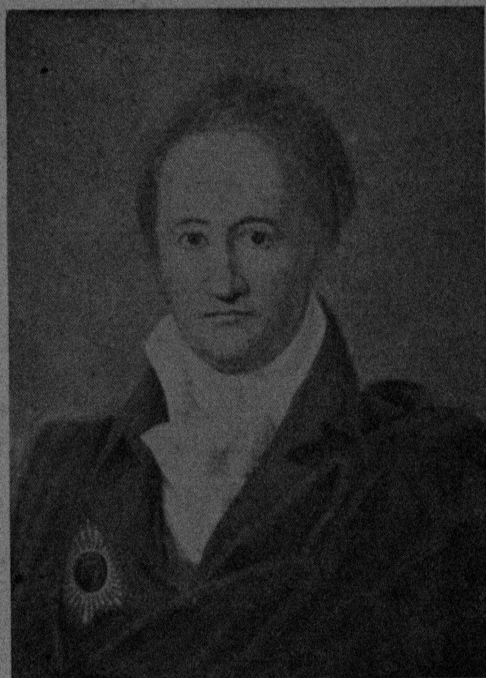
গ্যেটের আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃত পরিচয় আমরা পরে পাব; এ সম্পর্কে তাঁর দুটি বিখ্যাত বাণী এই :

> জাতীয় সাহিত্য এখন প্রায় এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে, আর প্রত্যেকেরই উচিত তাকে এগিয়ে আনা।

> মোটের উপর বিজাতি-বিদ্বেষ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে অনুভাবকের স্থান লাভ হয় অনেকটা জাতীয়তার ঊর্ধ্বে, পড়শী জাতির দুঃখ-বিপত্তি তখন তার মনে হয় স্বজাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আবার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল।

মধ্যযুগে মানুষকে জ্ঞান করা হতো ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব—microcosm. প্রত্যেক মানুষ এখন ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব কি না বলা কঠিন, তবে গ্যেটে যে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব তা যথার্থ। প্রকৃতির প্রবলতা আর অকৃত্রিমতা আর মানব-প্রকৃতির সন্ধানপরতা, দুয়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে তাঁর জীবনে ও প্রতিভায়, আর এর কোনোটি ক্ষুন্ন হয়নি তাঁর মধ্যে।

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানব-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য বিবেচিত হবে হয়ত সবকালে।



৬০ বৎসর বয়সে

প্রশান্তি

নেপোলিয়ন

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবরে যেনার যুদ্ধে প্রাশিযার সৈন্যদল পর্যুদস্ত হয়, ভাইমারের পথে তারা পলায়ন করে। অচিরে ভাইমার নেপোলিয়নের সৈন্যদের করতলগত হয়। সৈন্যদের লুঠতরাজের ফলে নগরবাসীরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে: তাদের বহু জিনিষপত্র নষ্ট হয়; বহু বাড়ীতে আগুন লাগে। এই দুর্দিনে ভাইমারে ছিলেন রাণী লুইসা আর প্রধান মন্ত্রী গ্যেটে; ডিউক যোগদান করেছিলেন প্রাশিযার পক্ষে।

পরদিন নেপোলিয়ন ভাইমারে পদার্পণ করলেন। রাণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ডিউক প্রাশিযার দলে যোগ দিয়েছিলেন বলে' তিনি রাণীকে ভর্ৎসনা করলেন। রাণী শান্তকণ্ঠে বল্লেন: প্রাশিয়ারাজ তাঁর স্বামীর নিকট-আত্মীয়, সম্রাট নেপোলিয়নের কোনো নিকট-আত্মীয় যদি এমন সঙ্কটকালে তাঁকে পরিত্যাগ করতেন তবে তাঁর সম্বন্ধে সম্রাটের ধারণা কেমন হতো।—রাণীর এই তেজস্বিতা নেপোলিয়নকে স্পর্শ করলো। তিনি বল্লেন: রাণীর সম্মানার্থ তিনি তাঁর রাজ্য নষ্ট করবেন না কিন্তু এই শর্তে যে ডিউক কালবিলম্ব না করে' প্রাশিযার পক্ষ ত্যাগ করবেন।

"প্রথিতযশা মনীষী" গ্যেটের গৃহ কিন্তু লুঠতরাজ থেকে রক্ষা পেয়েছিল; এটি নির্দিষ্ট হয়েছিল নেপোলিয়নের জনৈক সেনাপতির জন্যেও। কিন্তু সেনাপতির আসবার পূর্বেই কতিপয় সৈন্য কবির গৃহে তাদের বাসের বন্দোবস্ত করে। কবির নির্দেশে তাদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। গভীর রাত্রে আরো কয়েকজন সৈন্য আশ্রয়ের জন্য কবির দরজায় ঘা দেয়। তাদেরও বিছানাপত্র ও খাদ্য-পানীয় দেওয়া হয়। কিন্তু তারা গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য জেদ করে। অগত্যা কবিকে সংবাদ দেওয়া হয়। নৈশ পোষাকে প্রদীপ হাতে তিনি নেমে এলেন। তাঁর প্রভাবময় মূর্তি দেখে সহসা সৈন্যরা খুব ভদ্র হয়ে পড়ে। কবি তাদের সঙ্গে বসে' দুই এক পাত্র মদিরা পান করে' আপন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সুরা-উন্মত্ত সৈন্যদের দুইজন আরো ভাল বিছানার জন্যে জেদ করে। তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে কবির কক্ষে প্রবেশ করে ও কবির উপরে তলোয়ার তোলে। এই সঙ্কটে ক্রিস্তিয়ানা একজন লোক সঙ্গে নিয়ে অসীম সাহসে কবি ও সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়ান ও সৈন্যদের বের করে' দিয়ে কবির কামরার দরজা বন্ধ করেন। পরদিন সেনাপতি এসে এই দুর্বিনীত সৈন্যদের শাস্তি দিয়েছিলেন। জ্ঞানের সাধকের প্রতি ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের এই শ্রদ্ধা সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এমন বিপদকালে গ্যেটের আচরণে কোনো ব্যস্ততা দেখা যায়নি বরং আশ্চর্য প্রশান্তভাবে তিনি এই রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর নিরাপত্তার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন নেন, আর য়েনার যুদ্ধের পাঁচ দিন পরে অতি অনাড়ম্বরে ক্রিস্‌তিয়ানাকে বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ করেন। এই বিবাহের কথা তিনি বহুদিন ধরে' ভাবছিলেন ; এই নূতন বিপদ আর ক্রিস্‌তিয়ানার প্রতি কৃতজ্ঞতা তাঁকে হয়ত এই কর্তব্য সমাপনের তাগিদ দিয়েছিল।

জনৈক সম্পাদক এই বিবাহ সম্পর্কে তাঁর কাগজে এই বলে' বিদ্রূপ করেন যে, য়েনার কামান-গর্জনের মধ্যে গ্যেটে তাঁর গৃহরক্ষিণীকে বিবাহ করা সঙ্গত মনে করেছেন। তাতে গ্যেটে তাঁর ডায়ারীতে লেখেন : আমার এরূপ গুরুত্ব নেই যে আমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভ রচনা হবে। কিন্তু যদি তেমন কথা ওঠেই তবে এই আমার অভিমত যে আমার দেশের কর্তব্য আমার এই কাজ অলঘুভাবে গ্রহণ করা, কারণ আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে, সেইভাবেই।

নেপোলিয়নের অপূর্ব কর্মশক্তি ও মনীষার প্রতি গ্যেটের অন্তরে যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল ভাইমারের এই বিপর্যয়েও তা অবিচলিত রইল। এর দুই বৎসর পরে নেপোলিয়নের সঙ্গে কবির দেখা হয় ভাইমারের অনতিদূরে এর্ফুর্ট নগরে। সেখানে রাজন্যবর্গের সভা বসেছিল, ডিউক কার্ল আউগুস্‌ট কবিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন এ পর্যন্ত ভের্টের সাত বার পড়েছিলেন। গ্যেটে এর্ফুর্টে উপস্থিত সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কবি যখন নেপোলিয়নের সম্মুখবর্তী হলেন তখন তিনি প্রাতরাশ করছিলেন ; কবির দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বলে উঠলেন :

Vous etes un homme—একটা মানুষ আপনি !

গ্যেটের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এর চাইতে সারগর্ভ উক্তি আর কেউ করতে পারেননি। নেপোলিয়নের এই প্রশংসায় কবি পরম আপ্যায়িত হলেন, বল্লেন :

আমার একান্ত নতি গ্রহণ করুন।

নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসা করলেন :

আপনার বয়স কত ?

কবি উত্তর দিলেন :

ষাট বৎসর।

নেপোলিয়ন বল্লেন :

আপনার শরীর বেশ আছে। আপনি ত জার্মানীর প্রধান নাট্যকার।

কবি অস্বীকার করে' শিলার ও লেসিঙ্‌-এর নাম করলেন।

জনৈক সেনাপতি গ্যেটের প্রশংসা করে বল্লেন :

ইনি ভলটেয়ারের 'মোহম্মদ' তর্জমা করেছেন।

নেপোলিয়ন তাঁর লোকদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন মূল নাটকটির অভিনয় এখানে সম্ভবপর কিনা, আর মন্তব্য করলেন :

এটি ভাল নাটক নয়। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় একজন জগজ্জয়ীর এমন অযোগ্য পরিচয় কত অশোভন।

এর পরে নেপোলিয়ন 'ভের্টর' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভের্টরের আত্মহত্যার মূলে একই সঙ্গে প্রেম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে, এটি তিনি অসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাঁর মতে এতে ভের্টরের প্রেমাবেগকে পাঠকদের কাছে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। একটি অণুচ্ছেদ দেখিয়ে বলেন : এটি অস্বাভাবিক হয়েছে, কেন লিখেছিলেন? কবি সহাস্যে উত্তর দেন, এই ত্রুটির কথা এর পূর্বে আর কেউ বলেননি। তিনি সেই অণুচ্ছেদটি ত্রুটিপূর্ণ বলে' স্বীকার করেন।—কিন্তু লুইস দেখিয়েছেন, ভের্টর সম্বন্ধে নেপোলিয়নের সমালোচনা নির্ভুল নয়। ভের্টরের মনে প্রকৃতই একই সঙ্গে কার্যকরী হয়েছিল প্রেমের ব্যর্থতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা।

এরপর নেপোলিয়ন ভের্টর সম্বন্ধে আরো আলোচনা করেন। তাতে প্রকাশ পায় নাট্যকলা ও বিয়োগান্ত নাটক সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, আর ফরাসী নাট্যকলার কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা। যে সব সমসাময়িক নাটকে নিয়তির প্রভাব দেখানো হচ্ছিল সে-সবের প্রতি বিরূপতা জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

একালের মানুষের জন্য নিয়তির কি অর্থ আছে? রাজনীতি হচ্ছে নিয়তি—La politique est la fatalite.

নেপোলিয়ন পুনর্বার বিয়োগান্ত নাটকের কথা তোলেন আর মন্তব্য করেন (লুইস ও ব্রাণ্ডেসের মতে নেপোলিয়ন এই মন্তব্য করেন এর কয়েকদিন পরে ভাইমারে ভলটেয়ারের 'সিজার' নাটকের অভিনয় দর্শনের শেষে) :

এমন নাটক হবে রাজন্যবর্গের আর জাতিবর্গের শিক্ষাস্থল। এইভাবেই নাট্যকারের দ্বারা হতে পারে সব চাইতে বড় কাজ। সিজারের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার একটি ভাল নাটক লেখা উচিত—ভলটেয়ার যা লিখেছেন তার চাইতে ভাল। এটি হোক আপনার জীবনের এক বড় কাজ। এই নাটকে আপনার দেখানো চাই যে, সিজারকে যদি তাঁর বিরাট পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবার সময় দেওয়া হতো তবে তিনি গোটা মানবজাতির মুক্তির বিধান করতে পারতেন। আপনি প্যারিসে আসুন, আমার অনুরোধ!…

বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত আলোচনায় ও অনুরোধে ফুটে উঠেছে নিজের সম্বন্ধে নেপোলিয়নের চেতনা।

এর পর সেদিনের সান্ধ্য-অভিনয়ে নেপোলিয়ন কবিকে আমন্ত্রণ করলেন, বল্লেন: অনেক রাজারাজড়াকে তিনি সেখানে দেখবেন। কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন:

> রুষ-সম্রাটের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? এর্ফুর্ট সম্পর্কে কোনো রচনা তাঁকে আপনার উপহার দেওয়া উচিত।

কবি বল্লেন:

> এমন কাজ করে' অনুশোচনা ভিন্ন আর কিছুই পাইনি।

সম্রাট বল্লেন:

> চতুর্দশ লুইয়ের সময়ে আমাদের বড় বড় সাহিত্যিকদের ধারণা কিন্তু ভিন্ন রকমের ছিল।

কবি উত্তর দিলেন:

> তাতে সন্দেহ নেই, রাজাধিরাজ! কিন্তু তাঁদের যে কখনো অনুশোচনা করতে হয়নি এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে' কিছু বলা যায় না।

এক ঘণ্টারও বেশীকাল ধরে' তাঁদের নানা হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ হয়। কবির বিবাহ ও সন্তানসন্ততি সম্পর্কেও নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গ্যেটে কক্ষ ত্যাগ করে' চলে গেলে নেপোলিয়ন পার্শ্বের রাজপুরুষকে বল্লেন:

> Voila un homme—একটা মানুষ বটে!

নেপোলিয়নের আমন্ত্রণ কবিকে বিচলিত করেছিল। তিনি প্যারিসযাত্রার পাথেয়-আদি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন। সম্ভবত এই বয়সে এই দীর্ঘ ভ্রমণের অসুবিধার কথা ভেবেই তিনি এই চিন্তা বিসর্জন দেন।

নেপোলিয়ন গ্যেটেকে সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করেন। ভাইমারের আর একজন কবিও নেপোলিয়নের প্রদত্ত সম্মান লাভ করেন—তিনি ভীলাণ্ড। ব্রাণ্ডেস বলেছেন: দশ বৎসর পূর্বে ভীলাণ্ড-সম্পাদিত পত্রিকায় নেপোলিয়নের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছিল, বলা হয়েছিল, নেপোলিয়নের মতো কর্মদক্ষ ও ধীমান ব্যক্তিকে ডিক্টেটর নিয়োজিত করে' ফরাসী জাতি তাদের জাতীয় সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে পারে।—(১৮১২ খৃষ্টাব্দে ভীলাণ্ডের মৃত্যু হয়।)

নেপোলিয়ন গ্যেটের মনোরাজ্যে এমন সম্মানিত আসন লাভ করেন যে, যখন সমগ্র জার্মানী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধাচারী হলো তখনো কবি আপন ধারণায় অবিচলিত রইলেন। তাঁর পুত্রের দেশের সৈন্যদলে যোগদানে তিনি ঘোর আপত্তি করলেন। বলা বাহুল্য সেজন্য কবিকে অশেষ নিন্দার ভাগী হতে হয়েছিল। কবির এই মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর চরিতকারেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত মোটের উপর এই:

> (১) নেপোলিয়ন যে এক অসাধারণ সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা—অতুলনীয় কর্মশক্তি ও মনীষার অধিকারী—এ সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন; তাঁর সমাদর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

এ সম্বন্ধে কবির একটি উক্তি এই :

> কোনো উচ্চতরমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এর পূর্বে আমার সঙ্গে এমন সশ্রদ্ধ ব্যবহার করেননি। যথেষ্ট দ্বিধাহীন হয়ে তিনি আমার স্থান নির্দেশ করেছিলেন বিশ্বের দরবারে (তাঁর নিজের পার্শ্বে) আর কোনো অস্পষ্টতা রেখে জানাননি যে আমার ব্যক্তিত্ব তাঁকে আনন্দ দান করেছিল।
>
> (২) কবির যুগে জার্মান জাতির রাষ্ট্রজীবন ছিল অত্যন্ত অবিকশিত; 'জাতি'র জন্ম হয়নি বল্লেই চলে। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল নেপোলিয়নের মতো উন্নত আদর্শের শাসকের প্রভাব তাঁর দেশবাসীদের জন্য কল্যাণকর হবে। তাঁর দেশের লোকদের ভিতরে যখন এমন শক্তির জন্ম হয়নি যে তারা নিজেরা নিজেদের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারে তখন তাদের নেপোলিয়নের বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রুষবাহিনীর অধীনতা স্বীকার।
>
> (৩) কবি ছিলেন একান্ত সত্যাশ্রয়ী। তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী প্রকৃতি তাঁর এই বয়সে সম্পূর্ণরূপে বিজাতিবিদ্বেষ-বর্জিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে একেরমানকে তিনি বলেছিলেন…"স্বভাবত আমি যুদ্ধপ্রিয় নই, যুদ্ধের বোধ আমাতে নেই, কাজেই যুদ্ধের কবিতা লেখা আমার জন্য হতো এক বেমানান মুখোস পরা। আমার কাব্যে কখনো ভাণের প্রশ্রয় দিইনি। যা অনুভব করিনি, যাতে প্রকাশের আবেগ বোধ করিনি, এমন কিছু কখনো মুখে উচ্চারণ করিনি। প্রেমসঙ্গীত তখনি লিখেছি যখন ভালবেসেছি; অন্তরে বিদ্বেষ অনুভব না করে' কেমন করে' আমার পক্ষে সম্ভব ছিল বিদ্বেষের গান রচনা করা?"

কিন্তু স্বভাবত মানব-প্রেমিক ও আন্তর্জাতিক হয়েও স্বজাতির দুঃখ অপমানের প্রতি বাস্তবিকই তিনি হতচেতন হননি। ডিউক কার্ল আউগুস্টের প্রতি নেপোলিয়নের রূঢ় ব্যবহারে তাঁর প্রশান্ত চিত্তও গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল - লুইসের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আর জনৈক সাহিত্যিক ফ্রান্সের প্রতি জার্মান জাতির অন্তরে বিদ্বেষ উদ্রেকের অভিপ্রায়ে পত্রিকা প্রচারে উদ্যোগী হলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে' তিনি বলেছিলেন :

> বিশ্বাস করো না যে স্বাধীনতা, স্বদেশ, স্বজাতি, এই সব মহৎ ভাবের প্রতি আমি উদাসীন। কখনো নয়. এই সব ভাব আমাদের মধ্যে রয়েছেই, এসব বর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। জার্মানী আমার প্রাণের সামগ্রী। বহু সময়ে আমি অন্তরে যাতনা বোধ করি এই ভাবনায় যে, ব্যক্তি-হিসাবে জার্মানরা এত শ্রদ্ধেয় কিন্তু জাতি হিসাবে এমন কৃপার

পাত্র। অন্যান্য জাতির সঙ্গে জার্মান জাতির তুলনা করলে মনে ব্যথা জাগে—তা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করি যে কোনো উপায়ে; শিল্পে ও বিজ্ঞানে সেই মুক্তির পন্থা আমি পেয়েছি; কেননা এসব হচ্ছে সমগ্র জগতের, এসবের সামনে জাতির সীমারেখা লোপ পায়। কিন্তু মোটের উপর এ হচ্ছে এক দুর্বল সান্ত্বনা, আমি যে-জাতির লোক সে-জাতি মহৎ, শক্তিমান, সম্মানিত, তাকে দেখে সবাই ভয় করে—এমন গৌরবময় আত্মপ্রত্যয়ের স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য নয়।···আমাদের জন্য এখন একমাত্র কর্তব্য, প্রত্যেকে তার শক্তি অনুযায়ী, প্রভাব অনুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা করুক জাতির চিৎ-প্রকর্ষ ও বিকাশ বাড়িয়ে চলতে, এসব তাদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত হোক যাতে জাতি অপর জাতিদের সঙ্গে তুলনায় পেছনে পড়ে না থাকে, যেন গৌরবের দিনে প্রতি মহৎকর্মে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে।···

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর এই অভ্যুত্থান গ্যেটের কাছে তেমন মর্যাদা না পেলেও ইতিহাসে যে কম মর্যাদা পায়নি তা আমরা জানি। তবে কবির এই ভুল—যদি আদৌ একে ভুল বলা হয়—বড়জোর বিচারের ভুল, তার স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় এতে অম্লান। এই যুদ্ধোন্মত্ত পরিবেশে তাঁর তিনখানি গ্রন্থ—স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী, আত্মচরিত আর প্রতীচ্য-প্রাচ্য-দিউয়ান—রচিত হয়।

বেটিনা

ভাইমারের পরাভব ও নেপোলিয়নের সঙ্গে গ্যেটের সাক্ষাৎকার এই দুইয়ের মাঝে ঘটে বেটিনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। লুইস্ বলেন, বেটিনার রোমান্টিক রুচি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক-সমাজের মনোযোগ যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করেছিল।

বেটিনা ভের্টের-রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা মাক্সিমিলিয়ানার কন্যা। অল্প বয়সেই তাঁতে দেখা দেয় সাহিত্য-অনুরাগ ও যথেষ্ট ভাববিলাসিতা—সেদিনের বহু রোমান্টিক কবির মতো তিনিও গ্যেটের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। এর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দুঃসাহসিকা। ফ্রাঙ্কফোর্টে গোটে-জননীর কাছে থেকে তিনি কবির বাল্যজীবনের অনেক কাহিনী সংগ্রহ করেন—গ্যেটে-জননী পরলোকগমন করেন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর ভাইমারে আসেন কবির সঙ্গে পরিচিত হতে। ভীলাণ্ডের পরিচয়-পত্র নিয়ে—ভীলাণ্ড ছিলেন বেটিনার মাতামহী সাহিত্যিকা ফন লা রোশ-এর বন্ধু—তিনি কবির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার ব্রাণ্ডেসের গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

গ্যেটের কক্ষে প্রবেশ করে' বেটিনা দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। গ্যেটে তাঁকে সস্নেহে বুকে ধরে' বললেন: আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ বালিকা?

তিনি তাঁকে সামনের সোফায় বসালেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। তারপর কবি কথা তুললেন: বোধ হয় কাগজে পড়েছ, আমরা সম্প্রতি ডিউক-মাতা আমেলিযাকে হারিয়েছি। বেটিনা বল্লেন: না আমি কাগজ পড়িনা। গোটে বল্লেন: তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম ভাইমারের সব-কিছু সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল রযেছে। বেটিনা বল্লেন: আমার কৌতূহল শুধু আপনার সম্বন্ধে। কাগজ ঘেঁটে বেড়াবার ধৈর্য আমার নেই। গোটে বলেন: তুমি স্নেহময়ী বালিকা। বহুক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা হলো না। তারপর বেটিনা সোফা থেকে উঠে কবির কণ্ঠলগ্না হলেন।

ব্রাণ্ডেস বলেছেন: এ যেন দ্বিতীয় মিগ্‌নন, মিগননের মতো মাধুর্যময়ী কিন্তু প্রকৃতিতে অনেক চপল।

এই সময়ে বেটিনার বয়স ছিল প্রায় ২৩ বৎসর, কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বয়স এ সময়ে ছিল তের বৎসর। তেমন বাড়ন্ত তিনি ছিলেন না।

গোটের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে বেটিনা এক গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম দেন: এক শিশুর সঙ্গে গোটের আলাপ। এই গ্রন্থ থেকে গোটে সম্বন্ধে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।

এই গ্রন্থে গোটের অনেক পত্র ও কবিতা এমন ভাবে প্রকাশ করা হয়, যা থেকে পাঠকদের ধারণা জন্মে, শুধু যে বেটিনা গোটের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হযেছিলেন তাই নয় গোটেও তাঁর প্রতি সব সময়ে উদাসীন থাকেন নি, মাঝে মাঝে প্রতি-অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন স্পষ্টভাবে, আর গোটের এই সময়ের সনেটগুলো মূলত বেটিনার মনের ভাব —গোটের দ্বারা ছন্দে গ্রথিত।

এর উপর নির্ভর করে' অকরুণ সমালোচকেরা কবির বিরুদ্ধে এই মত গড়ে তুলতে চেষ্টা পান যে, কবি একান্ত হৃদয়হীন, শিল্পীর নিলিপ্ততা নিয়ে তিনি প্রেমবিহ্বলা বেটিনার সঙ্গে খেলা করেছিলেন। কিন্তু কালে কালে প্রকাশ পায়: বেটিনার গ্রন্থই কল্পনার এক খেলা, বেটিনার অনুরাগে কবি কখনো উৎসাহ দেন নি, তাঁর বাড়াবাড়ি দীর্ঘদিন তিনি সহ্য করেছিলেন মাত্র; আর তাঁর সনেটের সঙ্গে বেটিনার যোগ নেই, সে-সবের উপলক্ষ অপর এক কুমারী।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ক্রিস্‌তিযানার প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে কবির গৃহ বেটিনার জন্য নিষিদ্ধ হয়, বেটিনার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কবি সেই আদেশ প্রত্যাহার করেন না।

বেটোফন

স্বনামধন্য বেটোফন ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বেটিনাকে একখানি পত্র লেখেন --পত্রখানিতে গোটে-বেটোফনের এক উপভোগ্য ছবি ফুটেছে। লুইসের গ্রন্থে পত্রখানি উদ্ধৃত হয়েছে:

রাজারাজড়ারা অধ্যাপক, মন্ত্রী প্রভৃতির সৃষ্টি করতে পারে, সম্মান পদবী এ

> সবও বিতরণ করতে পারে, কিন্তু যাঁরা প্রকৃতই বড় তাঁদের সৃষ্টি করতে পারে না,—সাধারণের স্তরের ঊর্ধ্বে এই বড়দের চিত্ত বিহার করে, এঁদের সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম এমন অভিমান তাদের না থাকুক; আর সেইজন্যই এই বড়দেব প্রতি সম্মান দেখানো চাই। যখন গ্যেটে ও আমার মতো দুইজন লোক একত্র হয় তখন অভিজাতদের বোঝা দরকার কেন আমরা বড়। কাল ফিরবার পথে সম্রাট-পরিজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। দূর থেকেই আমরা দেখলাম তারা আসছে। গ্যেটে আমাকে ছেড়ে পথের এক পাশে দাঁড়ালেন: কিছুতেই আর তাঁকে নড়াতে পারলাম না। আমি আমার টুপি মাথায় চাপিয়ে ওভারকোটের বোতামগুলো এঁটে বুকের উপর দুই হাত বেঁধে তাদের মাঝখান দিয়ে চল্লাম। রাজন্যেরা আর তাদের অনুচরেরা পথ ছেড়ে দাঁড়ালো. আর্চডিউক রুডোল্‌ফ্‌ টুপি তুলে আমাকে সম্মান দেখালেন, আর সম্রাজ্ঞী প্রথমে অভিবাদন করলেন। এই সব অভিজাত আমাকে জানে। দেখে খুব কৌতুক বোধ করলাম মিসিল গ্যেটেকে পাশে রেখে চলে গেল; গ্যেটে দাঁড়িয়ে রইলেন টুপি খুলে মাথা নীচু করে'। এজন্য আমি গ্যেটেকে খুব তিরস্কার করেছিলাম; খাতির করিনি আদৌ।

এটি ঘটে অষ্ট্রিয়ার টেপ্‌লিৎস্‌ শহরে—সেখানে গ্যেটে রাজ-পরিবারের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। বেটোফনের সঙ্গেও মাঝে মাঝে তাঁর দেখা হচ্ছিল। বেটোফনের প্রতিভা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই:

> এমন একমনা, শক্তিমান, অতি-গভীর-অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পী আমি আর দেখি নি।

বেটোফন সম্বন্ধে তাঁর অপর মন্তব্য এই:

> তাঁর প্রতিভা আমাকে বিস্ময়বিমূঢ় করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর ব্যক্তিত্ব অতিশয় বর্বর। জগৎকে যদি তাঁর মনে হয়ে থাকে অতি কদর্য স্থান তবে সেজন্য অবশ্য শুধু তাঁকেই দোষী করা যায় না. কিন্তু এর ফল না তাঁর জন্য আনন্দকর না আর দশজনের জন্য।

গ্যেটের প্রতি বেটোফনের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। ফাউস্‌টে সুর-যোজনা করবার কথা এক সময়ে তিনি সাগ্রহে ভেবেছিলেন। গ্যেটে যে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর বাজনা শোনেন সে-সম্পর্কে তিনি বলেন:

> এই মহাপুরুষ আমার জন্য কী ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন! কত উপকার করেছেন আমার!

কিন্তু সেই সঙ্গে এই মন্তব্যও করেন:

রাজসভা গ্যেটের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে, কিন্তু এমন একজন কবির সঙ্গে তেমন খাপ খাবার কথা নয়।

বেটোফনের স্বাতন্ত্র্য-প্রীতির পাশে গ্যেটের এই "দাস-মনোভাব" দীর্ঘদিন কবির বিরুদ্ধ-দলের উৎসাহপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য তাঁদের বিচারে রয়েছে তাঁদের নিজেদেরই লঘুতার পরিচয়। বেটোফনের আচরণ বেটোফনকে মানিয়েছিল চমৎকার, কিন্তু গ্যেটেকে মানাতো না আদৌ, কেননা বেটোফনের মতো আত্মকেন্দ্রী উদ্দাম প্রতিভা গ্যেটে নন। এই সম্পর্কে তাঁর 'আলাপে'র এই উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে:

> রাজকুলে জন্মেছেন বলেই কেউ কখনো আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন না যদি না সেই সঙ্গে দেখতাম সুষ্ঠু মানবীয় প্রকৃতি আর মানবীয় মূল্য।

মিনা হার্ৎসলিব

যে কুমারীর প্রভাব গ্যেটের এই কালের সনেটগুলোর উপরে পড়েছিল তাঁর নাম মিনা হার্ৎসলিব। তিনি ছিলেন যেনার এক পুস্তকব্যবসায়ীর পালিতা কন্যা, গ্যেটে কখনো কখনো তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মিনাকে কবি ছেলে বেলা থেকে জানতেন এবং সমাদর করতেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হলে তাঁর প্রতি কবির অন্তরে এক গভীর প্রেমাবেগের সঞ্চার হলো। মিনারও অন্তরে কবির প্রতি অনুরাগ প্রবল হয়েছিল কিনা তা ভাল জানা যায় না। তবে মিনার এক বন্ধুকে লেখা পত্রে রয়েছে: কবির মুখে অপূর্ব সব কথা শুনে সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁর নিজের ঘরে ফিরে যেতেন তখন তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল ঝরতো, শুধু এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেতেন—

> মানুষ সবাই শক্তির এক রকমের উৎকর্ষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। আমাদের প্রত্যেককে ভাগ্যের নির্দেশিত স্থানে ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে' যেতে হবে—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত।

মিনার উদ্দেশ্যে কবি যে সব সনেট রচনা করেন তার তিনটি উদ্ধৃত হচ্ছে। সনেটের কঠিন বন্ধন কবি পছন্দ করতেন না। কিন্তু এই কালে তাঁর প্রেমাবেগ একই সঙ্গে সনেটে, নাটকে ও উপন্যাসে রূপ লাভ করে। তাঁর এই সব সনেটের পদ লালিত্য প্রশংসিত হয়েছে।

বিকাশ

অমল শৈশবে, মাঠে ময়দানে,
লাফিয়ে ফিরেছ তুমি আমার সঙ্গে কত বসন্ত-প্রভাতে।
'এমন কন্যার জন্যে' (ভেবেছি আমি) 'পিতার আনন্দ নিয়ে
'নির্মাণ করবো আমি সুখময় গৃহ।'

যখন পতিত হলো তোমার দৃষ্টি বিশ্বের পরে,
আনন্দে হাত বাড়ালে তুমি গৃহের কাজে,
'কেন এত নির্ভর করি আমি তার পরে সে আমার 'পরে ?
'এমন ভগিনীর জন্যে' (ভেবেছি আমি) 'শত ধন্যবাদ জানাই ঊর্ধ্বের দেবতাকে'।

মোহন বিকাশ আর বাধা মানে না কিছুতে ;
আমার অন্তরের প্রেমের শিখায় লেগেছে বাতাস।
বক্ষে ধরবো কি তার মূর্তি জ্বালা নিবারণের জন্যে ?

হায় দিতে হবে তোমায় রাণীর মর্যাদা ;
যেন এত ঊর্ধ্বে হয়েছে তোমার অধিষ্ঠান ;
আনমনে কর যদি আমার 'পরে আঁখিপাত আমি জানাই বিনতি।

প্রিয়ার লিখন

তোমার মধুর আঁখি আমার আঁখির 'পরে মুদ্রিত করে যে চাহনি,
তোমার ওষ্ঠাধর আমার ওষ্ঠাধরে জানায যে অঙ্গীকার—চুম্বন,
যে নিঃসংশয়ে জেনেছে এসব আমার মতো,
সে আনন্দ পাবে বল আর কিসে ?

তোমা থেকে দূরে বন্ধুহীনা বিপন্না—
বৃথা চেষ্টা করি ভুলতে সে-সব কথা ;
বারবার তারা স্মরণ করিয়ে দেয় আনন্দের কাল ;
সেই এক কাল ! ব্যথা আমার গলে পড়ে অশ্রুধারায়।

কিন্তু অজ্ঞাতে শুকায় সে-অশ্রু ত্বরিতে ;
ভাসে মনে, ভালবাসা তার অনুভব করি এমন নিস্তব্ধ বনের কোলেও।
বাড়াবে না তুমি প্রেমের হাত দূর দেশে ?

পৌঁছুক তোমাতে এই প্রেমের শ্বাসের মর্ম্মর,
জগতে একমাত্র আনন্দ আমার তোমার ইচ্ছায়,
আমার প্রতি তোমার সদয়তায় : পাঠাও একটি অভিজ্ঞান।

বড়দিনের ডালি

প্রাণ-প্রতিমে, দেখবে তুমি এই ডালি
বহু-আকৃতির মিষ্টান্নে সজ্জিত,
পুণ্য বড়দিনের বাজারের ফল এসব,
সুসিদ্ধ, ছোটদের নয়নাভিরাম।

সাধ যায় মধুর বাক্যে মোহন ছন্দে রচিত
কবিতা-মিষ্টান্ন পাঠাই এ উৎসবে ;
কিন্তু কেন এমন তুচ্ছতার 'পরে আস্থা স্থাপন ?
নিপাত যাক চাটুবাদ দিযে ভোলাবার কল্পনা।

কিন্তু আছে আর এক মধুর বস্তু যা ভেতর থেকে,
আমাদের মর্ম থেকে বলে বাণী,—অনুভব করা যায সে-বাণী সুদূরে ;
ভেসে চলুক তা তোমারই উদ্দেশে।

যদি জাগে তোমার অন্তরে মধুর স্মৃতি,
—যেন আনন্দে স্ফুরিত হয়েছিল প্রতি পরিচিত তারা—
তবে উপেক্ষা করতে পারবে না তুমি তুচ্ছতম উপহার !

মিনা হার্ৎসলিবের উদ্দেশ্যে লেখা এই সব সনেটে কবির প্রেমের আবেগ যতটা রূপ লাভ করেছে, বাস্তবপক্ষে তা হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশী প্রবল। অবশেষে মিনাকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কবি ও মিনা এইভাবে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পান।

মিনার প্রভাব পড়েছিল কবির অসমাপ্ত 'পাণ্ডোরা' নামক নাটকের উপরেও, আর তাঁর বিখ্যাত "স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী" উপন্যাসের উপরে।

স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী

এই উপন্যাসের ইংরেজি নাম Elective Affinities, এর বিষয়বস্তু নিয়ে একটি ছোট গল্প লিখবার ইচ্ছা প্রথমে কবির ছিল। তাঁর 'ভিলহেল্ম মাইস্টার-এর ভ্রমণে' যে-সব গল্প স্থান পেয়েছে এটি হতো তেম্‌নি একটি গল্প—গল্পের প্রতিপাদ্য—জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নিবৃত্তি-পন্থা (Renunciation) যা গ্যেটের শেষ বয়সের রচনার এক বড় কথা। কিন্তু লিখতে লিখতে এটি হয়ে উঠ্‌লো এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ—বিবাহ, নরনারীর সম্পর্ক, ইত্যাদি সম্পর্কে কবি গ্যেটের এক সুমহৎ শিল্প-সৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী ও রুষ উপন্যাস-সমূহের উপরে এর প্রভাব অবিসংবাদিত।—চরিতকাররা বলেন, এইকালে কবি বহু উচ্চপদস্থা নারীর সমাদর লাভ করেছিলেন।

এতে প্রধান পাত্র-পাত্রী চার জন—এডুয়ার্ড, শার্লোট, ওটিলী ও কাপ্তেন। এই চারজনের পরে উল্লেখযোগ্য মিট্‌লার, ব্যারণ ও ব্যারণ-পত্নী। আরো পাত্রপাত্রী আছে, যথা, ওটিলীর শিক্ষক, শার্লোটের কন্যা, স্থপতি ইত্যাদি। এই সব নায়ক-নায়িকার জীবনের জটিল ঘটনার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এতে স্থান পেয়েছে ফলের চাষ, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা।

এডুয়ার্ড ও শার্লোট প্রথম জীবনে পরস্পরকে ভালবাসতো। কিন্তু তাদের বিবাহ হয় না। এডুয়ার্ড বিবাহ করে বয়সে তার চাইতে বড় এক মহিলাকে, শার্লোটের সঙ্গে যার বিবাহ হয় তার সঙ্গে তার মনের মিল হয় না। কালক্রমে তারা উভয়ে তাদের বিবাহিত-জীবন থেকে মুক্তি পায়। তখন এডুয়ার্ড শার্লোটের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। শার্লোট কিছুদিন ইতস্ততঃ করে, অবশেষে রাজি হয়। গ্রন্থের সূচনায় তাদের দেখা যাচ্ছে সঙ্গতিসম্পন্ন উন্নতরুচির সুখী দম্পতিরূপে: মনের মিল তাদের মধ্যে যথেষ্ট, যে সামান্য অমিল তাদের প্রকৃতিতে রয়েছে তা প্রায় চোখে পড়ে না। পূর্ব্ব-বিবাহে শার্লোটের এক কন্যা লাভ হয়েছিল। সেই কন্যা ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ওটিলীকে সে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিলে যেন তাদের নববিবাহিত জীবনে সে ও এডুয়ার্ড পরস্পরকে পূর্ণভাবে আনন্দ দিতে পারে। তারা দুজনেই খুব সঙ্গীতপ্রিয়; শার্লোট বেশী দক্ষ। এডুয়ার্ড ভাল বাঁশি বাজায় কিন্তু তালমানের দিকে তেমন দৃষ্টি রেখে নয়। সে বাজায় দ্রুত, শার্লোট ধীরস্থির। এক সময়ে এডুয়ার্ড ঠিক করলে তারা পরস্পরকে বই পড়ে শোনাবে। কিন্তু সে যখন বই পড়ছে তখন তার পড়ার জায়গা আর কেউ যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে এতে তার ঘোর আপত্তি। বয়স সুবুদ্ধি ও সুরুচি সত্ত্বেও একটি সহজ ছেলেমানুষী তাতে রয়েছে।

এডুয়ার্ডের এক বন্ধু ছিল, ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে এডুয়ার্ডের খুব ভাব। তার নাম উল্লেখ না করে' শুধু কাপ্তেন বলা হয়েছে—সৈন্যদলে সে ছিল। এডুয়ার্ডের একান্ত ইচ্ছা তার এই বন্ধুকে তাদের সঙ্গে কিছুকাল বসবাসের জন্য সে ডাকবে। শার্লোট আপত্তি করে, তার কেমন ধারণা হয় তাদের মধ্যে এই বন্ধুর আসার ফল ভাল হবে না। এডুয়ার্ড বলে, তাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে অভিজ্ঞতার ফলে বিচারবুদ্ধি জেগেছে—তারা যথেষ্ট সচেতন। শার্লোট উত্তর দেয়—চেতনায় পূরো কাজ দেয় না।

এডুয়ার্ডের একান্ত অনুনয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শার্লোট রাজি হয়। এই সময়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হয় মিটলার। সে এক সময়ে ছিল পাদ্রী, তারপর হয়েছিল উকিল। এখন তার কাজ বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তা বিধান। শার্লোট ও এডুয়ার্ডের বিবাহিত জীবন বিঘ্নরহিত দেখে সে শীগগিরই স্থানান্তরে গমন করলে।

কাপ্তেন এসে হাজির হলো। সে সর্বকর্মে দক্ষ, আর যেমন তার কর্মদক্ষতা তেমনি চরিত্র-শক্তি—খেয়ালী এডুয়ার্ডের সে বিপরীত। শার্লোট চেষ্টা করলে তার জন্য অন্যত্র কোনো কাজের যোগাড় করে' দিতে। কিন্তু এডুয়ার্ড প্রস্তাব করে, তাদের বাড়ী ও

জমিদারী সম্বন্ধে যে নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে কাপ্তেন সাহায্য করুক। এই পরিকল্পনার কাজে কাপ্তেন লাগে, কিন্তু বেশ সন্তর্পণে যেন শার্লোটকে বিরক্ত করা না হয়। পরিকল্পনার কাজে এডুয়ার্ড ও কাপ্তেন মেতে উঠ্‌লো। এর ফলে শার্লোটের একলা কাটতে লাগলো! কিছুদিন পরে ওটিলী তার বিদ্যালয় ত্যাগ করে' তাদের গৃহে বাস করতে এলো। ওটিলী এলে বাড়ীর এক অংশে মেয়েরা অন্য অংশে পুরুষরা বাস করতে লাগ্‌লো।

ওটিলী মিনা ফাৎ‌স্‌লিবের প্রতিমূর্তি। সে খুব শান্তশিষ্ট, ধীরস্থির--ধীরে সুস্থিরে সে কথা বোঝে, তাড়াতাড়ি নয়। এখনো সে যথেষ্ট ছেলেমানুষ, হাতের লেখা ছেলে-মানুষের মতো। সে খুব সেবাপরায়ণা, লোকের ছোটখাটো কাজে লাগতে তার দ্বিধামাত্র নেই, বরং আগ্রহ আছে। তেমন স্বাস্থ্যবতী সে নয়, কিন্তু সব-মিলে দেখায় তাকে চমৎকার—যেন মাধুর্যের মূর্তি—পুরুষদের চোখে আনন্দের মঞ্জরী।

ওটিলীকে দেখেই এডুয়ার্ড মুগ্ধ হলো: তার ভাবাবেগ দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে ওঠে, মনের গতির রাশ টানতে সে জানে না--তার প্রধান কামা সুখ। ওটিলী যেদিন এলো তার পরদিন ভোরে সোৎসাহে সে শার্লোটকে বল্‌লে: 'মেয়েটি চমৎকার, চমৎকার আলাপী।' শার্লোট বল্‌লে: 'আলাপী! সে ত এখনো মুখ খোলেনি।' এডুয়ার্ড বল্লে: 'তাই নাকি?' ভেবে বল্‌লে: 'খুব অদ্ভুত ত।'

কাপ্তেনের চেষ্টায় এডুয়ার্ডের জমিদারির কাগজপত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ হলো। রায়তদের জন্য একটি প্রাথমিক শুশ্রূষা-সমিতিও স্থাপিত হলো—তার সঙ্গে একটি ছোটখাটো ওষুধের দোকান। এই ওষুধপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গোড়ার কথাগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হলো আর এই সম্পর্কেই বিখ্যাত রাসায়নিক তত্ত্ব স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলীর (elective affinities) কথা উঠ্‌লো। কাপ্তেন বোঝালে: আমরা সেই সব প্রকৃতি ও বস্তুকে বিশেষভাবে পরস্পরসম্বন্ধ বলতে পারি যারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে অনতিবিলম্বে পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, পরস্পরের জন্য নব নিয়তির সূচনা করে। এই ধরণের সম্বন্ধ প্রকৃতিতে রয়েছে। এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের রয়েছে। কিন্তু এই সব সম্বন্ধ আমাদের চোখে বেশী পড়ে যখন তারা বিচ্ছিন্নতা বিয়োজন, এই সব ঘটায়। রাসায়নিককে বলা যায় বিয়োজনের শিল্পী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মার্বেলের কথা। তরল সালফ্যুরিক এসিডে রাখলে মার্বেলের উপর সালফ্যুরিক এসিডের প্রতিক্রিয়ার ফলে 'জিপ্‌সাম' তৈরি হয়; কার্বনিক এসিড গ্যাস হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন---বিযুক্ত। আবার সেই এসিড মেশে জলের সঙ্গে, সৃষ্টি করে খনিজসম্বলিত জল (mineral water) যা স্বাস্থ্যহীনদের দান করে নব-স্বাস্থ্য। প্রকৃতির এই বিয়োজন ও নবসংযোজন সম্পর্কে শার্লোট মন্তব্য করলে: সমাজের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে যে যোগ ঘটে তা প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রায়ই নয়—ঘটনাচক্রে।—কিন্তু অন্তরে সে বুঝলে

স্বভাব-বিহিত এই স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী কি নিষ্ঠুর সত্য, কেননা তার মন তার সমস্ত সজাগ চেষ্টা উপেক্ষা করে' কাপ্তেনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল।

এডুয়ার্ড ও ওটিলী পরস্পরকে নিয়ে মেতে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তারা যেন দুই অবোধ শিশু। তারা একসঙ্গে বাজায়—এডুয়ার্ডের এলোমেলো বাজনা ওটিলীর সহযোগিতায় বেতালা হয় না। তারা একসঙ্গে পড়ে—ওটিলী যদি এডুয়ার্ডের পড়ার জায়গা চেয়ে চেয়ে দেখে তবে এডুয়ার্ডের খারাপ লাগে না। কাপ্তেন আর শার্লোটও একসঙ্গে বাজায়—তারা এডুয়ার্ড আর ওটিলীর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত হয় না।

এডুয়ার্ডের জমিদারী-সংক্রান্ত পরিকল্পনা রূপ লাভ করে' চললো। কিন্তু বুঝতে তাদের দেরী হলো না যে, তাদের জীবনে জটিল সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে।

এই সময়ে পূর্ববর্ণিত মিটলার এসে হাজির হলো ও বিবাহের প্রশংসাসূচক এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলে। সে বল্‌লে: বিবাহ সভ্যতার ভিত্তি; যে বিবাহে দম্পতি পুরোপুরি সুখী নয় সে-বিবাহও অচ্ছেদ্য, কেননা বিবাহ স্বেচ্ছাচারের বিরোধী আর বিবেকের সঙ্গে যুক্ত।

মিটলারের পরে এল এক ব্যারণ ও তার প্রণয়িনী ব্যারণ-পত্নী। সে তার পূর্ব্ব-স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু এই ব্যারণের পত্নী বিবাহবিচ্ছেদে অসম্মত। এই অবস্থায় এই প্রণয়ীযুগল বৎসরে কয়েক মাস দূর দেশে একসঙ্গে বাস করে। এরা এডুয়ার্ড ও শার্লোটের পরিচিত, এদের রুচি ও বুদ্ধি খুব মার্জিত। এদের দৃষ্টান্ত মিটলারের অসহ্য, সে অচিরে এডুয়ার্ডের গৃহ ত্যাগ করলে।—প্রসঙ্গক্রমে ব্যারণ একদিন বিবাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করলে: জগতের অন্যান্য বস্তু ও ব্যাপারের মতোই দাম্পত্য-প্রণয় ভঙ্গুর, সে কথা না বোঝাতেই আমাদের জীবনে দেখা দেয় গণ্ডগোল; বিবাহ মেয়াদি হওয়া উচিত, পাঁচ বৎসরের জন্য, দম্পতি যদি পরস্পরকে চায় তবে পাঁচ বৎসর অন্তে তারা পুনর্বিবাহিত হতে পারে: এইভাবে তিনবার যাদের বিবাহ হয়েছে তাদেরই বিবাহ অচ্ছেদ্য বিবেচিত হতেও পারে; বিবাহ-প্রথা অনাবশ্যক, এতে যথেষ্ট বর্বরতা রয়েছে, এর আনুষঙ্গিক নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তা মানুষকে করে সূক্ষ্ম-অনুভূতিবর্জিত, অথবা নারী-পুরুষের ভিতরে এমন বন্ধনের সৃষ্টি করে যা তাদের বিরোধ উগ্র করে' তোলে।

এক রাত্রে ব্যারণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে ব্যারণ-পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। এডুয়ার্ডও গেল শার্লোটের কক্ষে। শার্লোট তখন কাঁদছিল। এডুয়ার্ড গভীর ভাবাবেগে শার্লোটকে আলিঙ্গন করলে; কিন্তু তার মনে তখন চলেছে ওটিলীর ভাবনা আর শার্লোটের মনে চলেছে কাপ্তেনের ভাবনা।

এডুয়ার্ড ও ওটিলীর আর শার্লোট ও কাপ্তেনের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দিন দিন প্রবলতর হয়ে উঠলো। এই সময়ে কাপ্তেনের অন্যত্র চলে যাবার কথা হলো। সে-সংবাদ শার্লোটের কানে শোনালো যেন অতি-নিকটে বাজ পড়ার শব্দ। কিন্তু সে নিজের

আকুলতা গোপন করতে পারলে। একদিন জল-ভ্রমণের শেষে শার্লোট ও কাপ্তেনের নৌকা চড়ায় ঠেকে গেল। কাপ্তেন কোলে করে' শার্লোটকে ডাঙায় তুলে দিলে। সেই সময়ে সে শার্লোটকে চুম্বন করলে, শার্লোটও প্রতিচুম্বন করলে। কিন্তু এরপর থেকেই শার্লোট হলো আত্মস্থ। কাপ্তেনও আত্মস্থ হলো। কিন্তু এডুয়ার্ড আর ওটিলীর ভাবাবেগ বেড়েই চললো। শার্লোটের প্রতি ওটিলীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হলো। একদিন সে এডুয়ার্ডকে জানালে যে কাপ্তেন তার বাজনার নিন্দা করেছে শার্লোটের কাছে। তাতে এডুয়ার্ড খুব ক্ষুণ্ণ হলো, বললে, তার আর কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই। তার প্রবল ধারণা জন্মালো শার্লোটও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।

কাপ্তেন চলে গেল। শার্লোট সে-আঘাত সামলে নিলে। সে ভাবতে পারলে এর পর ভবিষ্যৎ আর তার জন্য সহজ সরল থাকবে না কিন্তু তাই বলে' দুঃখময়ই বা হবে কেন!

এডুয়ার্ড কিন্তু তার ভাবাবেগে দিন দিন বেশী হাবুডুবু খেতে লাগলো। একদিন শার্লোট এজন্য তাকে তিরস্কার করলে। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। এডুয়ার্ড বুঝলো শার্লোটের সন্তান-সম্ভাবনা; তখন সে কিছুকাল নির্জনবাস করতে স্বীকৃত হলো, আর শেষ পর্যন্ত সৈন্যদলে যোগ দিলে। ভাবলে, সেখানে তার জীবনের গতি-পরিণতি দেখে সে জানতে পারবে ভগবানের কি অভিপ্রায়।

এডুয়ার্ডের চলে যাবার পরে দীর্ঘকাল গত হলো। এই সময় শার্লোটের কাটলো বিষয়-সংক্রান্ত মোকদ্দমায়, গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি কাজে; আর ওটিলীর মনে চললো এডুয়ার্ডের জন্য ভাবনা। তার ডায়ারি নানা মন্তব্যে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে লাগলো, আর তার একটি কাজ হলো পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান। তার ডায়ারির উক্তি মোটের উপর গ্যেটের উক্তি, কয়েকটি এই:

নির্বোধ ও জ্ঞানী উভয়েই নিরুপদ্রব। অর্ধ নির্বোধ আর অর্ধ জ্ঞানীরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানব-পরিবারের জন্য বিঘ্নকর।

প্রতিভা অমর নয়—মাঝারির জন্য এর চাইতে বড় সান্ত্বনার কথা আর নেই।

শ্রেষ্ঠরা সব সময়েই তাঁদের শতাব্দীর কোনো না কোনো দুর্বলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে শিল্পবিষয়ক আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। ওটিলীর শিক্ষক এই মত প্রকাশ করেছে: ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে পার্থিব ও অপার্থিব এই দুয়ের মিশ্রণ, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর সহায়তায় অপার্থিব ভাব প্রকাশ, অবাঞ্ছিত—এক্ষেত্রে রূপ-পরিকল্পনা নয় রূপবিহীনতাই শ্রেষ্ঠ ভাবদ্যোতক।—ইহুদী ও মুসলমানের প্রতীক-বিরোধী মনোভাবের প্রতি এখানে কবি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই শিক্ষকের আর একটি মত এই: শিক্ষকের লক্ষ্য বিক্ষোভহীন পরিবর্তন সাধন।

দীর্ঘদিন পরে এডুয়ার্ড ফিরে এল। শার্লোট এক পুত্র লাভ করেছিল। এডুয়ার্ড দেখলে, তাদের সন্তানের চোখমুখ কতকটা ওটিলীর মতো, কতকটা কাপ্তেনের মতো। তার

মনে পড়লো তার আর শার্লোটের সেই রাত্রির সেই অদ্ভুত মিলনের কথা! বুঝলে সে, দেহে তারা নিষ্পাপ থাকলেও মনের দিক দিয়ে পতিত হয়েছে—তাদের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়েছে। সে শার্লোটকে বললে: মাঝখানে তাদের অতীতের জীবনধারা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রে' তারা ভুল করেছিল, মানুষ প্রতি দশ বৎসরে সম্পূর্ণ বদলে যায়, সে ক্ষেত্রে পেছনের দিকে না তাকিয়ে তাদের সামনের দিকে তাকানো উচিত ছিল। সে প্রস্তাব করলে: তাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হোক, আর সে ওটিলীকে ও শার্লোট কাপ্তেনকে বিবাহ করুক। কিন্তু জল-ভ্রমণ থেকে ফিরবার কালে ওটিলীর হাত থেকে শার্লোটের শিশু পড়ে মারা গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে শার্লোট বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হলো, তার মনে হলো ভাগ্যের এই নির্দেশ; কিন্তু ওটিলীর মনের উপরে এর প্রভাব হলো অন্য রকমের। সে তার খেয়ালীপনা ও আবেগ-উন্মত্ততার অবাঞ্ছিততা সম্বন্ধে সচেতন হলো, বুঝলে: সুখ তার জন্য আর নয়, এডুয়ার্ডকে সে আর লাভ করতে পারে না, পারা উচিত নয়, উদ্দাম আবেগ-দানবের প্রভাবাধীন হয়ে সুখের পথ সে পরিত্যাগ করেছে—জীবনের পথ সীমা-অলঙ্ঘনের পথ, আবেগ-উন্মত্ততার পথ নয়। সেবাব্রতে সে অবশিষ্ট জীবন ব্যয় করবে এই উদ্দেশ্যে পালিয়ে গিয়ে এক পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েদের লালনপালনের ভার নিলে। তাকে ফিরিয়ে আনা হলো; কিন্তু সে মৌনব্রত গ্রহণ করলে, আহারও প্রায় ত্যাগ করলে। এডুয়ার্ড অনুভব করলে ওটিলী যেন উচ্চতর গ্রামের মানুষ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের পরস্পরের মনের আকর্ষণ হলো অপূর্ব, মনের দিক থেকে তারা দুজনে যেন মিলে এক হয়ে গেল। এডুয়ার্ডের কাছ থেকে ওটিলী এই প্রতিশ্রুতি নিলে যে তার মৃত্যুর পরে এডুয়ার্ড আত্মহত্যা করবে না।

এই সময়ে আবার এলো মিটলার। কথাপ্রসঙ্গে সে একদিন বাইবেলের দশ আজ্ঞার জোরালো সমালোচনা করলে। তার মতে নিষেধাত্মক আজ্ঞা অনিষ্টকর। পিতামাতাকে সম্মান কর—একথা খুব ভাল, কিন্তু নরহত্যা করো না কথাটা ভাবালুতায় ভরা, যেন মানুষকে হত্যা করায় মানুষের আনন্দ রয়েছে। 'নরহত্যা নিষিদ্ধ' ছেলেপিলেদের একথা না শিখিয়ে শেখানো উচিত মানুষকে সাহায্য করার কথা, মানুষের কাজে লাগবার কথা। ষষ্ঠ আজ্ঞা ত তার অসহ্য, তার মতে বর্বর কুরুচিপূর্ণ এই আদেশ, এতে বরং অল্পবয়স্কদের মনে কুপথে পা বাড়ানোর কৌতূহল জাগায়। এর পরিবর্তে তাদের মনে জাগানো চাই বিবাহিত নরনারীর সুখসুবিধা বাড়ানোর চিন্তা। এই শেষ কথা যখন হচ্ছিল তখন ওটিলী সেই ঘরে প্রবেশ করছিল। প্রবেশ না করে' সে ফিরে গেল। এই কথার প্রভাব তার মনের উপরে হলো মারাত্মক। বিবাহিত জীবনে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এই দুঃখে তার প্রাণপাখী অচিরে তার জীর্ণ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করলে।

তার শোকে এডুয়ার্ড আহার ত্যাগ করলে। ওটিলীর অনুগমন করতে তার দেরী হলো না। তার অশান্ত আত্মা এতদিনে যেন শান্ত হলো। কবি মন্তব্য করেছেন:

পূত-আত্মা ওটিলীর চিন্তায় এড়ুয়ার্ড শেষ নিশ্বাস মোচন করলে; কাজেই তাকে বলা যায় ভগবৎ-করুণা-অভিষিক্ত।

শার্লোট ও কাপ্তেন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে' চললো।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন :

> কারো চোখেই না পড়ে পাবে না, মনের এক গভীর ক্ষত এতে টনটন করছে, আরোগ্য হতে তা ভয় পায় : ভস্মাধারের মতো এতে আমি গভীর অনুরাগে সঞ্চিত করেছি আমার বহু বেদনাময় অভিজ্ঞতা।

এ সম্পর্কে তাঁর অন্য একটি উক্তিও স্মরণীয় :

> স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলীতে এমন একটি আঁচড় নেই যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার না হয়েছিল, কিন্তু কোনোটিই ঠিক সেই ভাবে নেই যেভাবে ঘটেছিল।

এই শেষোক্ত উক্তিটিকে জ্ঞান করা যেতে পারে সাহিত্য-সৃষ্টির এক মূলসূত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এই সাহিত্যিক সত্যকে রূপ দিয়েছেন এই ভাবে :

> ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বলাবাহুল্য সাহিত্যে সত্য ও কল্পনার এই যোগাযোগের তত্ত্বটি দুরূহ। এর যথার্থ উপলব্ধির পথে খেয়ালীপনা বিচিত্র ভঙ্গিতে বিঘ্ন ঘটায়। তাই সাহিত্যিক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মে অনেকে কিন্তু হতে পারে কম লোকেই।

এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রবল হয়েছিল। এ আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সেই অভিযোগের সুর ক্ষীণ হতে দেরী হয়নি। এর মন্থর বর্ণনভঙ্গি অনেকের বিরক্তির কারণ হয়েছে—বিশেষ করে' অ-জার্মান সমালোচকদের। কিন্তু মোটের উপর এই গ্রন্থ যে এক অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি—জীবনের এক গভীর অর্থপূর্ণ আলেখ্য—সে সম্বন্ধে সব সমালোচক একমত। স্বভাব-বিহিত আকর্ষণ আর বিচারের শক্তি দুইই রূপায়িত হয়েছে এতে—বিচার এতে হয়েছে চিত্তাকর্ষক। এই শেষোক্ত সিদ্ধি কেবল সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্পীদের পক্ষেই সম্ভবপর। এর প্রত্যেকটি চরিত্র বিশিষ্ট, শ্রদ্ধার যোগ্য, বিশেষ করে' প্রধান চার জন। জীবনের গভীর বোধ তাদের প্রত্যেকে বিদ্যমান,—তারা যেন সজাগভাবে অনুভব করছে তাদের উন্নত প্রকৃতিতে অন্ধ প্রেম-দেবতার নির্মম অত্যাচার। কবি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব যেন দুই ভাগে ভাগ করে' দেখেছেন এড়ুয়ার্ডে আর কাপ্তেনে।

হেরমান ও ডোরোতেয়ায় কবি এঁকেছেন প্রেম ও বিবাহের আনন্দময় দিক, আর স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলীতে এঁকেছেন তার সঙ্কটময় দিক। কবি এতে স্থায়ী বিবাহ-বন্ধনের সপক্ষে মত দিলেন না বিপক্ষে মত দিলেন সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়ত

কোনো পক্ষেই মত দিলেন না। তবে প্রবৃত্তির উদ্দামতা, সুখ-লালসা, এসবের পথ যে জীবনের পথ নয়, সে-কথা বল্লেন স্পষ্টভাবে। রোমান্টিকদের পথ আর তাঁর পথ এইখানে নিঃসংশয়িতভাবে পৃথক।

কবির বৃদ্ধ বয়সের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও জ্ঞানগর্ভ উক্তির প্রাচুর্যে অলঙ্কৃত। প্রায় প্রত্যেক চরিত্রের মুখে কবি যথাযোগ্য জ্ঞানের কথা বসিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র উপরে গ্যেটের স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলীর কিছু ছায়া পড়েছে মনে হয়।

আত্মচরিত

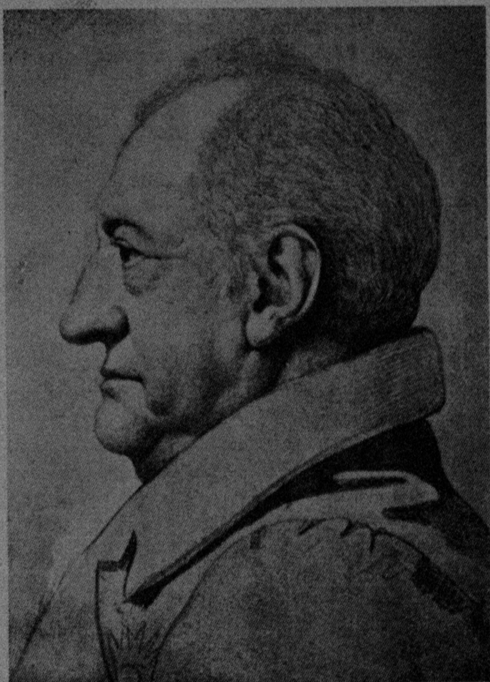
১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গ্যেটের রচনাবলীর এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি দেখলেন তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা এ পর্যন্ত যে ভাবে প্রকাশিত হয়ে এসেছে তাতে সেসবের কালক্রম বোঝা অসম্ভব, সেজন্যে সেসবের অর্থোদ্ধারও পাঠকদের জন্য দুঃসাধ্য। তাঁর জীবনের যেসব ঘটনা তাঁর রচনাসমূহের মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছে সেসব আনুপূর্বিক বিবৃত করার সংকল্প তিনি করলেন।

প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল শুধু রচনাগুলোর উৎপত্তির কথাই তিনি বলবেন। কিন্তু লিখ্‌তে গিয়ে দেখলেন বিস্তারিতভাবে স্থান কাল ও বন্ধুবান্ধবদের প্রভাবের কথার উল্লেখ না করলে তাঁর শ্রম হবে অর্থহীন। পরবর্তীরা যে তাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অজ্ঞ থাকে সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিস্তৃতভাবেই তিনি তাঁর জীবনের ইতিহাস আরম্ভ করলেন। এজন্য তাঁর কৈশোরে প্রচলিত ও প্রচারিত বহু পুঁথিপত্র তিনি সংগ্রহ করেন, তাঁর যেসব বন্ধু জীবিত ছিলেন তাঁদেরও স্মরণাপন্ন হন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বেটিনার সংগ্রহও তাঁর কাজে লাগে।

তাঁর আত্মচরিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় খণ্ড ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, আর চতুর্থ খণ্ড ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে। চতুর্থ খণ্ড এত দেরীতে প্রকাশের কারণ লিলি তখনো বেঁচে ছিলেন। কবির ভাইমার-আগমনের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের ঘটনা এই আত্মচরিতে আছে। এর পরের ঘটনা বিবৃত করতে তিনি আর অগ্রসর হন নি সম্ভবত এই কারণে যে সে-ক্ষেত্রে ভাইমার-দরবার-সংক্রান্ত অনেকের অপ্রিয় আলোচনা এড়িয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো।

এ এক বিরাট গ্রন্থ। এর কিছু কিছু অংশ আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছি।

গেটের এই আত্মচরিত সাহিত্য-জগতে বিখ্যাত। ইয়োরোপের যে সব শ্রেষ্ঠ আত্মচরিত, যথা সেইন্ট অগাস্টাইনের আত্মচরিত আর রুসোর আত্মচরিত, সেসবের সঙ্গেই এর তুলনা করা হয়ে থাকে। সেইন্ট অগাস্টাইনের (৩৫৪-৪৩০) আত্মচরিত তাঁর পাপজীবন



৬৮ বৎসর বয়সে

থেকে পুণ্যজীবনে পরিবর্তনের কাহিনী। রুসোর আত্মচরিত যথেষ্ট মানবিকতাপূর্ণ সেই সঙ্গে আত্মশ্লাঘা দোষে দুষ্ট। এ সবের সঙ্গে তুলনায় গেটের আত্মচরিতের স্বাভাবিকতা ও অনাড়ম্বর পরমাশ্চর্য্য। এক প্রখরদৃষ্টি কিন্তু সহৃদয় শিল্পী এতে তুলিকা-হাতে বসেছেন আর অবলীলাক্রমে পাঠকদের উপহার দিয়ে চলেছেন চিত্রের পর চিত্র; কোনো পক্ষপাত কোনো বিক্ষোভ নেই তাঁতে, নিজের অতীতকেও তিনি দেখছেন আর আঁকছেন অনাসক্ত কৌতূহল নিয়েই।

কবি এর নাম দেন Dichtung und Wahrbeit -কল্পনা ও সত্য। সত্য অর্থাৎ যথাযথ ঘটনা, কবির বর্ণনার বিষয়, কিন্তু যেহেতু তিনি বর্ণনা করছেন অতীতের ব্যাপার, আর তাঁর ভিতরে রয়েছে কবি-কল্পনা –জীবন সম্বন্ধে মহত্তর চেতনা—সেজন্য তাঁর বিবৃতিতে সেই সৃষ্টিধর্মী কল্পনার রং লাগা স্বাভাবিক। "আলাপে" তিনি বলেছেন :

> এর নাম আমি দিয়েছিলাম কল্পনা ও সত্য যেহেতু, আমার ধারণা, এই গ্রন্থে মানব-জীবনের কিছু কিছু প্রতীক রূপলাভ করেছে। এতে মহত্তর প্রবণতার ফলে নিম্নস্তরের যাথার্থ্য থেকে উচ্চতর অধিরোহণের ছবি ফুটেছে।··· জীবনের ঘটনার মূল্য সত্যতা থেকে নয় অর্থপূর্ণতা থেকে।

তাঁর কৈশোরের চিঠিপত্রে তাঁর তারুণ্যের যে উদ্দাম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আত্মচরিতে তিনি হয়েছেন তার তুলনায় অনেক ভব্য, এই অভিযোগ তাঁর পূর্ববর্তী সমালোচকেরা করে' গেছেন, তাঁর আত্মচরিতকে তাঁরা যথেষ্ট প্রামাণ্য জ্ঞান করেন নি। কিন্তু তাঁর একালের সমালোচকদের চোখে তাঁর আত্মচরিতের এই সব ত্রুটি নগণ্য, তাঁর এই গ্রন্থকে তাঁরা তাঁর কৈশোর ও যৌবন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রামাণিক জ্ঞান করেন।

ব্রাণ্ডেস বলেছেন, গ্যেটের গদ্য রচনাবলীর মধ্যে আত্মচরিত সব চাইতে জনপ্রিয়।

প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান

বাইবেলের সঙ্গে গ্যেটের নিবিড় পরিচয় হয় অল্প বয়সেই। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত প্রাচ্যজীবনযাত্রা তাঁর বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। কালে কালে প্রধানত অনুবাদের সাহায্যে তিনি প্রাচ্য জাতিসমূহের ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত হন। এক সময়ে তিনি নাকি ইচ্ছা করেছিলেন বেদ ছন্দে অনুবাদ করবেন। শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত শ্লোকটি তিনি লেখেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে।

কোরানের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন তরুণ বয়সে। কিন্তু ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হাফিজের কবিতার জার্মান অনুবাদ পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হন যে মূল পারসী ও আরবী কিছু কিছু শেখেন, আর পারসী গজলের ভঙ্গিতে, কখনো কখনো রীতিতে, কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ফরাসী-বিপ্লব, নেপোলিয়নের আক্রমণ, ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীতে যে রাজনৈতিক মত্ততা দেখা দেয় তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা যে তাঁর এই প্রাচ্য-প্রীতির একটি কারণ এই কবিতা-গ্রন্থের গোড়াতেই রয়েছে সে-কথা।

এই সব কবিতা প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান § (West-Eastern Divan) নামে স্থায়ী আকার লাভ করে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তরুণী বন্ধুপত্নী মারিয়ানা ফন ভিলেমার-এর সঙ্গে তাঁর যে প্রীতির যোগ স্থাপিত হয় তাতেই রচিত হয় এর শ্রেষ্ঠ অংশ 'জুলায়খা-নামা' যথাস্থানে সে কাহিনী বিবৃত হবে।

এই গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে এর অনেকখানি পরিচয়। কবি এতে হয়েছেন একজন প্রাচ্যদেশীয় মুসলমান-কবিচূড়ামণি হাফিজের শিষ্য ও বন্ধু—কোরান তাঁর ধর্মগ্রন্থ, মোহম্মদ তাঁর ধর্মগুরু আর প্রাচ্য ভঙ্গিতে তিনি 'গজল' রচনা করে' চলেছেন, তাতে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বিজ্ঞতা ও প্রেম-তন্ময়তা, কিন্তু এ বিষয়েও তিনি সচেতন যে পুরোপুরি প্রাচ্য-মনোভাবসম্পন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি যে প্রতীচ্য দেশীয় সে কথা ভুলবার নয়, তাই তাঁর এই সব কবিতা প্রতীচ্য-প্রাচ্য। এর অনেক পদে রয়েছে হাফিজের পদের প্রতিধ্বনি। সাদীর পদ, কোরানের বাণী, এ সবের প্রতিধ্বনিও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়—অনুবাদক Rogers-এর গ্রন্থে সে সবের উল্লেখ আছে। (Rogers ও Bowring দুইয়েরই সাহায্য আমরা নিয়েছি)।

এই সব কবিতা গ্যেটের শেষ বয়সের এক শ্রেষ্ঠ দান। এর কোনো কোনো কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রভাবে ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজে প্রাচ্য-প্রীতি ঘনীভূত হয়।

এই গ্রন্থ বারো খণ্ডে বিভক্ত—প্রত্যেক খণ্ডের এক একটি পারসী নাম। প্রথম খণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে মোগান্নিনামা অর্থাৎ গায়কের বই বা গায়ক-খণ্ড। তার সূচনায় কবি বলেছেন: আব্বাসীয় যুগে বার্মেকী বংশীয় মন্ত্রীদের শাসনাধীনে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন চলেছিল তেমনি বিশ বৎসর কাল ধরে' অর্থাৎ সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব এই দুয়ের মধ্যবর্তী কালে, তিনিও আনন্দিত মনে করতে পেরেছিলেন জ্ঞান ও কবিত্বের চর্চা।

এর প্রথম কবিতার নাম দেওয়া হয়েছে—হিজ্‌রা, অর্থাৎ দেশ-ত্যাগ – কবি রাষ্ট্র-বিপ্লব-দুষ্ট ইয়োরোপ ত্যাগ করে' চলেছেন শান্ত গভীর প্রাচ্যে:

উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম সর্বত্র লেগেছে ভাঙন,
সিংহাসন হচ্ছে বিধ্বস্ত, রাজ্য করছে টলমল,
পালিয়ে চল নির্মলতর প্রাচ্যে,
সেখানে গোষ্ঠীপতির মণ্ডলে জমবে উৎসব,
সেখানে প্রেমে মদিরায় আর গানে
খিজিরের † অমৃত দান করবে তোমাকে তারুণ্য।

† খিজির মুসলমানী মতে অমৃতের ভাণ্ডারী।

§ দিউয়ান = কবিতা-সংগ্রহ, দরবার গৃহ।

সেখানে আজো বিরাজ করে পবিত্রতা আর সত্য,
সেখানে সবাইকে নিয়ে যাব আমি
গভীরে—সকল কিছুর উৎসমূলে,
সেখানে অশেষ মহিমায় আজো লাভ হয়
স্বর্গের বাণী মর্ত্যের ভাষায়··· ।

সেখানে পিতা-পিতামহদের কথা তারা স্মরণ করে প্রীতিভরে,
বিজাতির সামনে তারা কখনো নোয়ায়নি শির,
সেখানে যুবকদের দলে খেলব আমি বর্শা ;
সন্দেহ সেখানে স্বল্প, সত্য সুপ্রশস্ত .
বাণী সেখানে শ্রুত হয় একান্ত মনোযোগে,
যেহেতু বাণী মুখনিঃসৃত বাণী ।

সেখানে বিচরণ করব আমি রাখালদের দলে,
মরুস্থানে বাঁধব বাসা,—
উটের কাফেলা নিয়ে যাব বাণিজ্যে,
আমার পণ্য হবে কাফি শাল কস্তুরী ,
প্রান্তরের বিচিত্র পথ
নিয়ে যাবে আমাকে নগরে নগরে ।

বন্ধ বন্ধুর পাহাড়ী পথ—
হে হাফিজ, তোমার গানের রং সেখানে যায় খুলে,
যখন আনন্দিত নকীব
তার অশ্বতরে আরূঢ় হয়ে দুলে দুলে গায় সেই গান ,
তাতে আকাশের তারাদলের ঘুম যায় টুটে
আর আগুয়ান দস্যুরা হয় সাঁবধান ।

স্নানাগার, সরাইখানা, সর্বত্রই
ওগো পুণ্যশ্লোক হাফিজ, স্মরণ করি আমি তোমার কথা,
(আর স্মরণ করি) যখন আমার প্রিয়া তার গুণ্ঠন উন্মোচিত করে'
এলিয়ে দেয় তার অগুরু বাসিত কেশভার ।
কবি-প্রেমিকের গান
উন্মনা করে বেহেশ্‌তের হুরীদেরও ।

কবিদের এই সৌভাগ্যে হচ্ছ ঈর্ষান্বিত
অথবা করতে চাও তাদের অপকার ?
তাহলে জেনে রেখো, তাদের দীর্ঘশ্বাস
স্বর্গের দ্বারে দ্বারে
আঘাত করে' ফেরে প্রবেশ পথের জন্যে, আর
শেষে প্রভাব বিস্তার করে অনন্ত জীবনে।

এই কাব্য আকারে বড় নয়। এর অনেকগুলো কবিতার পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করব। গীতিকবিতার—বিশেষ করে' প্রেমের কবিতার—গদ্যানুবাদ অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই আমরা দিচ্ছি। প্রথম খণ্ডের আরো কয়েকটি কবিতা এই :

স্বাধীনতা-বোধ

ঘোড়ার সওয়ার হয়ে আমি ছুট্‌বো উল্লাসে।
তোমরা আঁকড়ে পড়ে থাকো তোমাদের তাবু আর কুটীর,
আমি আনন্দে ছুটবো দূরে দুরান্তে,
আমার উষ্ণীষের উর্ধ্বে বিরাজ করে শুধু আকাশের তারা।

প্রান্তরে ও সমুদ্রে পথপ্রদর্শকরূপে
তিনি আকাশে স্থাপন করেছেন তারাদল···।
তোমরা খুশী হও তাদের দেখে
যখন উর্ধ্বে কর দৃষ্টিপাত।

* * *

কবচ

ইচ্ছা ও আগ্রহ যদিও আমাদের মর্ত্যের বস্তুর জন্যে,
তবু অশ্রান্ত গতি তার মহত্তর লক্ষ্যের অভিমুখে।
আমাদের আত্মা এখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনা ধুলায়,
নিজের শক্তিতে সে মাথা তোলে উর্ধ্বপানে।

* * *

চার অনুগ্রহ

সমস্ত আরব-সন্তান স্বাধীনভাবে দূরে দুরান্তে
ছুটিয়ে চলবে তাদের ঘোড়া,
সে-জন্য আল্লাহ্ তাদের সবার জন্যে
বিধান করেছেন চারিটি অনুগ্রহ।

প্রথম অনুগ্রহ পাগড়ী, রাজমুকুটের চাইতেও
শোভন ও নয়নাভিরাম ;
দ্বিতীয় অনুগ্রহ তাঁবু, যেন ইতস্তত:
বিচরণ করতে পারে তারা যেমন খুশী।

তৃতীয় অনুগ্রহ তরবারি, পাহাড় ও প্রাচীরের চেয়েও
দক্ষতর তাদের মর্যাদা রক্ষায় ;
চতুর্থ অনুগ্রহ কবিত্ব---সকৃতজ্ঞ ও হিতকর—
কুমারীরা কান পাতে তা শুনতে।

স্বীকারোক্তি

বাক্সে আগুনকে যায় না লুকোনো,
কেননা দিনে ধোঁয়া দেখিয়ে দেয় তার অস্তিত্ব,
আর রাতে একেবারে নগ্ন হয়ে পড়ে তার শিখা।
তেমনি ভাবে সহজ নয় প্রেমকে লুকিয়ে রাখা ;
যতই কর তার আচ্ছাদনের আয়োজন
নিঃসন্দেহে তা প্রকাশ পাবে দীপ্ত চোখে।
সব চাইতে কঠিন কবিতা লুকিয়ে রাখা,
ঢাকা দেওয়া যায় না তা কিছু দিয়েই।
কবি যদি সদ্য লিখে থাকে কবিতা
তবে আবিষ্ট করবে তা তার সমস্ত চেতনা,
আর যখন এটি দাঁড় করানো হবে পাকাখাতায়,
তখন সারা জগৎকে হতে হবে তার জন্য ব্যগ্র ;
খুশীই হও আর বেজারই হও,
কবির উৎসাহের অন্ত নেই প্রত্যেককে তা পড়ে শোনাতে।

উপাদান

কি কি উপাদানে
রচিত হয় উৎকৃষ্ট কবিতা,
দশে যা পড়ে হয় খুশী,
বিজ্ঞরাও হন না যাতে নিরানন্দ ?

প্রথম কথা

প্রেম হবে বিষয়বস্তু যখনই গাইবে গান ,
যদি প্রেমের কথা ছড়িয়ে থাকে গানের সর্বত্র,
তবে সেই গান শোনাবে বেশী ভাল।

পেয়ালার ঠুন-ঠুনও চলবে সব সময়ে
—যে পেয়ালা থেকে উছলে পড়ে লাল মদ ঃ
যারা প্রেম করে আর মদ টানে
তাদের হাত দিয়েই ওৎরাবে সেরা মালা।

এর সঙ্গে মেশা চাই অস্ত্রের ঝনঝনা
তুরী-ভেরীর নিনাদ,
যেন ভাগ্যের প্রসন্নতার দিনে
বিজয়ী বীরদের দেখি আমরা অমর রূপে।

সর্বশেষে, যা হীন
কবি যেন তার প্রতি হানে কঠিন ঘৃণার দৃষ্টি ঃ
সুন্দরের সঙ্গে সেই হীনের ঘটবে সজ্ঞান যোগ
সইবে না তা সে কখনো।

এই আদিম চারের মিশ্রণে,
কবি বাধবে তার বিচিত্র গান,
তাহলে হাফিজের মতো সমস্ত ভুবনে
সর্বদা ছড়াবে সে প্রাণ ও আনন্দ।

দিশাহারা

তটিনীর বাম তীরে
বাজে আনন্দের বাঁশি ,
দক্ষিণে প্রান্তরে
ওঠে সমর দেবতার ভেরী-নাদ।
সেই বাঁশির সুর
শুনতে চায় মন,
কিন্তু ভেরী-নাদে
ঢাকা পড়ে তা অচিরে।

তবু বাজে আনন্দিত বাঁশি
সমর-ডঙ্কার মধ্যে :
বকি আমি প্রলাপ, হই উন্মাদ,
আশ্চর্য কেন হও এতে ?
ধ্বনিত হচ্ছে সেই বাঁশির সুর ;
নাদিত হচ্ছে সেই ভেরী :
আমার চেতনায় ঘটে যদি বিকার
বিস্ময়ের হেতু আছে কি !

টীকাকার বলেছেন, এই কবিতার মূলের অনুযায়ী অনুবাদ দুঃসাধ্য। সমর ও শান্তি উভয়ের প্রলোভন-জাত যে মানসিক বিক্ষোভ তাই এখানে কবির বর্ণনার বিষয়।

বর্তমানে অতীত

শিশির-সিঞ্চিত গোলাপ ও লিলি
ফুটেছে আমার বাগানে ;
গাছপালার সাজ পরে' চেনা পাহাড়
তুলেছে তাদের উঁচু শির।

*　　*　　*

ভেসে আসছে সেদিনের সুরভি,
যেদিনে আমরা দুজনে হয়েছিলাম প্রেমের হাতে ঘায়েল,
আমার বীণার কোমল তার
কেঁপেছিল প্রভাত-রশ্মির সাথে।

বনের কোল থেকে
আসছিল শিকারীদের গলা-ছেড়ে গাওয়া গান,
প্রাণ মন
করেছিল আনন্দিত উল্লসিত।

তেমনি পল্লবিত হয়ে চলেছে বনানী,
খুশী হও এসব দেখে !
তুমি যেখানে পেয়েছ সুখ
অপরেও সুখী হোক সেখানে।

আমরা শুধু ভাবি নিজেদের কথা—. .
কেউ না করুক আমাদের এমন বদনাম।
গান ও খুশীর ডালি নিয়ে
আমরা হব হাফিজের চিরসাথী।

গান আর মূর্তি-পূজা

মাটি দিযে যত রকমে মূর্তি গড়া যায
তাতে প্রকাশ পায় য়ুনানীর কারিগরি ;
তার নিজের হাতের তৈরী সন্তানরা
ভরুক তার বুক আনন্দে।

কিন্তু আমাদের আনন্দ
ফোরাতের স্রোতে খেলা করা ;
তার অমল তরঙ্গে
দুলে দুলে ফেরা।

আমার আত্মার দাহ তাতে হয় প্রশমিত,
আর ওঠে অফুরান গান ;
কবির পবিত্র হাতে
দলা বাঁধে জল।

টীকাকার বলেছেন: সতী নারী বিনা পাত্রে হাতে করে' জল আনতে পারে এই হিন্দু-উপকথার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। কবি গ্রীক-শিল্প আব প্রাচ্য কাব্যকলার পার্থক্যের কথা বলেছেন। গ্রীক-শিল্প সুঠাম, দৃঢ়, তার সঙ্গে তুলনায প্রাচ্য কাব্যকলা যেন জলের তরঙ্গ। কিন্তু এই নির্মল তরঙ্গে লাভ হয আত্মার তৃপ্তি, আর কবি এই তরঙ্গ দিযেও গড়তে পারেন শিল্পমূর্তি।

পবিত্র কামনা

দশের মনে ত ধরবে না,
তাই বলি শুধু জ্ঞানীদের কাছে
যা মরতে চায় আগুনে পুড়ে
প্রিয় আমার সেই প্রাণী।

* * *

দূর তাকে করে না শ্রান্ত
মন্ত্রে বশীভূতের মতো সে চলে উড়ে,
যথা পতঙ্গ বহ্নিমুখ—
অবশেষে সে হয় ভস্মসাৎ।

যদি না বোঝো এই কথা :
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে লাভ কর মহত্তর জন্ম
তাহলে ত তুমি নিরানন্দ অতিথি
আঁধার নিরানন্দ মাটির পরে।

* * *
* * *

আছে এমন খাগড়া
জগৎ যা থেকে পায় চিনি মিছরি ;
তেমনি লিখছি আমি যে খাগড়া দিয়ে
ঝরে যেন তা থেকে মধু।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হাফিজ-নামা

তার সূচনায় কবি বলেছেন :

যদি ভাবের নাম দেওয়া হয় বর
আর বাণীর নাম দেওয়া হয় বধূ,
তবে তাদের মিলন সে-ই দেখেছে
যে হাফিজের ভক্ত।

হাফিজ নিজেও বলেছেন :

হাফিজের মতো ভাবের মুখ থেকে
কেউ সরিয়ে ফেলতে পারেনি ঘোমটা,
যতকাল ধরে মানুষ রত হয়েছে
বাণীর কেশ-রচনার কাজে।

হাফিজকে কবি জিজ্ঞাসা করছেন :

মোহম্মদ শামস্-উদ্-দীন,
তোমার দেশের লোক
কেন তোমায় নাম দিয়েছে হাফিজ ?

শামস্-উদ্-দীন = ধর্ম-রবি।
হাফিজ = রক্ষক—কোরান যার কণ্ঠস্থ।

হাফিজ উত্তর দিচ্ছেন :

তোমার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলছি।
যেহেতু কোরানের দিব্য নির্দেশ
আজো আমার আনন্দিত স্মৃতিতে
এমন অটুটভাবে আমি বহন করি,
আর ধর্মনির্দেশিত পথে চলি,
যে, দৈনন্দিন জীবনের পাপ তাপ
স্পর্শ করতে পারে না আমাকে আর অন্যান্য মুসলমানকে,
যাঁরাও শ্রদ্ধান্বিত পবিত্র পয়গম্বরের বাণী
আর তাঁর বংশধরদের প্রতি—
এই কারণে তাঁরা দিয়েছেন আমার এই নাম।

তখন কবি বলছেন :

হাফিজ, তাহলে দেখছি
তোমার সম্বন্ধে আমার ভয় পাবার নেই কিছু :
কেননা যখন আমরা ভাবি অপরের ধরণে
তখন আমরাও হই তাদেরই মতো—
যেহেতু আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে আমার অন্তরে
সঞ্চারিত হয়েছিল এক মহান ভাব।…
আমার শান্ত আত্মায়
স্বস্তি নেমে এসেছিল আনন্দময় ধর্মভাবের রূপে,
যদিও সেই ধর্মভাব হয়েছে হৃতগৌরব, অস্বীকৃত, অত্যাচারিত।

এই শেষ ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মভাব সম্পর্কে ভলটেয়ারের ভক্তির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতি গ্যেটের অশ্রদ্ধা। 'আলাপে' এ-সম্বন্ধে তাঁর আরো মন্তব্য পাওয়া যাবে।

বিচার

তোমার সমস্ত কবিকল্পনায়, হে হাফিজ,
রয়েছে নির্বাণহীন সত্যের দ্যুতি।
কিন্তু হেথায় হোথায় ছোটোখাটো এমন কিছুও আছে
যা বৈধতার গণ্ডীর বাইরে।

যে বিচরণ করতে চায় নিরাপদে তাকে জানতে হবে
সাপের বিষ আর তার প্রতিষেধক পৃথক করবার কৌশল।
সব চাইতে ভাল
প্রবল সাহসে মহৎ কর্মে আত্মদান—
যা আনে অন্তহীন দুঃখ
তা থেকে রক্ষা পাওয়া বিবেকী মনের সাহায্যে।
নিঃসন্দেহে সব চাইতে ভাল ভুল না করা।
এই হচ্ছে দীন ইবনে সুন্দ-এর রায় তোমার প্রতি।
(আল্লাহ্‌র করুণা হোক, আর তার সমস্ত পাপের মার্জনা হোক।)

ইবনে সুন্দ কন্‌স্‌তান্তিনোপলের একজন খ্যাতনামা মুফতি ছিলেন।—শুধু হাফিজে নয়, হয়ত সমস্ত মহৎ কাব্যে—অথবা গ্রন্থে—একই সঙ্গে রয়েছে অমৃত আর বিষ, তার একটিকে অপরটি থেকে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা চাই পাঠকদের।* কিন্তু "বিষ" "প্রতিষেধক" এসবের চাইতেও কবির জন্য বড় ব্যাপার হচ্ছে জীবনের পথে অন্তহীন অগ্রগতি—অনাবিল চিত্তে 'ভাল' 'মন্দ' সমস্তের ভিতরে দিয়ে। সেকথা বলা হয়েছে পরের কবিতায় ;

জার্মান কবির ধন্যবাদ

যথার্থ বলেছ পুণ্যাত্মা ইবনে সুন্দ্‌!
কবি চায় তোমাদের মতো তত্ত্বদর্শীদেরই।
কেননা, বৈধতার বাইরে
এই সব ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্যেই
রয়েছে গর্বিত কবির জন্ম-অধিকার,
সেখানে সে আনন্দ সম্ভোগ করে ব্যথায়।
বিষ আর তার প্রতিষেধক
দুই-ই দেখা দেবে তার জীবনে :
বিষ হবে না তার প্রাণঘাতী, প্রতিষেধকে হবে না তার আরোগ্য লাভ।
কারণ প্রকৃত জীবন হচ্ছে
অন্তহীন অনাবিল কর্মতৎপরতা
যাতে অনিষ্টাচরণ নেই নিজের ভিন্ন আর কারো প্রতি।

---

* ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টার-এর 'বস্তুত সাধারণত আমাদের ভুলের বর্ণনা" উক্তিটি স্মরণীয়।

অতএব প্রাচীন কবি আশা রাখুন,
বেহেশ্‌তে লাবণ্যবতী হুরীদের দ্বারা
অভিনন্দিত হবেন তিনি দিব্য তরুণ রূপে।
যথার্থ বলেছ ওগো পুণ্যাত্মা ইবনে সুন্দ।

মুসলমানী মতে বেহেশ্‌তে সবাই হবে তরুণ।

ফতোয়া

মুফতি হাতে নিলেন মিস্‌রি-র সব কবিতা,
পড়ে চললেন একের পর আর ;
তারপর ফেললেন সব আগুনে,
রইল না আর কিছুই সেই সুলিখিত গ্রন্থের।
বল্লেন মহিমান্বিত বিচারক : এম্‌নি ভস্মীভূত হোক সে
যে চলে ও ভাবে মিস্‌রির মতো। মাত্র মিস্‌রি
পেতেও পারে রক্ষা নরকাগ্নির গভীর দাহ থেকে।
কেননা আল্লাহ্‌ প্রত্যেক কবিকে দেন শক্তি,
যদি তার পাপ-চিন্তা তাকে প্ররোচিত করে তার অপব্যবহারে
তাহলে যত্নবান্‌ হোক সে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা অর্জনে।

মিস্‌রি জনৈক তুর্কী কবি। খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য নাকি তাঁর সব রচনা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

সীমাহীন

তোমার শেষ নেই তাই তুমি মহীয়ান,
আরম্ভও নেই তোমার, এই তোমার ভাগ্য।
তোমার গান আবর্তিত হয়ে চলে তারকিত আকাশের মতো.
আদিতে যেমন অন্তেও তেমনি,
মধ্যেও তেমনি দেখতে,
যেমন এর আরম্ভ তেমনি এর শেষ।

তুমি প্রকৃত কবিত্বের আনন্দ-প্রস্রবণ :
তোমার তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করবে কে ?
তোমার মুখ চির-উদ্যত প্রিয়া-মুখ-চুম্বনে,
তোমার হৃদয়োদ্‌গত সঙ্গীত চিরপ্রবহমান আনন্দে,

তোমার কণ্ঠ রক্ত-মদিরার পুলকিত পিপাসু,
তোমার সুন্দর অন্তরে উছলে পড়ে হাস্য।

সমস্ত জগৎ যাক ধ্বংস হয়ে,
হাফিজ, তোমার সঙ্গে শুধু তোমারই সঙ্গে
চলবো আমি দোসর হয়ে। আমরা যমজ
অনুভব করবো সম-আনন্দ ও সম-ব্যথা।
চিরদিন তোমার মতো ভালবাসবো আর মদ খাব,
এই হবে আমার গর্ব, আমার অস্তিত্ব।

হে আমার গান, এইবার জ্বলুক তোমার আপন শিখা,
যেহেতু তুমি প্রাচীনতর আর নবীনতর।

কবি নিজেকে হাফিজের চেয়ে প্রাচীনতর বলেছেন, কেননা সুপ্রাচীন গ্রীক ভাবের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত; আর তিনি নবীনতর যেহেতু তিনি নব্য ইয়োরোপের কবি।

অনুকরণ

তোমার ধরণের মিল আশা করছি শীগ্‌গিরই পারবো আয়ত্ত করতে;
ঐ পুনরুক্তি বরং আমার কানে শোনায় ভাল:
আমি চাই প্রথমে ভাব, তারপর সেই ভাব প্রকাশের যোগ্য শব্দ-সম্পদ;
একই ধ্বনি দ্বিতীয়বার শুনতে ভাল লাগে না আমার,
কেননা সে ক্ষেত্রে সেই ধ্বনির হওয়া চাই বিশেষ-অর্থ-যুক্ত,
তুমি যাতে দক্ষ, হে পরমভাগ্যবান্।

একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন সমর্থ অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে
প্রকাণ্ড শহরে, দাউ দাউ ক'রে তখন জ্বলে ওঠে শিখা,
বাতাসকে আনে ডেকে, আরো বাড়ে তেজ,
সেই স্ফুলিঙ্গ যায় নিভে কিন্তু আগুন ওঠে আকাশে;—
তেমনি ভাবে তোমা থেকে জ্বলেছে এক চিরদীপ্ত শিখা
এক জার্মান চিত্তে অভিনব বীর্য সঞ্চার করতে।

হাফিজের প্রতি

হাফিজ, যদি নিজেকে জ্ঞান করি তোমার সমকক্ষ,
তবে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতা।
প্রবল বেগে গর্বিত ভঙ্গিতে সমুদ্রের বুকে
চলতে পারে জাহাজ,

তার পালে
লাগিয়ে ঝড়ের হাওয়া—
কিন্তু সমুদ্র যদি দীর্ণ করে তাকে
পরিণত হয় তা ধ্বংসস্তূপে।
লঘু সুদর্শন সমৃদ্ধ গানের দল তোমার পানে
ধায় স্নিগ্ধ অনুরাগে।
কিন্তু তাদের দাহ ভস্ম করতে চায় আমাকে,
ধেয়ে আসে যেন আগুনের হল্‌কা।

কিন্তু জাগে আমার মনে এই আনন্দিত ভাবনা,
সঞ্চার করে সাহস—
আমিও বসতি করেছি রবিদীপ্ত দেশে,
বেসেছি সেখানে ভাল।

এই রবিদীপ্ত দেশ কি ইতালি? অথবা কবির প্রেমদীপ্ত দেশ ও কাল? টীকাকাররা একমত নন।

জানা কথা

ওগো পুণ্যাত্মা মহাসম্মানিত হাফিজ,
তোমাকে মৌলানারা বলে রহস্যের রসনা
কিন্তু শব্দের অর্থজ্ঞান
নেই সেই মৌলানাদের এক জনেরও।

তাদের পক্ষে তুমি রহস্য-ঘেরাই বট;
তোমার সব কথা তাদের চিন্তায় অর্থহীন,
আর তোমার নামে অকারণে
চালায় তাদের পচা মদ।

তারা বুঝতে পারে না তোমাকে,
তাই তাদের জন্য তুমি পূর্ণ-রহস্য-মণ্ডিত,
তুমি ধর্মভীরু নও কিন্তু করুণা-প্রাপ্ত!
একথা মানবে না তারা কখনো।

হাফিজের কাব্যের প্রাচ্য পাঠকেরা তাঁর প্রতি সাধারণত যে দৃষ্টিতে তাকান তার প্রতি গ্যেটের এই প্রতিবাদে রয়েছে তাঁর নিজের বিশিষ্টতার পরিচয়। তিনি প্রকৃতিপন্থী

ও জীবনবাদী; তাঁর সেই প্রকৃতিপন্থা ও জীবনবাদের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তাঁর অধ্যাত্মবাদ। হাফিজেও তিনি দেখেছেন অনুরূপ ব্যাপক সত্যানুভূতি—বৈরাগ্য ও ভগবৎ-প্রেম মাত্র নয়।

হাফিজের প্রাচ্য ভক্তদের দলে অবশ্য তাত্ত্বিকদেরই ভিড় জমে নি, জীবনবাদী মহাপ্রাণ ব্যক্তিদেরও সাক্ষাৎকার সে-দলে আমরা সময় সময় পাই। বাংলার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা স্বতই আমাদের মনে পড়ছে।

গ্যেটে অন্য একটি কবিতায় স্বীকার করেছেন হাফিজের প্রাচ্য ভক্তদের ব্যাখ্যা পুরোপুরি মিথ্যা-নাও হতে পারে।

তৃতীয় খণ্ডের নাম ইশ্‌ক্‌-নামা বা প্রেম-খণ্ড

প্রথম কবিতায় কবি স্মরণ করেছেন প্রাচ্য জগতের কতিপয় আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার কথা, যথা রুস্তম ও রুদাবু, য়ুসুফ ও জুলায়খা, ফরহাদ ও শীরীন, মজনু ও লায়লা, জমিল ও বোতেনা আর সোলায়মান ও শেবার রাণী। কবি বলেছেন এদের কাহিনী মনোরম, স্মরণে অন্তরে প্রেম হয় দৃঢ়।

প্রেমের বই

সব বইয়ের মধ্যে সব চাইতে বিস্ময়কর
প্রেমের বই,
একান্ত যত্নে পড়েছি আমি এই বই আগাগোড়া।
খুশীর পৃষ্ঠা এতে বড় কম,
প্রত্যেক খণ্ড ব্যথাময়।
এর বিরাট অংশ বিরহ-কাহিনী,
মিলন এর সব চাইতে ক্ষুদ্র
খণ্ডিত পরিচ্ছেদ। দুঃখের কথা খণ্ডে খণ্ডে
ভয়াবহভাবে বিস্তারিত,
অপরিমেয় অপরিসীম।
কিন্তু হে নিজামী, অবশেষে
তুমি পেয়েছ এর রহস্যের সন্ধান।
একান্ত দুরধিগম্য, কে বুঝবে এর অর্থ?
আর কেউ নয় শুধু পুনর্মিলিত প্রেমিক-প্রেমিকা।

তন্ময়

বিপুল কুঞ্চিত কেশভার ঐ ক্ষুদ্র সুগোল মস্তকে।
সেই সমৃদ্ধ আলুলায়িত কেশদামে দুই হাত ডুবিয়ে দিয়ে,
যদি সাহসী হতাম জীবনে চলতে
তাহলে অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করতাম শান্তি।
যখন চুম্বন করি ঐ মুখ ঐ চোখ ঐ ললাট,
তখন হই নবীভূত যদিও চির-আহত।
এই পাঁচ-জিভ চিরুণী * রাখবো আমি কোথায় ?
আবার নিমজ্জিত হলো তা ঐ মোহন কেশদামে।
আমার কান বঞ্চিত নয় মৃদু সোহাগ-বাণী থেকে,
নেই আমার দেহ-বোধ, অনুভব করছি না কোনো ত্বকের স্পর্শ,
প্রেমপূরিত অন্তরে এমন খেলা কী আনন্দের !
যখন ঘুরি ঐ ক্ষুদ্র সুগোল মস্তকের চতুর্দিকে,
তখন মনে হয়, যদি ঐ আলুলায়িত কুন্তলে
সঞ্চরণ করতে পারতাম অনন্ত কাল ইচ্ছা মাত্রে !
হাফিজ, তুমিও করেছ এই কাজ,
বহু দিন হলো আমরা দুজনে হয়েছি এই পথের পথিক।

সন্তুষ্ট

কত অসার্থক তোমার এই ভাবনা—
সেই কন্যা ভালবেসে হয়েছে তোমার আপনার !
খুশী নই এতে আমি আদৌ।
সে যে মিষ্ট কথার ওস্তাদ।

কবি

এই যদি সত্য হয় তাতেই আমি খুশী,
তার কারণ :
ভালবাসা স্বাধীনতম ইচ্ছার দান,
কিন্তু মিষ্ট কথায় প্রকাশ পায় শ্রদ্ধা।

সমর্পণ

"যাচ্ছ ম্লান হয়ে তবু এত মধুময় !
হচ্ছ ক্ষয়িত, তবু আনন্দ-গান তোমার কণ্ঠে ?"

* পাঁচ আঙুল।

কবি

"অকরুণ হয়েছে আমার প্রতি প্রিয়া ,
মন খুলেই বলবো আজ,
আর গান গাই না আনন্দে ।
চেয়ে দেখ, রাতের প্রদীপ
জ্বলে উজ্জ্বলভাবে কিন্তু পায় ক্ষয় ।"

* * *

প্রেমের ব্যথা একদা খুঁজেছিল নির্জনতা,
এক মরুভূমি, তার সুন্দর মুখ লুকোবার জন্যে ।
আমার শূন্য হৃদয়ে পেয়েছিল সে আশ্রয়
বেঁধেছিল সেইখানে তার নির্জন বাস ।

অবশ্যম্ভাবী

ময়দানে
কে থামাবে পাখীদের কলরব ?
পশমকাটার কালে
কে থামাবে ভেড়াদের চীৎকার ?

বলবে কি আমাকে দুর্বিনীত
যখন টেনে কোঁকড়াচ্ছ আমার পশম ?
হায় পশম-কাটিয়ে অসন্তুষ্ট আমার অস্থিরতায়,
যদিও টানছে সে আমার লোম ধরে' ।

কে রোধ করবে আমার গান,
যখন আকাশে কান পেতে
শুনি মেঘদলের কণ্ঠে
কেমন করে' মোহিত করেছে সে আমাকে ভালবেসে ?

গোপন কথা

আমার মোহিনী প্রিয়ার আঁখিঠারে
চমক লাগে দশজনার :
আমি কিন্তু জানি ভাল মতে
কি অর্থ সেই আঁখির ভাষার ।

বলে সে : আমি ভালবাসি শুধু এরে
আর কাউরে নয় আর কাউরে নয় :
অতএব হে সাধু-সজ্জনের দল
দূর কর তোমাদের যত উৎকণ্ঠা।

আগুন-ভরা কটাক্ষ
হানে সে জনতার পরে,
আমায় কিন্তু জানাতে চায়
কখন ফিরবে মধুর লগ্ন।

চতুর্থ খণ্ডের নাম তফ্‌কির-নামা বা চিন্তা-খণ্ড

সূচনায় কবি বলেছেন :

শোনো শোনো বীণার মধুর উপদেশ,
যাদের বুদ্ধি আছে তাদের লাগবে ভাল ;
সব চাইতে ভাল যে কথা তাও শোনায় বিরক্তিকর
কুটিল কানে।

পাঁচ বস্তু

পাঁচ বস্তুর সঙ্গে পাঁচ বস্তুর কখনো হয় না মিল ;
কান পেতে শোনো সেই কথা।
অহঙ্কারীর অন্তরে কখনো জন্মাবে না বন্ধুত্ব ;
নীচের সভায় করো না বিনয়ের আশা ;
ধূর্তের কখনো লাভ হয় না মহত্ব ;
কৃপণের চোখ করুণ হবে না উলঙ্গকে দেখে :
মিথ্যুকের বৃথা সাধনা ধার্মিক আর বিশ্বাসী হবার জন্যে,
ভুলোনা এসব কথা কখনো, মনে রেখো সব সময়ে।

আরো পাঁচ

কিসে কাটে সময় ?
কাজে।
কিসে কাটতে চায় না তা আদৌ ?
আলস্যে।
কিসে হয় ঋণ ?
দীর্ঘসূত্রতায় ও অমনোযোগে।

কিসে লাভ হয়. সাফল্য ?
ত্বরিত সিদ্ধান্তে।
কিসে বাড়ে সম্মান ?
আত্মবিশ্বাসে।

আমার দোষ-ত্রুটির কথা
বলেছে তারা বহু সময়ে,
তার ফিরিস্তি দিতে
করেছে শ্রমস্বীকার।
যদি ভালবেসে আমার গুণের উল্লেখ
করতো তারা তেমনি,
সুবুদ্ধির মতো সদুপদেশ দিত
আরো ভালো হবার জন্যে,
তবে "শ্রেষ্ঠ মহাত্মা" নিশ্চয়ই
রইত না অনুদ্‌ঘাটিত দীর্ঘ দিন,
যে-মাহাত্ম্যের পূজারীদল
বিরল ধর্মমন্দিরেও।
কিন্তু শেষ কালে
হয়েছি তাদের উপদেশের পাত্র,
দিচ্ছে উপদেশ : অনুতাপে
কল্যাণ হয় পাপীর।

যার অন্তরে জাগে নির্মল প্রেম
তাকে জানেন মাথার উপরকার ভগবান।

জিজ্ঞাসা করো না কোন্ দরজা দিয়ে
এসেছ ভগবানের সুন্দর নগরে,
শান্ত মনে কাটাও সেখানে
যেখানে হয়েছে তোমার অধিষ্ঠান।

নারীর সঙ্গে ব্যবহারে হয়ো খুব সাবধান,
আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন পাঁজরার বাঁকা হাড় থেকে,
তিনিও গড়তে পারেন নি তাকে সোজা করে'।
যদি চাও তাকে নিজের ইচ্ছামতো বাঁকাতে, সে যাবে ভেঙে ;
যদি ছেড়ে দাও তাকে আপন পথে তবে সে হবে আরো বাঁকা।
সুবোধ আদম, গণ্ডগোল এর চাইতে আর কি হবে বেশী ?
নারীর সঙ্গে ব্যবহারে হযো সাবধান ;
তোমার নিজের পাঁজরা যদি যায় ভেঙে তবে সেটি হবে না সুখের।

হজরত মোহাম্মদের একটি বাণীর মর্মও এই।

ফিরদৌসীর বাণী

সংসার, কি নির্লজ্জ আর শয়তান তুমি !
পালন করছ, আনন্দিত করছ, আর হত্যাও করছ।
যে কৃপালাভ করে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে
কেবল তারই জীবন সানন্দ, সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ।

তাহলে সম্পদ বলব কাকে ? সম্পদ হচ্ছে জীবনপ্রদ সূর্যকরের মতো,
তা উপভোগ করে নির্ধন ও ধনবান সমভাবে।
নির্ধনের উপভোগের ত্রুটি না ধরুক ধনবান,
নির্ধনের সেই উপভোগ সমৃদ্ধ, স্বাতন্ত্র্য-গর্বিত।

জুলায়খার বাণী

আমি যে সুন্দরী সে কথা বুঝি আমার আরশির পানে চেয়ে।
বলছ তোমরা, আমারও ভাগ্যে রয়েছে জরা ;
সব-কিছু চির-বর্তমান আল্লাহ্‌র সামনে ;
এই ক্ষণে আমাকে ভালবেসে ভালবাস আল্লাহ্‌কে।

জুলায়খা-নামা দ্রষ্টব্য। যাঁরা বলেন সংসারের সব কিছু নশ্বর তাঁদের কথার প্রতিবাদ রয়েছে এতে। রূপে এই রূপাতীতের দীপ্তি কবির চোখে চিরবিস্ময়ের ব্যাপার।

পঞ্চম খণ্ডের নাম রন্‌জ্-নামা বা খেদ-খণ্ড

সূচনায় কবি বিস্মিত হযে ভাবছেন, এই বয়সে কেমন করে' তাঁর লাভ হলো নূতন কাব্য-প্রেরণা। সেই প্রেরণা ক্রমে ধারণ করেছে প্রবল রূপ—তারকিত আকাশের মতো তা অকূল অতল গভীর। কবি অনুভব করছেন তাঁর যেন দ্বিতীয়বার জন্ম হয়েছে।

প্রাচ্যের জীবন-যাত্রা যে তাঁর ধ্যানের বিষয় হয়েছে এতে তাঁর এই নব প্রেরণা যোগ্য স্ফূর্তি লাভের অবকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যের পর্বতগাত্রে মেঘ চারণা, দস্যু-সমাকীর্ণ পথে বণিকদলের বাণিজ্য-যাত্রা, বিশাল মরুভূমির মরীচিকা, সব কবিকে যেন এক আদিম শক্তি-সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে।

এর অনেকগুলো কবিতায় ফুটে উঠেছে কবি তাঁর সমসাময়িকদের ব্যবহারে যে আঘাত পেয়েছিলেন তার জন্য মৃদু ক্ষোভ আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এর কবিতা-সংখ্যা বেশী নয়, কয়েকটির অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে।

জার্মানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব
বাসনা নয় আমার,
কেননা কঠিন ঘৃণা
তাদের ভদ্র ব্যবহারে।
মুখে তারা জানায় আমাকে প্রীতিসম্ভাষণ,
কিন্তু সবাই আমার জন্যে অন্তরে পোষণ করে আমরণ ঘৃণা।

Rogers এর অনুবাদে এই কবিতাটি আছে, কিন্তু প্রচলিত জার্মান সংস্করণে নেই।

যে লোক হাসি-খুশী আর সাধু-সংকল্প
তাকে জ্বালাতন করে তার প্রতিবেশীর দল;
যতদিন সে জীবন ধারণ করে আপন শক্তিতে
তারা খুশী থাকে তার প্রতি ঢিল ছুঁড়ে।
কিন্তু যখন সে বাস্তবিকই যায় মরে,
তারা সংগ্রহ করে প্রচুর অর্থ
স্মৃতিমন্দির রচনায়
তার সেই সব গুণের স্মরণে—ছিল না যা তাতে।
কি লাভ হয় তাদের এতে
দশজনার উচিত সে কথা ভাবা;
বরং বেশী সঙ্গত মনে হয়
কবরশায়ী বেচারার কথা ভুলে যাওয়া।

ভাল করেই জানো তোমরা প্রবলের দাপট
কখনো লোপ পাবে না সংসার থেকে;
আমি তাই বেশী খুশী হই
বিবেচক প্রবলদের দেখা পেলে।

গ্যেটেকে যাঁরা বলতেন জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধী আর অত্যাচারী রাজশক্তির সমর্থক তাঁদের উক্তির প্রত্যুত্তর এটি।

সমালোচকদের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধেও কবি অনেক ব্যঙ্গোক্তি করেছেন।

তিনি স্মরণ করেছেন, হাফিজকেও তাঁর কালে এমন সব অপদার্থ সমালোচকের অর্থহীন বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল। সাহিত্যিক বোধ ও রুচি সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি বিখ্যাত :

যারা পছন্দ করে ফরাসী রীতি অথবা ইংরেজি রীতি,
জার্মান রীতি অথবা ইতালীয় রীতি,
তারা প্রত্যেকে চায় তাই
যাতে তৃপ্ত হয় তাদের আত্ম-অভিমান।
কোনো বিশেষ রীতি বা রীতি-সমূহ
তাদের কাছে পাবে না শ্রদ্ধা
যদি না তাতে প্রকাশ পায়
তাদের নিজেদের মাহাত্ম্য।

কালকার জন্য কি কাম্য
তা নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় হবে এমন ভাবুকদলের
যদি আজকার সম্মান ও সমাদর
লাভ হয় তাদের অসার ভাবনার।

তিন হাজার বছরের যে না রাখে খবর
সে আছে অন্ধকারে অজ্ঞ হয়ে—
করে' যাচ্ছে শুধু দিন-মজুরি।

তৈমুরের বাণী

কী? দুর্বার ঝড়কে দর্পী বলে'
নিন্দা করছ মিথ্যাভাষী যাজকের দল!
আল্লাহ্ যদি চাইতেন আমি হব ধুলার কৃমি
তবে সৃষ্টি করতেন আমাকে সেই ভাবে।

এই কবিতায় নাকি নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের প্রতি গ্যেটের শ্রদ্ধা-নিবেদন রয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের নাম হিক্‌মত-নামা বা জ্ঞান-খণ্ড

এমন কাব্য-কণিকা পারস্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে সুপ্রচুর :

যাদের জন্ম দুঃসময়ে
দুঃখ-অসুবিধা তাদের গা-সহা।

পড়েছ অদৃষ্টের পরীক্ষায়—
এর কারণ জান কি ?
সে চায় তোমার মাথা হোক ঠাণ্ডা
মুখ বুজে মানো তার বিধান।

কত বড় অধিকার আমার ! কী গৌরবের ! কী মহিমার !
সময় আমার ধনসম্পদ, সময় আমার ফসল-ক্ষেত।

মানুষের সেরা আনোয়ারী বলেন—
—"সর্বত্র সব সময়ে উপকার পাবে
সততা, সুবিবেচনা ও মানুষের প্রতি সমবেদনা থেকে।"

তোমার শত্রুদের কথা ভেবে কেন ব্যাকুল হও ?
কখনো কি পেতে পার বন্ধুরূপে
তাদের, যাদের চোখে তুমি
আজো অভিযোগের বস্তু—নির্বাক তারার মতো ?

চরম নির্বুদ্ধিতা সে কথা সহ্য করার
অজ্ঞরা যখন বিজ্ঞদের বলে—
পর্ব দিনে
বিজ্ঞরা যেন চলে সভ্য ভব্য হয়ে।

যদি ঈশ্বর হতেন অকরুণ প্রতিবেশী
তোমার আমার মতো,
তবে সামান্যই রক্ষা পেতো আমাদের সম্মান,
প্রত্যেককে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি আপন পথে।

স্বীকার করে' নেওয়া যাক প্রাচ্যের কবিরা
আমাদের প্রতীচ্যের কবিদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।
একটি বিষয়ে আমরা দুই দল কিন্তু সমান :
সমকক্ষদের প্রতি আমাদের ঘৃণা একই ধরণের।

যদি বজায় রাখতে চাও আপন ঠাঁই
তবে ঘাড় ফুলোবে বেশী করে' ;

বাজশিকারীরা তাড়িয়ে ফেরে সবাইকে,
বন্ধ বরাহ ব্যতীত।

সে-ই প্রশংসা করবে বীরকে যোগ্য ভাবে
যে নিজে যুদ্ধ করেছে দীর্ঘদিন প্রবল বিক্রমে।
মানুষের মর্যাদা প্রকাশ পাবে কেবল তারই কাছে
যাকে সহ্য করতে হযেছে রোদ-বৃষ্টি।

লোকে যেন চুরি করে তোমাকে ফতুর করতে না পারে
সেজন্যে লুকিযে রাখবে তোমাব সোনা, তোমাব গতিবিধি, তোমার ধর্ম।

কাবণ কি এর যে সর্বত্রই
শুনি অনেক ভাল কথা অনেক বাজে কথাও ?
ছোটরা প্রতিধ্বনি করে বড়দের কথার,
চালায তারা বড়দের কথা নিজেদের কথা বলে'।

প্রতিবাদে ·
কখনো হয়ো না আগুয়ান ;
মূর্খদের সঙ্গে যুঝতে গিযে
বিজ্ঞরা হযে পড়ে মূর্খ।

সত্য কেন এত দূরে
যেন তা গুপ্ত গভীর মাটির তলায ?
সময়ে বিজ্ঞ হতে পারে না কেউ।
যদি মানুষ বুঝতে পারতো যথাসময়ে
তবে সত্য প্রকাশিত হতো আপন মহিমায—
দেখাত তাকে সুন্দর মধুর অদূরবর্তী।

কেন খোঁজো
কোথায় গিযে পৌছলো তোমার দান ?
তোমার রুটি ভাসিযে দাও জলে,—
কে খাবে—কে জানে ?

কী রঙ-বেরঙের জনতা !
আল্লাহ্‌র 'দস্তরখানে' বসে গেছে দোস্ত ও দুষমন।

আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বেশী ধন্যবাদ দেব কি জন্যে !
তিনি যে পৃথক করে' রেখেছেন দুঃখভোগ আর জ্ঞান ;
চিকিৎসক যা জানে রোগীও যদি তাই জান্‌তো
তবে নৈরাশ্যে অভিভূত হতো তার অন্তর !

কি নির্বুদ্ধিতা যে প্রত্যেক লোকে
আঁকড়ে ধরে থাকবে আপন আপন মত !
যদি ইসলামের অর্থ ঈশ্বরের আনুগত্য
তবে ইসলামে বাঁচবে ও মরবে সবাই ।

ভূমধ্যসাগরের তীরে
দাঁড়িয়েছে দীপ্ত প্রাচী ;
যে জানে ও ভালবাসে হাফিজকে
সে জানে কাল্ডেরনের গান ।

মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব স্পেনের ও ইয়োরোপের উপরে পড়েছিল সেই ইঙ্গিত এখানে রয়েছে ।

যদি মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়
যীশুর গাধাকে শিক্ষার জন্য,
তবে উন্নতি হবে না তার এক তিল,
রয়ে যাবে সে গাধাই ।

বৃথা গর্জন করে প্রবৃত্তির বন্যা
কঠিন অজিত উপকূলের সামনে,—
বেলাভূমে ছড়ায় তা কবিত্বের মুক্তা,—
লাভ হয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত ধন ।

কোনো বন্ধন কারো গর্বের বিষয় না হোক,
যদি সে-বন্ধন থেকে সে না পেয়ে থাকে মুক্তি ।
যে বিহার করে অযৌক্তিকতায়
অযৌক্তিকতা হবে তার সঙ্গে সুসঙ্গত ।

এটিও প্রচলিত জার্মান সংস্করণে নেই ।

কত দুঃখ পাই আমি
যখন দেখি অগণিত কবির ভিড় ।
কে তাড়ায় সংসার থেকে সব কবিত্ব ? *
আর কেউ নয়, কবিরাই ।

সপ্তম খণ্ডের নাম তৈমুর-নামা

এতে মাত্র দুটি কবিতা। প্রথম কবিতার নাম শীত ও তৈমুর। দ্বিতীয় কবিতার নাম জুলায়খার প্রতি।

প্রথম কবিতায় শীত অত্যাচারী তৈমুরকে ভৎর্সনা করছে, বলছে, তার অত্যাচারের অবসান হবে অচিরে মৃত্যুতুহিন স্পর্শে। টীকাকার বলছেন, নেপোলিয়নের রুষ-অভিযানের ইঙ্গিত রয়েছে এতে। মনে হয় কবি এতে বলতে চেয়েছেন, শক্তিলাভ কাম্য নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার প্রবণতা যদি হয় অহেতুক পরপীড়নের দিকে তবে তা' হয় অভিশপ্ত।

দ্বিতীয় কবিতা :—সুশোভন শক্তিমত্তা বা সুপরিণত ব্যক্তিত্বের প্রতি কবির স্তব :

আমোদিত করতে তোমায় সুরভি দিয়ে,
করতে তোমায় আরো খুশী,
এক হাজার গোলাপ-কলি
আগুনে হবে আহুতি।

তোমার আঙুলের ডগার মতো সরু
একটি শিশির জন্যে,
—অবিনশ্বর হবে তার গন্ধ—
প্রয়োজন বিরাট জগতের সহায়তার—

হাঁ, প্রয়োজন বিরাট জগতের প্রাণশক্তির,
সক্রিয় পূর্ণ বীর্য্যে,
তার সঙ্গে নিবেদিত হচ্ছে বুলবুলের প্রেম,
উঠছে তার প্রাণমাতানো গান।

বর্ধিত হয়েছে আমাদের আনন্দ সেই গানে,
পীড়িত হব কি তার নিনাদে ?
তৈমুরের শাসনে
বিনষ্ট হয় নি কি সংখ্যাহীন প্রাণী ?

অষ্টম খণ্ডের নাম জুলায়খা-নামা

এটি যেমন প্রসিদ্ধ তেমনি দীর্ঘ। এর সঙ্গে কবির যে জীবন-ইতিহাস সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন লুড ভিগ ও ব্রাণ্ডেস।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে গোটে হাফিজের কবিতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হন আমরা জানি। এটি হলো তাঁর জন্য এক নূতন কাব্য-জগতের আবিষ্কার। এই কালে তাঁর ক্রমপ্রকাশমান আত্মচরিত অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই সঙ্গে কতকটা মন্থর গতিতে চললো তাঁর নতুন'গজল' রচনা।

দীর্ঘকাল পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাইযে কবি ফ্রাঙ্কফোর্ট অঞ্চলে ভ্রমণে যান ও তাঁর পুরাতন বন্ধু ফ্রাঙ্কফোর্টের সম্ভ্রান্ত নাগরিক ভিলেমরের আগ্রহে তাঁর গৃহে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। সেখানে বাস করতেন রূপসী তরুণী মারিয়ানা। কবির নবরচিত গজল মাঝে মাঝে তিনি কবিকে গেযে শোনাতেন। মারিযানা কবিতারচনাযও অভ্যস্তা ছিলেন।

মারিয়ানা ছিলেন দরিদ্রের কন্যা। পনের ষোল বৎসর বযসে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টের রঙ্গালয়ে নাচতেন গাইতেন ও অভিনয় করতেন। কলারসিক বিপত্নীক ভিলেমর তাঁকে আপন গৃহে স্থান দেন ও তাঁর কন্যাদের সঙ্গে লালন করেন। কবির চলে যাবার কযেক দিন পরে ভিলেমর মারিয়ানাকে বিবাহ করেন। এসময়ে ভিলিমরের বযস পঞ্চাশ আর মারিয়ানার বয়স উনত্রিশ। কবি নাকি এ বিবাহ প্রশস্ত বিবেচনা করেছিলেন।

পর বৎসর আগষ্ট মাসে কবি পুনবায ভিলেমর-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবির ও মারিয়ানার মধ্যে পরিচয এবার আরো নিবিড় হয। কবি তাঁর অন্তরের নব অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন হন ও মারিযানাকে এড়িযে চলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টের এক হোটেলে বাস কালে মারিযানাকে লক্ষ্য করে এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন:

সুযোগ পেযে মানুষ হয চোর—কখ্‌খনো নয়।
আসল চোর সে,
আমার এই ব্যথাতুর অন্তরে প্রেমের যা ছিল অবশেষ,
চুরি করে নিয়েছে সে নিঃশেষে।

ইত্যাদি

এই কবিতা তিনি মারিযানাকে পাঠিযে দিলেন আর পরদিন মারিয়ানার কাছে থেকে পেলেন এই কবিতা:

তোমার প্রেমে পুলকিত আমি
কখ্‌খনো ধরবো না সুযোগের দোষ:
তোমার চোখে সেজেছি নির্লজ্জ চোর—
কিন্তু গর্ব আমার এমন চুরি!

ইত্যাদি

তাঁর আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। বুঝলেন তিনি প্রেমের প্রভাবে পত্ররচয়িত্রী মারিয়ানা রাতারাতি হযে উঠছেন সত্যকার কবি।

এরপর এই দুই প্রেমবদ্ধ কবি আরো কবিতা বিনিময় করলেন—পরে পরে সেসব আমরা দেখব। প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানের অনেক কবিতাই, বিশেষ করে প্রেমের কবিতা, মারিয়ানার স্মরণে রচিত। তবে একথাও ভুললে চলবে না যে অন্যান্য কবির প্রিয়ার মতো গ্যেটের প্রিয়াও মানসী বহুল পরিমাণে। কবি নিজে বলেছেন: লোকেরা প্রাযই ভাবতে পারে না যে সামান্য ঘটনা থেকে কবি চমৎকার কিছু গড়ে তুলতে পারেন।

কবির গজল মারিয়ানা অপরাহ্লের উদ্যান-সম্মেলনে গাইতেন। কবি কখনো কখনো মারিয়ানার মাথায় বেঁধে দিতেন শাদা মসলিনের পাগড়ি। এমন ভাবাবেগে কয়েক সপ্তাহ কবির কাটলো। শেষে তিনি বুঝলেন আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়; অগ্রসর হলে ভিলেমরের গৃহে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে, তাঁর নিজের জীবনে ভের্টরের পুনরাভিনয় ঘটতে পারে। ভিলেমরের গৃহ তিনি চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এলেন সেপ্টেম্বরের শেষে।

এমন আত্মজয়ের মূল্য অবশ্য কবিকে দিতে হলো—তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর আশঙ্কা হলো হয়ত তাঁর জীবনাবসানের আর দেরী নেই।

মারিয়ানার সঙ্গে কবির পত্র-বিনিময়ে চলেছিল আমৃত্যু। কিন্তু তাঁদের আর কখনো দেখা হয় নি। কবির নির্দেশে এই সব পত্র তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

মারিয়ানার কবিতাগুলো প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানে স্থান পেয়েছিল কবির স্বরচিত কবিতা হিসাবে। কবির মৃত্যুর পরে জানতে পারা যায় কোন্‌গুলো মরিয়ানার কবিতা। ব্রাণ্ডেস বলেছেন, মারিয়ানার কবিতাকে নিজের কবিতা বলে' পরিচিত করিয়ে গ্যেটে মারিয়ানার কবি-প্রতিভার প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মতে মারিয়ানার কবিতার মতো উৎকৃষ্ট কবিতা আর কোনো নারী জার্মান-কবি লিখতে পারেন নি।

জুলায়খা নামা-য় আগাগোড়া বাণী-বিনিময় চলেছে হাতেম আর জুলায়খার মধ্যে,—হাতেম কবি নিজে আর জুলায়খা মারিয়ানা। অবশ্য জুলায়খার সব উক্তি মারিয়ানার কবিতা নয় আর হাতেমও যে গ্যেটের প্রাচ্য কবিরূপ—তার সব উক্তি বাস্তব ঘটনার বিবৃতি নয়—সে কথা ভুললে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। সূচনায় কবি তাঁর প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন তাঁর সঙ্গে বর্তমান মুহূর্ত আনন্দে যাপন করতে:

পালিও না আজকার দিন থেকে :
সামনের যে দিন,
আজকার দিনের চাইতে নয় তা ভাল ;
ইচ্ছা করে যদি থাক
আমার পাশে, জগৎ বিসর্জন দিয়ে যেখানে আছি আমি,
নূতন করে গড়ে তোলো জগৎ,
তাহলে আমার সঙ্গে থাকবে তুমি নিরাপদে ;
কাল কাল, আজ আজ,
যা আসবে আর যা গত হয়ে গেছে—
আনন্দ নেই তাতে, নেই তার স্থায়িত্ব ;
প্রেয়সী, আছ কি তুমি ;
একই সঙ্গে এনেছ তুমি সম্পদ আর করছ বিতরণ। *

* তুলনীয় : কালিদাস ত নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।—ক্ষণিকা।

নিজেদের তিনি তুলনা করেছেন ইহুদি-পুরাণের যুসুফ ও জুলায়খার সঙ্গে। পারস্য সাহিত্যের যুসুফ ও জুলায়খা বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণ ও রাধার তুল্যমূল্য :

যুসুফকে দেখে জুলায়খা হয়েছিল পাগল,
বোঝা যায় সে কথা সহজে,—
যুসুফ ছিল তরুণ, বহু আকর্ষণ তারুণ্যের।
আর বলে সবাই যুসুফের ছিল অতুল রূপ,
আর জুলায়খাও ছিল রূপসী, যোগ্য যুগল বটে।
প্রেয়সী, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি আমি কতকাল!
হানছ আমার পরে তোমার নবীন আঁখির দহন-ভরা কটাক্ষ,
ভালবেসে ধন্য করবে আমার প্রতীক্ষা
এই হবে আমার আনন্দিত গানের বাণী,
চিরদিন স্মরণ করবো তোমাকে আমার জুলায়খা বলে'।

হাতেম

সুযোগ পেয়ে মানুষ হয় চোর—কখ্খনো নয়,
আসল চোর সে :
আমার এই ব্যথাতুর অন্তরে প্রেমের যা ছিল অবশেষ,
চুরি করে নিয়েছে সে নিঃশেষে।

সব তোমাতে হয়েছে সমর্পণ,
জীবনের যা কিছু সম্পদ,
সেই দারিদ্র্যে
যাচি তোমার কাছে জীবন।

অনুভব করছি এখন করুণা
তোমার স্ফুরিত আঁখি-তারায়,
আনন্দে তোমার বাহুবন্ধনে
অনুভব করি ভাগ্যের নব দান।

জুলায়খা

তোমার প্রেমে পুলকিত আমি
কখ্খনো ধরবো না সুযোগের দোষ ;
তোমার চোখে সেজেছি নির্লজ্জ চোর
কিন্তু গর্ব আমার এমন চুরি।

কেনই বা হতে হবে আমাকে চোর,
স্বেচ্ছায় ধরা দাও আমার কাছে,
খুশী হয়ে চিরদিন করবো স্মরণ
চুরি করেছ যে তোমাকে সে আমি।

এমন সুলভ দানের জন্যে
পাচ্ছ যা তা দুর্লভ :
লুটে নাও সব আনন্দ ভরে
দিচ্ছি জীবনের সব সম্পদ।

দারিদ্র! রাখো তামাসা।
প্রেম নয় কি মহা সম্পদ?
ধারণ করি তোমায় যখন বাহুবন্ধনে,
অতুলন আমার সৌভাগ্য।

ভালবাসে যে সে কখনো করে না ভুল,
ভাগ্য তার হোক যত বিরূপ।
মজনু ও লায়লা আবার যদি জাগে
প্রেমের রীতি শিখতে পারবে আমার কাছে।

শুনছি কি তোমার দেবোপম কণ্ঠ?
সম্ভব হয়েছে কি তোমাকে ভালবাসা আদর করা?
ধারণার অতীত আমার কাছে গোলাপ,
বুলবুলও তেম্‌নি বটে।

এটি মারিয়ানার স্বরচিত সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

জুলায়খা

লেখ নি কি তুমি কবিতা
পরিপাটি ছাঁদে
বিন্দুর দিকে পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে,
সোনালি-হাশিযা-দেওয়া বাঁধা খাতায়?*

* দামী খাতায় খুব যত্ন করে কবি তাঁর এই সব কবিতা লিখেছিলেন—বোধ হয় প্রাচ্য লিপিকরদের ভঙ্গিতে।

বহু খণ্ডে মন-ভুলানো বই ?
দিয়েছ যাদের,
সব কি প্রেমের উপহার রূপে ?

হাতেম

নিশ্চয়—মোহন দুর্বার চাহনি,
ভুবনভুলানো হাসি—
মুক্তার মতো দাঁত,
পক্ষ্ম-তীর, কুঞ্চিত কেশ
ফণিনীর মতো বেষ্টন করে'
কাঁধ ও বুক—
ভয় বাসি তাদের কথা স্মরণ করে'।
দেখ ভেবে, কবে থেকে
বাজছে অন্তরে জুলায়খার আগমনী।

হাতেম

…এসো প্রিয়ে, বাঁধো পাগড়ি,
সুন্দর হয় যা তোমারই হাতে!
ইরাণের মসনদে শাহ্ আব্বাস
ধারণ করেন নি সুন্দরতর তাজ।

এমন শাদা রূপালি জরির মসলিম,
প্রিয়ে, বেঁধে দাও তোমার হাতে আমার মাথায়,
কি মূল্য দুনিয়ার পদগৌরবের ? জানি তা ভাল!
তোমার আঁখির সামনে মহীয়ান আমি সম্রাটের মতো।

প্রয়োজন আমার যৎসামান্য,
খুশী আমি সব তাতে
সেই যৎসামান্য বহু পূর্বে
দিয়েছ আমাকে সদয় সংসার।

খুশী মনে যাপন করি সরাইখানায়
অপ্রসর কক্ষেও খুশী আমি,
শুধু যখন ভাবি তোমার কথা
ভরে আমার মন বিজয়-স্বপ্নে।

তোমার পরিচর্যা করবে তৈমুরের বিস্তীর্ণ রাজ্য,
তার বীর সৈন্যদল হবে তোমার আজ্ঞাধীন,
বাদাক্শান থেকে আসবে লাল চুণি,
কাস্পীয়ান সাগর যোগাবে নীল মণি।

মধুর মতো শুকনো ফল আসবে
আলোকের দেশ বোখারা থেকে;
নিপুণ হাতের লেখা হাজার কবিতা
আসবে রেশমী পাতে সমরখন্দ থেকে।

...জিজ্ঞাসা করছ সম্রাটকে,
দেবেন তিনি বালক বোখারা সমরখন্দ তোমার জন্যে ?
তিনি রাজাধিরাজ, মহা বিজ্ঞ,
কিন্তু জানেন না ত প্রেমের রীতি।

ওগো মহারাজ, দিতে এমন দান
রাজি হবে না তুমি কোনো দিন।
যে জন পাবে এহেন কুমারী
হতে পারবে সে আমার মতো নিঃস্ব।

জুলায়খার প্রতি

...পরিপাটি আখর,
সোনার জল ঢালা,
এই জাঁকালো পুঁথির পাতা দেখে
হাস তুমি আপন মনে;
ক্ষমা কর আমার অহঙ্কার
তোমার প্রেমে তোমারই জন্যে
এই অভাবিত সাফল্য আমার—
ক্ষমা কর আমার আনন্দিত আত্মশ্লাঘা।

আত্মশ্লাঘা! ঈর্ষাকে দেয় আঘাত,
কিন্তু বন্ধুর জন্য মধুর সুরভি,
আর খুশী রাখে নিজেকে।

জীবন-ধারণের আনন্দ সুমহৎ,
মহত্তর জীবন-বোধের আনন্দ,
ওগো জুলায়খা
দান কর তুমি আমাকে অফুরন্ত আনন্দ
যখন নিক্ষেপ কর আমার পরে তোমার প্রেমাবেগ,
'বলে'র মতো ধরি তা দুই হাতে,
পুনরায় ছুঁড়ে দিই তোমার পানে,
চির-অনুগত এ জন—
অপূর্ব সে মুহূর্ত !

...তোমার ব্যথিত প্রেমাবেগের
উদ্দাম তরঙ্গ
ছড়ায় কবিত্ব-মুক্তা
আমার জীবনের
নিঃসঙ্গ বেলাভূমে।
তাম্র আঙুলে
যত্নে কুড়ানো,
গাথা স্বর্ণসূত্রে
স্বর্ণ-কারু-মণ্ডিত,
পর এ হার কণ্ঠে
পর বক্ষে—
স্বর্গ থেকে ক্ষরিত আল্লাহ্‌র বৃষ্টিবিন্দু
পরিপক হয়েছে বিশিষ্ট শুক্তিতে।

(বিনিময় চলেছে) মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্তের, প্রেমাবেগের সঙ্গে প্রেমাবেগের,
সত্যাশ্রয়ী ওষ্ঠাধরের চুম্বনের সঙ্গে চুম্বনের,
বাণীর সঙ্গে বাণীর, চাহনির সঙ্গে চাহনির ;
নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাসের, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের—

এমনি চলেছে আজ, এমনি চলবে কাল !
তবু অনুভব করছ তুমি আমার গানে
এক লুকানো দুঃখ :
কামনা করি আমি য়ুসুফের রূপ
তোমার রূপের সম্মান রক্ষায়।

তায় অক্ষম আমি সে প্রতিযোগিতায়
অশেষ কামনা আমার যদিও তার জন্তে ;
খুশী হও তুমি আমার গান নিয়ে ঃ
আমার হৃদয়, আমার সত্য খুশী করুক তোমাকে।

(মারিয়ানার বিচ্ছেদকালে কবির উক্তি)

তুমি কস্তুরির মতো সুরভি,
কোথায় হয়েছিল তোমার অধিষ্ঠান স্মরণ করে তা আজো সবাই।

হাতেম

বল আকাশে কোন্ প্রহরের চিহ্ন
দিয়েছে দেখা,
কখন এই মন, যা এখনো আছে আমার,
আর হবে না বিবাগী ?
আর যদি হয় বিবাগী, তবু আমার জন্তে
থাকবে নাগালের মধ্যে ?
—যখন কোমল শয্যায় মোহন মন্দিরে
স্থান লাভ করবে সে প্রিয়ার পার্শ্বে !

হাতেম

রঙ-বেরঙের ঝকমকে প্রদীপ
শোভা বাড়ায় সোনারের দোকানের,
পককেশ কবির চারদিকে তেম্নি
ভিড় জমেছে বহু তরুণীর।

হাতেম

ঐ মুখ বেষ্টন করে আছ যত অলকদাম,
বন্দী কর আমাকে তোমাদের জালে !
ওগো কালো পোষা ফণিনীর দল,
কি দিয়ে শুধবো আমি তোমাদের ঋণ !

আছে শুধু আমার প্রেমময় হৃদয়,
যৌবন যাতে অনির্বাণ ;
তুষার ও কুয়াসার আবরণ দিয়ে
ঢাকা পড়ে আছে আগ্নেয় এট্না।

রাঙিয়েছ আমাকে লজ্জায়, যেমন রক্তিম প্রভাত
রাঙিছে ঐ গম্ভীর পর্বত-শৃঙ্গ।
আর বার হাতেম অনুভব করছে
বসন্তের মধু-শ্বাস গ্রীষ্মের দাহ।

ঢালো শরাব। আনো আর এক বোতল।
এই শেষ পেয়ালা ভরেছি তার স্মরণে;
যায় যদি সে আমার ভস্মস্তূপের পাশ দিয়ে
বলবে সে, 'মরেছে জ্বলে আমারই জন্যে।'

জুলায়খা

ছাড়তে পারবো না তোমায় কখনো।
প্রেম যোগাবে প্রেমের শক্তি!
আমার যৌবনের সৌন্দর্য
মণ্ডিত করুক তোমার প্রেমকে দীপ্তিরূপে।

কত সুখী হই মনে
গায় যখন লোকে আমার কবির গুণগান!
প্রতিভা জীবনের সার
কিন্তু আসল জীবন ভালবাসা।

...বড় বেশী ইন্দ্রিয় রয়েছে আমাদের।
তাতে আনন্দে ঘটে গণ্ডগোল।
যখন দেখি তোমায় তখন চাই আমার কান দুটি হোক বন্ধ,
আর যখন শুনি তোমার বাণী তখন চাই আমার চোখ
দুটি হোক অন্ধ।

'জুলায়খা-নামা'র শেষের কতকগুলো কবিতায় নাম দেওয়া হয়েছে 'জুলায়খার পুঁথি'। এই কবিতাগুলো কাব্যরসিকদের বিশেষ প্রিয়। মূলে এর পদলালিত্য নাকি অপূর্ব।

গাছে 'চেস্‌টনাট' ফল ঝুলতে দেখে কবি এই কবিতা লেখেন:

পাতাভরা ঐ সব সুন্দর শাখা
প্রিয়ে, দেখ তাকিয়ে।
দেখ ওদের ফল,
সবুজ, কাঁটায় ভরা।

ঝুলছে সব গোল ফল নীরবে,
আপনভোলা ওরা
সঞ্চালিত শাখা
দোলায় ওদের যেমন খুশী।

পাকে ওরা ভিতর থেকে
শাঁস ওঠে পুরে :
চায় ওরা বাতাস,
চায় ওরা আলো।

অবশেষে আনন্দে ছিঁড়বে ওরা বাঁধনডো
খোসা যাবে টুটে ;
আমার কবিতা তেমনি প্রতিদিন
জমছে তোমার কোলে।

জুলায়খা

কি অর্থ এই স্পন্দনের ?
পূব হাওয়া কি আনবে সুসংবাদ ?
আমার হৃদয়ের গভীর ক্ষত
স্নিগ্ধ হয় তার পক্ষসঞ্চালনে।

ধূলির সঙ্গে করে সে খেলা,
ছোটে তার পিছে মেঘের দেশে ;
দ্রাক্ষালতার কুঞ্জবনে
নিয়ে যায় সুখী কীটের দলে।

স্নিগ্ধ করে রবির প্রখর দাহ
স্নিগ্ধ করে আমায় উষ্ণ গণ্ড ;
উড়ে উড়ে দিয়ে যায় চুমো
প্রান্তর ও শিখরের রঙ্গিণী দ্রাক্ষায়।

তার মৃদু কণ্ঠে শুনি আমি
বঁধুর মধুর সম্ভাষণ।
উপহার পাই অজস্র চুম্বন
তারপর গিয়ে ঢাকে অন্ধকারে !

হও তুমি হও আরো অগ্রসর!
খুশী কর বন্ধুজনে আর যত ব্যথিতে;
ঐ দূরে উঠেছে যেখানে উচ্চশির সৌধ
অচিরে মিলব সেখানে বন্ধুর সঙ্গে।

আঃ! হৃদয়ের জন্য এ কি আনন্দ-সংবাদ!
প্রেমের সুরভিশ্বাস সূচিত করে নবজীবন;
আসুক সেই শ্বাস তার মুখ থেকে
তার প্রশ্বাসই দান করবে আমাকে সেই জীবন।

এটি মারিয়ানার রচনা। 'বন্ধুজন' কথাটি গ্যেটে বসিয়েছিলেন, মারিয়ানার মূল রচনায় ছিল 'সুখীজন'। সমালোচকরা বলেছেন, গ্যেটের সংশোধন ভালো হয় নি। এর আরো তিন জায়গায় কবি সংশোধন করেছিলেন কিন্তু মাত্র এক জায়গায় সার্থক ভাবে।

মহান প্রীতক

সূর্যকে গ্রীকরা বলেন দেবতা,
আকাশ-পথে বিচরণ করেন তিনি গৌরবে,
বিশ্বজগৎকে প্রভাবিত করবার জন্তে
দৃষ্টি সঞ্চালিত করেন তিনি উর্ধ্বে অধে ডাইনে বাঁয়ে।

প্রত্যক্ষ করেন তিনি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দেবীর রোদন
স্বর্গের সন্তান মেঘের সন্তান সেই দেবী,
সেই দেবীর জন্যই যেন সূর্যদেব হয়েছেন প্রভাময়—
বিষাদে আবৃত করেন তিনি বদন।

বিচিত্র সুখকথা দেবী হন বিস্মৃত,
অঝোরে ঝরে তাঁরে অশ্রু;
প্রতি অশ্রু-মুক্তার উপরে সূর্যদেব মুদ্রিত করেন চুম্বন,—
দেবীর ব্যথা রূপান্তরিত হয় আনন্দে।

চান দেবী উর্ধ্বপানে
অনুভব করেন সূর্যদেবের প্রভাবময় আঁখি-পাত;
রবির প্রতিবিম্ব ধারণ করে'
প্রতি মুক্তাবিন্দু হয় পূর্ণাঙ্গ।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয় দেবীর আনন,
পরেন কণ্ঠে তিনি বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু,
রবিদেব অগ্রসর হন তাঁকে লাভ করতে,
কিন্তু হায়, ভাগ্যে নেই তাঁর সেই মিলন।

তেমনি ভাগ্যের কঠোর বিধানে,
প্রিয়তমে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছ তুমি আমা থেকে ;
হতাম যদি আমি সূর্যদেবও
কি প্রয়োজন সাধন করতো সৌর রথ ?

উপমাটি অপূর্ব। ভাগ্যের অমোঘ নির্দেশের সামনে কবি যে পরমদুঃখিতচিত্তে নতশির হয়েছেন সেই চিত্রটিও অপূর্ব। তাঁর দুঃখের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে পরের 'প্রতিধ্বনি' কবিতায়।

প্রতিধ্বনি

শোনায় ভাল কবি যখন
নিজের উপমা খোঁজেন সূর্যে ও সম্রাটে,
কিন্তু আসে তার জন্য কালো রাত্রি,
লুকায় তখন সে তার ব্যথাবিকৃত মুখ।
বহু-স্তর মেঘের আবরণে,
রাত্রির আঁধার নামে দিনের নীল উজ্জলতায় ;
আমার শীর্ণ গণ্ড হয়েছে কত পাণ্ডুর,
আমার হৃদয়ের স্তুপীকৃত অশ্রু হারিয়েছে সব দীপ্তি।

পরমপ্রিয়ে, চন্দ্রবদনী,
ফেলে যেয়ো না আমাকে ব্যথায় ও আঁধারে,
আমার প্রদীপ, আমার আঁধারে আলেযা তুমি,
আমার সূর্য তুমি, আমার জ্যোতিও তুমি !

জুলায়খা

কত ঈর্ষা করি তোমাকে পশ্চিম-বায়ু
তোমার বারি-সিঞ্চনী পাখার জন্যে।
জানাতে পার তুমি তাকে
তার বিচ্ছেদে কত কাতর আমি।

তোমার স্নিগ্ধ পাখা দান করে কথঞ্চিৎ উপশম
স্নিগ্ধ করে আমার ক্লিষ্ট আঁখি ;
নইলে জীবন আমার নিঃশেষিত হতো হুতাশে,
আর রইত না তার দর্শনের আশা।
তবে যাও বন্ধুর কাছে ত্বরিতে,
বলো আমার কথা তার অন্তরে মৃদু ভাষে ;
সাবধান, দিয়ো না তাকে ব্যথা,
আমার বুকভরা দুঃখের কথা বলো না তাকে।
বলো তাকে বলো তাকে ধীরে,
বেঁচে আছি শুধু তার প্রেমে :
পুলক-শিহরণ জাগবে দোঁহার চিত্তে
পাই যদি তাকে নিকটে।

এটি মারিয়ানার রচনা। এরও কোনো কোনো জায়গায় কবি কিছু মাজাঘষা করেন। ব্রাণ্ডেস বলেছেন: সে-মাজাঘষা ভাল হয়েছে। জার্মান ভাষায় এটি নাকি এক অতি উৎকৃষ্ট গান।

প্রতিচ্ছবি

কবিতা আমার আরশি,
দেখি তাতে আনন্দে
যেন বাদশার খেলাতে
ঝলমল আমার অঙ্গ।
নয়ত নিজের খুশীর জন্যে
আমার এই আত্মরূপায়ণ ;
আমি চাই সঙ্গের সাথী,
সেই প্রয়াস এই কবিতায়।
আমার ঘরের আয়নার সামনে
দাঁড়াই আমি, সঙ্গিনীহীন,
প্রিয়া আমার সহসা,
উঁকি দেয় ঘাড়ের পাশে,
ফেরাই মুখ, চকিতে মিলায়
ফুটেছিল সে সুন্দর মূর্তি ;
কিন্তু যখন খুলি গানের পুঁথি—
দেখি প্রিয়া বর্তমান।

লিখি গান পরিপাটি করে',
প্রিয়তর হয় পদাবলী,
প্রতিদিনই হই লাভবান
সমালোচক মশাই যাই বলুন।

মোহন পরিবেশে প্রিয়ার রূপ
নতুন করে' ফোটে প্রতিদিন,
দেখি তাকে গোলাপের মালায়,
দেখি তাকে গগনের নীলে।

বিচিত্রা

বিস্মিত করতে চাও আমাকে অযুত রূপে,
পরমপ্রিয়া, চিনি তোমার নিমেষে,
পরতে পার তুমি মায়ার সহস্র গুণ্ঠন,
অপচলা, বুঝি তোমায় পলকে।

চারু লতিকার তরুণ কলিকায়
সুবর্ণা, চিনি তোমায় অক্লেশে,
নির্ম্মল নহরের প্রাণিত ধারায়
মনোহরা, চিনি তোমায় আনন্দে।

ফেনিল-জলোচ্ছ্বাস-রঙ্গে,
রঙ্গিণী, চিনি তোমায় চিনি,
বর্ধমান জলদের অযুত ভঙ্গে,
বিচিত্রা, চিনি তোমায় চিনি।

প্রান্তর-আস্তরণে পুষ্পিত-উত্তরীয়ে,
তারকামণ্ডনা, চিনি তোমায় চিনি ;
উদ্দাম লতিকার বাহু বিস্তারে,
আশ্লেষরসিকা, চিনি তোমায় চিনি।

পর্বতশিখরে অরুণ-আভাসে,
নন্দিনী, গেয়ে উঠি তোমার জয়গান,
আকাশ-অঙ্গনে আলোক প্রসারে,
হৃদয়-বিকাশিকা, করি তোমায় আত্মাণ।

অন্তর ও বাহিরের সমস্ত তত্ত্ব,
লাভ করি তোমার প্রসাদে মহা-আচার্য ;
আল্লাহ্‌র শত নাম নিই যখন এ মুখে
প্রত্যেক নামে নিই তোমারও একটি নাম।

ভক্ত মুসলমান আল্লাহ্‌কে শত নামে ডাকেন, অর্থাৎ তাঁর বিচিত্র গুণ স্মরণ করেন।

এই কবিতাটির 'বিচিত্রা' নাম আমরা দিয়েছি, মূলে কোনো নাম দেওয়া হয় নি।

ব্রাণ্ডেস জুলায়খা নামা-র কোনো কোনো কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, এমন প্রেমের কবিতা গ্যেটে যৌবনেও রচনা করতে পারেন নি। এই সব কবিতা যে বিশেষ ভাবে ইয়োরোপীয় সে কথাও তিনি বলেছেন কেননা এসবে 'বিশেষে'র রূপায়ণ ঘটেছে মুখত। এই সম্পর্কে গ্যেটের এই কাব্যসূত্রটিও স্মরণীয়: সাময়িক কবিতাই আদি ও অকৃত্রিমতম কবিতা।—বলাবাহুল্য এই 'বিশেষে'র বুকে নির্বিশেষ বা বিশ্ব যখন প্রতিফলিত হয় তখনই জন্ম হতে পারে উৎকৃষ্ট কবিতার ; নইলে, শুধু বিশেষের বর্ণনা সংবাদ দান মাত্র, আর শুধু নির্বিশেষের বর্ণনা রূপক মাত্র। প্রাচ্যের কবিতা অনেক ক্ষেত্রে এমন রূপক-লক্ষণাক্রান্ত এবং সেজন্য দুর্বল তা মিথ্যা নয়। অবশ্য প্রতীচ্যের অনেক কবিতায়ও দুর্বলতা কম নেই।

নবম খণ্ডের নাম সাকী-নামা।

এটি মোটের উপর সুরা-প্রশস্তি। এতে বাণী-বিনিময় চলেছে প্রধানত কবি ও সাকীর মধ্যে।

যে ক'টি কবিতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তার নামকরণ আমরা করেছি—সুবিধার জন্য।

অনাদি

কোরান অনাদি কি না
সে প্রশ্ন নয় আমার।
কোরান সৃষ্ট কি না
জানি না সে তত্ত্ব।
এ যে মহাগ্রন্থ
মানি সে কথা মুসলমান হিসাবে।
কিন্তু শরাব যে অনাদি
তাতে নেই আমার সন্দেহ।
ফেরেশ্‌তা (দেবদূত)
সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল শরাব-এ হয়ত নয় কবির রচনা :

সত্য যাহাই হোক আল্লাহ্‌র মুখের পানে
তাকাতে বেশী সক্ষম শরাবী।

যথার্থতঃ মাতাল হতে হবে সবাইকে।
বিনা মদে মত্ততার নাম যৌবন।
মদ খেয়ে বুড়া হয় জোয়ান,
নিঃসন্দেহে এ মহাগুণ।
প্রিয় জীবন হবে দুঃখহীন,
দ্রাক্ষা তাড়াবে দুর্ভাবনা।

মত্ততা

সচরাচর মত্ততার ফলে
ঘুম ভাঙে বেলা হলে,
কিন্তু বহু সময়ে আমার মত্ততা
হাঁকিয়ে দিয়েছে আমার রাত্রি।
চিরদিন প্রেমের মত্ততা
করে আমায় নিষ্ঠুর ভাবে জ্বালাতন;
হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়ায় আমার মনকে
দিন থেকে রাত্রিতে রাত্রি থেকে দিনে।
গানের মত্ততায় ভরে যার বুক
কোনো পান্‌সে মত্ততা
ঘেঁষবে না তার পাশে।
গানের মত্ততা, প্রেমেব মত্ততা, আর শরাবের মত্ততা,
কিবা দিনে কিবা রাত্রে—
এই দেবশোভন মত্ততার
হয়েছি আমি শিকার।

সাকীর নিবেদন

লোকে বলে তোমায় বড় কবি,
গাও যখন দশের মেলে:
তান ধরো যখন শুনি আনন্দে,
শুনি তখনো যখন নীরব তুমি।

কিন্তু ভালোবাসি তোমায আরো বেশী
যখন ভাবি তোমার চুমার কথা ,
কথা চলে যায ত্রস্ত পদে,
কিন্তু চুমা রয়ে যায অন্তরে ।

মিলের অবশ্য আছে অর্থ,
বেশী ভাল ভাব সে কথা সত্য :
তান ধোরো কবি দশের মেলে,
কিন্তু নীরব থেকো যখন মদ আনে সাকী ।

দশম খণ্ডের নাম মৎহাল-নামা অর্থাৎ রূপক-খণ্ড

অল্প কয়েকটি কবিতা আছে এতে। একটি কবিতা উদ্ধৃত হচ্ছে ।

অলৌকিকতায বিশ্বাস

ভেঙেছিলাম এক সুন্দর শুক্তি,
তাতে দুঃখে ভরেছিল আমার বুক :
আমার অপটুতায ও ব্যস্ততায
দিয়েছিলাম গভীর ধিক্কার ।
ভাঙাচোরা সব টুকরো দেখে
কেঁদেছিলাম অঝোরে, করেছিলাম শপথ ।
আল্লার দয়া হলো আমার 'পরে,
হলো সেই শুক্তি আগে যেমন ছিল তেম্‌নি ।

টীকাকার বলেছেন এখানে অলৌকিকতায স্থূল বিশ্বাসের প্রতি কবির কটাক্ষ রয়েছে ।

একাদশ খণ্ডের নাম পার্সী-নামা

এটিও ক্ষুদ্রকলেবর। একজন বর্ষীয়ান অগ্নি উপাসক পার্সী এখানে বক্তা -শুভবুদ্ধি, অতন্দ্রিত কর্মচেষ্টা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। এটি প্রধানতঃ কতকগুলি চতুষ্পদীর সমষ্টি। কয়েকটি উদ্ধৃত হচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর পূর্ণাঙ্গ মানবিকতা এ দুয়ে কবির গভীর আনন্দ রূপলাভ করেছে এতে :

সাধন কর প্রতিদিনের গুরু কর্তব্য—
প্রয়োজন নেই আর কোনো প্রত্যাদেশের ।
নবজাত শিশু যখন নাড়তে পারে হাত,
পলকে ফেরে তা সূর্যের পানে ।
—সূর্যস্নান করাও দেহ ও আত্মাকে,
প্রতিদিন তবে অনুভব করবে প্রভাতের আশীর্বাদ ।

জীবিতদের কাছে সমর্পণ কর মৃতদের,
মৃতজীব আপনি ঢাকা পড়ে ধূলা মাটিতে ,
বোঝো একথা, সজাগ থেকো পূর্ণ ভাবে
যেন গোর দেওয়া হয় যা কিছু আবর্জনা সব।
নির্মল মনে কাজ করো মাঠে
পড়ুক তোমার উদ্যমের পরে সূর্যালোকে ;
রোপণ কর গাছ সার বেঁধে,
বাড়ে ভালো যা সুবিন্যস্ত।
নহরের জল সম্বন্ধে হয়ো সাবধান,
নির্মল রাখো তা' বাধা না পাক তার স্রোত।
পাহাড় থেকে বেরিয়েছে অমল জিন্দারুদ *
অমল থাকুক তা সর্বত্র।

কবি ইকবাল তাঁর কাব্যে জিন্দারুদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেখানে জিন্দারুদ হয়েছে আদর্শবাদের প্রতীক ; গ্যেটের জিন্দারুদ কিন্তু প্রকৃতিপন্থার প্রতীক।

দ্বাদশ খণ্ডের নাম খুল্‌দ্‌-নামা অর্থাৎ স্বর্গ-খণ্ড

মুসলমানী স্বর্গে—বেহেশ্‌তে—পুণ্যাত্মারা, ধর্মযোদ্ধারা, হুরী (আরবী শব্দ হুর) লাভ করবেন, সেই হুরীরা হয়েছে এখানে কবির প্রধান বর্ণনার বিষয়। সূচনায় কবি বলেছেন :

ভক্ত মুসলমান বেহেশ্‌তের কথা বলে
যেন সে নিজে সব সময়ে বসতি করে সেখানে :
কোরানের প্রতিশ্রুতিতে তার একান্ত বিশ্বাস,
এই হচ্ছে ভিত্তি তার শিক্ষার।

কিন্তু সম্মানিত পয়গম্বর নিজে—এই গ্রন্থের রচয়িতা—
উপর থেকে বুঝতে পারেন আমাদের প্রয়োজন,
বোঝেন তিনি তাঁর বজ্রগম্ভীর ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও
সন্দেহ কেমন করে' তিক্ততা আনে ধর্মবিশ্বাসে।
তাই শাশ্বত ধাম থেকে পাঠিয়ে দেন তিনি
যৌবনের মূর্তি—আমাদের সবাইকে নবযুবক করার জন্যে।
দুলে দুলে ভেসে আসে সেই মূর্তি,
হয় আমার কণ্ঠলগ্না—।—

* জিন্দারুদ—জাগ্রত প্রবাহ। একটি ছোট নদীর নাম, ইস্পাহানের অনতিদূরে তার উৎপত্তি।

বুকে, হৃদয়ে, স্থান দিই আমি
সেই স্বর্গীয় সামগ্রী, আর কল্পনার প্রয়োজন নেই আমার,
আর নেই আমার মনে বেহেশ্ত সম্বন্ধে সন্দেহ,
পরম নির্ভরতায় চুম্বন করি তাকে।

আর একটি কবিতা উদ্ধৃত হচ্ছে, নাম বেহেশ্তে প্রবেশ; এতে হুরী ও কবির মধ্যে বাণী-বিনিময় চলেছে।

বেহেশ্তে প্রবেশ

হুরী

আজ দাঁড়িয়েছি আমি পাহারা দিতে
বেহেশ্তের দ্বারের বাইরে;
কর্তব্য কি আমার জানি না ভাল,
তোমার বেশ কিন্তু সন্দেহজনক।

অন্যান্য ভক্ত মুসলমানের সঙ্গে
পুরো মিল আছে কি তোমার?
করেছ কি জেহাদ, করেছ কি ধর্মকর্ম,
বেহেশ্তে স্থান লাভের জন্য?
ঐ বীরদের তুমি কি একজন?
দেখাও জেহাদে পাওয়া ক্ষতচিহ্ন
যাতে প্রমাণ রয়েছে তোমার মর্যাদার,
তাহলে ছেড়ে দেব আমি পথ।

কবি

প্রয়োজন নেই এখন চুলচেরা বিচারের।
দাও আমায় পথ,
সব সময়েই চলেছি আমি মানুষের মতো,
তাই সত্যই করেছি আমি জেহাদ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার;
খুঁজে দেখো আমার বুক।
দেখ কত পেয়েছি ঈর্ষার আঘাত,
কত পেয়েছি প্রেমের আনন্দিত আঘাত।

কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকের মতো হয়েছে আমার ব্যবহার :
যেন আমার প্রেমের অনুবর্তী হয়ে
অস্থিরমতি পৃথিবীও
হতে পারে সদয় ও প্রেমময়।

সাধনা করেছি আমি শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে,
যেন অনুরাগের শিখায় আমার নাম
লেখা হয় সুন্দরতম হৃদয়ে ;
অবশেষে লাভ করেছি এই সৌভাগ্য।

আমাকে পথ দিয়ে অনুগ্রহ করবে না তুমি হীনকে।
দাও আমাকে তোমার হাত, যেন আমি
তোমার কোমল অঙ্গুলিগুলিতে
প্রতিদিন গণনা করতে পারি অনন্ত কাল।

প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউযানের স্বর্গবর্ণনার সঙ্গে ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের স্বর্গবর্ণনা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউযানে কবি স্বর্গ বলতে বুঝেছেন আনন্দতন্ময়তা আর ফাউস্ট-এ বুঝেছেন অন্তহীন আত্মিক অগ্রগতি। হুরীকে এক জায়গায় বলছেন :

—তোমাতে পাচ্ছি নিতুই-নব অন্তহীন আনন্দ,
প্রথম-মিলন-রাত্রির অমল চুম্বন !
প্রতি মুহূর্তে উদ্বেলিত হচ্ছে আমার সত্তা,
কি প্রযোজন কালের পরিমাণ গণনায় ?

পারস্য-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা বুঝবেন সেই সাহিত্যের রূপ ও রস উভয়ের সঙ্গে কত অন্তরঙ্গ পরিচয় গ্যেটে তাঁর এই প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানে দিয়েছেন।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান কবি হাইনে প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউযানের সৌন্দর্য-কল্পনার ও পদ-লালিত্যের অশেষ প্রশংসা করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত মন্তব্যের শেষ অংশ এই :

এই ফুলের তোড়ায় এই কথা বলা হয়েছে যে প্রতীচ্য তার ক্ষীণ তুষার-শীতল আধ্যাত্মিকতায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান প্রাচ্যের বুকে সে খুঁজছে জীবনের উত্তাপ।

এই উক্তি ঈষৎ সত্যভ্রষ্ট, কেননা যে আধ্যাত্মিকতায় গ্যেটের আনন্দ তা প্রাচীন গ্রীসের প্রকৃতি-অনুরাগ, ও জীবন-অনুরাগ—সেই প্রকৃতি-অনুরাগ ও জীবন-অনুরাগের সন্ধান তিনি পেয়েছেন প্রাচ্যের অন্তরেও। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাতে যে গ্যেটের আনন্দ নেই হাফিজ-নামায তা আমরা দেখেছি।

কবি ইকবাল দৃশ্যত গোয়েটের প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর "পায়াম-ই-মশরেক" রচনা করেছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান সম্বন্ধে হাইনের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের দ্বারা—হাইনের দীর্ঘ মন্তব্য তাঁর গ্রন্থের সূচনায় উদ্ধৃত হয়েছে—আর তাঁর স্বকীয় ভাবধারার দ্বারা।

প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা আর পূরবী মিলিয়ে পড়া যেতে পারে।

ক্রিস্তিয়ানার দেহত্যাগ—পুত্রের বিবাহ—বাইরন

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ভাইমার রাজ্যের রাজনৈতিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গোয়েটের পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর বেতন বর্ধিত হয় তিন হাজার টালারে, বারবরদারি বাবদও তাঁর যথেষ্ট লভ্য হয়।

এই বৎসরই শার্লোট—ভের্টেরের শার্লোট, এখন সাট বৎসরের বৃদ্ধা—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গোয়েটে প্রথমে দেখা করতে ইতস্তত করেন—হয়ত পেছনের দিকে ফিরে না চাইবার ইচ্ছা থেকে—কিন্তু শেষে তাঁদের দেখা হয়। বৃদ্ধ স্বল্পভাষী গোয়েটেকে দেখে শার্লোট বিস্মিত ও দুঃখিত হন।

কিন্তু এই বৎসর সব চাইতে বড় ব্যাপার যেটি ঘটে সেটি হচ্ছে ক্রিস্তিয়ানার মৃত্যু। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভুগছিলেন। পরমস্নেহবতী সেবাপরায়ণা ক্রিস্তিয়ানার মূল্য সম্বন্ধে গোয়েটে চিরদিন সচেতন ছিলেন। মুমূর্ষু পত্নীর পাণ্ডুর তাপহীন হাত নিজের হাতে নিয়ে তিনি বল্লেন: তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, না না ছেড়ে যেয়ো না! পত্নীর মৃত্যুর দিনে কবি এই কটি চরণ রচনা করেন:

হায় সূর্য্য, বৃথা চেষ্টা তোমার
নিবিড় মেঘজাল ভেদ করতে!
আমার জীবনের সম্বল দাঁড়ালো—
তাকে হারিয়ে আর্তনাদ!

ব্রাণ্ডেস লিখেছেন, কবি কামরায় দরজা দিয়ে আকুল হয়ে শোকাশ্রু বিসর্জন করলেন।

কবি সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করলেন বিজ্ঞানের অনুশীলনে। এই বৎসরে সাহিত্য ও শিল্প-বিচার সম্পর্কে একখানি পত্রিকাও তিনি প্রচার করেন—১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেটি চলেছিল। লুডভিগের মতে শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে গোয়েটের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি রয়েছে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এটি তাঁর সাহিত্যিক শ্রমেরও এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

এই বৎসর কবির গৃহ আনন্দমুখরিত হয় পুত্রবধূর আগমনে, আর পর বৎসর কবি রচনা করেন তাঁর নবাগত পৌত্রের জন্য দোলনার গান।

কিছুদিন থেকে কবি আর শুধু জার্মানীর কবি ছিলেন না, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল—সেটি হয়েছিল কবির জন্য তাঁর স্বদেশীয় নিন্দুকদের অকরুণতা থেকে আশ্রয়-স্থল। লুডভিগ বলেছেন—বিদেশের শ্রদ্ধা যেন কবির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁর স্বদেশে। এই সময় থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্ব সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে' চললো—তিনি হলেন জাতির গুরু।

কবি তাঁর পত্রিকায় শুধু স্বদেশের নয় বিদেশের সমসাময়িক সাহিত্য ও শিল্পেরও বিচার করে চললেন। ইতালীয় কবি মান্‌ৎসোনি-র প্রতি তিনি অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তাঁর গুণ ও দোষ উভয়ের বিচার করে'। তাঁর এই বিচার ক্রোচে যথার্থ বলে' মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু বিদেশীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মনোযোগ সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেন ইংরেজ কবি বাইরন। বাইরন অবশ্য শুধু গ্যেটের মনোযোগই আকর্ষণ করেন নি, সমস্ত ইয়োরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন প্রবল ভাবে। তাঁর সম্বন্ধে গ্যেটের এই উক্তি এক হিসাবে সমস্ত ইয়োরোপের উক্তি :

> ইংরেজরা বাইরন সম্বন্ধে যাই বলুন এ কথা যথার্থ যে তাঁর মতো আর একজন কবি তাঁদের নেই।

এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাইরন সম্বন্ধে তাঁর অপর একটি বিখ্যাত উক্তি :

> বাইরন বড় কবিরূপে—ভাবতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন শিশু।

গ্যেটে বাইরনের স্থান নির্দেশ করেন শেক্‌স্‌পীয়রের নীচেই। ইংরেজরা অবশ্য বাইরনকে এত উঁচুতে স্থান দেন না। আর তাঁদের বিচারই বোধ হয় যথার্থ। বাইরন সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি আমরা উদ্ধৃত করবো 'আলাপ' অধ্যায়ে। মোটের উপর বলা যায় গ্যেটে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাইরনের অপরিমিত যৌবন-শক্তির দ্বারা—তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা আর জনগণের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ উভয়েই রয়েছে সেই যৌবন শক্তির পরিচয় †। এ সম্বন্ধে লুডভিগের উক্তি উপভোগ্য :

> বাইরনের প্রতি গ্যেটের শ্রদ্ধা হচ্ছে মহিমোজ্জ্বল পর্যুদস্ত বীরের প্রতি বিজয়ী বীরের গোপন ঈর্ষা।

ম্যাথ্যু আর্ণল্ডও বাইরনের প্রতিভাকে বলেছিলেন—The pageant of a bleeding heart—শোণিতস্রাবী হৃদয়ের শোভাযাত্রা।

† কবি নবীন সেনকে তাঁর যুগে বলা হতো বাংলার বাইরন। কিন্তু বাংলার সত্যকার বাইরন নজরুল ইসলাম। তাঁর প্রভাবও বাইরনের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়।

আরো ঊর্ধ্বে আরো দূরে

কন্দর্পের শেষ বাণ

লুডভিগ বলেছেন ষাট বৎসর বয়সের পূর্বে থেকে গ্যোটের স্বাস্থ্য আরো ভাল হতে থাকে ; তাঁর শরীর খানিকটা ঝরে যায়, ফলে তাঁর দেহের সৌষ্ঠব আরো বাড়ে। এইকালে নেপোলিয়ন তাঁকে দেখেছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ তাঁর তেয়াত্তর বৎসর বয়সে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক সোরে (Soret) তাঁকে দেখে লেখেন ঃ

> তাঁর মূর্তি এখনো সুদর্শন, তাঁর ললাট ও চক্ষু অসাধারণ মহিমাব্যঞ্জক। তিনি দীর্ঘকায়, সুঠাম, দেখে এখনো এত বেশী সক্ষম মনে হয় যে তিনি যে কেন কয়েক বৎসর ধরে বলে আসছেন যে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন বলে সমাজে মেলামেশা করা ও দরবারে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয় তা বোঝা কঠিন।

জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তার মন্তব্য করেন···বৃদ্ধ বয়সেও প্রচুর শোণিত উৎপাদনের ক্ষমতা গ্যোটের দেহ-যন্ত্রে ছিল।

তা ভাল স্বাস্থ্যের জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক কবি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ চুয়াত্তর বৎসর বয়সে, কন্দর্পের শেষ বাণের—হয়ত তীক্ষ্ণতম বাণের—লক্ষ্য হলেন। স্বাস্থ্যনিবাস কালস্‌বাড-এ ও তার নিকটবর্তী মারীনবাড-এ তাঁর পরিচিত লেফেৎসোভ (Levetzow) পরিবারের এক তরুণী—অথবা কিশোরী—তাঁকে একান্ত মুগ্ধ করলেন। এঁর নাম উলরিকা, এই সময়ে বয়স উনিশ বৎসর। চরিতকাররা বলেছেন, অসাধারণ সুন্দরী তিনি ছিলেন না, তবে তাঁর নীল চোখে ছিল একটি ছেলে-মানুষী ভাব আর তাঁর চুলগুলো সব সময়ে থাকতো কোঁকড়ানো।

ব্রাণ্ডেস বলেছেন একুশ বৎসর বয়সে ফ্রীডেরিকার প্রতি কবির অনুরাগ যতখানি প্রবল হয়েছিল তাঁর এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সে উলরিকার প্রতি অনুরাগ তার চাইতে আদৌ কম প্রবল হয়নি ; দূরে রাস্তায় উলরিকার গলা শুনেই কবি হ্যাট হাতে ছুটে বেরুতেন।

অচিরে কবি সংকল্প করলেন উলরিকাকে তিনি বিবাহ করবেন। তাঁর ডাক্তার এ বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিলেন না। স্বয়ং ডিউক কার্ল আউগুস্ট তাঁর বন্ধু সভাকবি ও প্রধান অমাত্যের ঘটক হয়ে গেলেন উলরিকার জননীর কাছে—হয়ত গোপনে হাসি চেপে। উলরিকার জননী সহজেই ভাবলেন এ একটা তামাসার কথা,

কিন্তু ডিউক জানালেন, গ্যেটে বাস্তবিকই ইচ্ছুক এই বিবাহ করতে, বললেন, উলরিকাকে রাজ্যের প্রধানা মহিলার পদ দেওয়া হবে, তাঁর আজীবন সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা হবে। উলরিকার জননী বিবেচনা করে দেখবার জন্য সময় চাইলেন।

কবি ক্ষুন্ন হয়ে ভাইমারে ফিরলেন। এসে দেখলেন তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর বাধা আরো প্রবল। পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার পথে এমন বিঘ্ন দেখে পুত্র ত পিতার সঙ্গে রীতিমতো অভদ্র ব্যবহার করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্যেটের পুত্র কোনো বিষয়েই তমন গুণশালী হতে পারেন নি। ভাল সম্ভাবনা যে তাঁতে ছিল না তা নয়, কিন্তু পিতার বিপুল ছায়া তাঁর বিকাশের সহায় হয়নি আদৌ। এর উপর তিনি হয়ে পড়েছিলেন অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত।

এত বাধা কবি আশঙ্কা করেন নি। তাঁর প্রবল অভিলাষ সংযত করা তাঁর পক্ষে প্রায় মর্মান্তিক হলো। জ্বর কাশি ও বুকের বেদনায় তিনি কঠিনভাবে আক্রান্ত হলেন—ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘ দিন ভুগে কবি রোগমুক্ত হলেন, লুডভিগ বলেছেন—হয়ত অতি প্রবল ইচ্ছাশক্তির গুণেই।

মারীনবাড থেকে ফিরবার কালে কবি গাড়ীতে বসে এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন, 'মারীনবাড-গাথা' নামে তা বিখ্যাত। সমালোচকেরা এই গাথাকে গ্যেটের শেষ বয়সের এক অতিশক্তিশালী কবিতা বলেছেন। কয়েকটি স্তবকের অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে :

* * * *

এখন বক্ষ আমার রুদ্ধ করেছে তার সব দ্বার ;
যেন কখনো ছিল না তা উন্মুক্ত ;
তারকিত আকাশের মতো ছিল যা দীপ্ত,
তাকে লাভ ক'রে হয়েছিল দিব্য-ঐশ্বর্য-বর্ষী,
দুঃখ-নৈরাশ্য-অনুশোচনার ভার আজ তার 'পরে—
চলেছি বয়ে নিয়ে নিঃসাড় দেহ নিদাঘ দিনে।

কিন্তু জগৎ আজো রয়েছে প্রাণবান্ ; তুঙ্গশৃঙ্গ পর্বত
আজো পায় শোভা বিপুল ছায়া বিস্তার ক'রে।
আজো ফলে ফসল ; নদীতীরে
বিসর্পিত হয় সবুজের সমারোহ।
বিরাট আকাশ আজো বেষ্টন ক'রে আছে ক্ষুদ্র ধরণীকে,—
ধারণ করছে বিচিত্র রূপ, হচ্ছে কখনো রূপহীন।

* * *

পাঠ করি যখন ধর্মগ্রন্থ তখন ভগবানের শান্তি
আসে নেমে—বুদ্ধি বিচার যা দিয়েছে আমাদের তার
চাইতেও বেশী পরিমাণে।
সেই ভগবৎ-শান্তির তুল্য প্রেমের আনন্দিত শান্তি
— লাভ হয়েছে যখন প্রিয়তমার সান্নিধ্য।
শান্ত তখন হৃদয়-মন, 'আমি তারই"
এই মধুক্ষরা ভাবনা ব্যাহত নয় আর কিছুতে।

পূত অন্তরে জাগে সাধ
মহত্তর পূততর জ্ঞানাতীত শক্তির কাছে
নিজেকে দিতে সঁপে।
চির-অনামা যেন তখন হয় প্রত্যক্ষ,
এরই নাম ভক্তি। এমন অনির্বচনীয় আনন্দের ভাগী আমি
যখন প্রিয়া আমার সম্মুখে।

তার আঁখি-পাত আমার জন্য রবি-কর,
তার সুরভিশ্বাস আমার জন্য দক্ষিণ সমীর—
গলে যায় গহন কন্দরের
দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিত অহমিকা-নীহার,
আর অস্তিত্ব নেই কোনো স্বার্থবোধের, কোনো অভিমানের,
সব হয়েছে অদৃশ্য তার অভ্যুদয়ে।

যেন বলতে চায় সে : "চলে যাচ্ছে যে সব মুহূর্ত
তারা মানুষের সামনে খুলে ধরছে জীবনের সদয় ছবি,
গতকাল মানুষকে দিয়েছে সামান্য জ্ঞান,
জানে মানুষ কি হবে আগামী কাল,
রাত্রের চিন্তা আনে বটে আমাদের মনে ত্রাস,
কিন্তু সূর্যাস্তের মহিমা ভ'রে দেয় বুক।

'অতএব চল আমি যেমন চলেছি, আনন্দে
আঁকড়ে ধরো প্রতি মুহূর্ত, থেকো না বসে'।
আঁকড়ে ধরো বিলম্ব না করে—এত প্রাণপূর্ণ সম্ভাবনাপূর্ণ,
এত প্রাণে প্রেমে সঞ্জীবিত এই মুহূর্ত,
সব দাঁড়াক তোমাকে ঘিরে, চিরউৎসুক শিশু তুমি,
তাহলে লাভ হবে তোমার সব, হবেনা বিফল।"···

আমি এখন সুদূরে! কি আমার জন্য শোভন
এই মুহূর্তে? বুঝি না কিছুই:
সন্ধান পাচ্ছি বহু সার্থকতার,
কিন্তু মন রাজি নয় কিছুতে, দিচ্ছে সব সরিয়ে।
অতৃপ্ত কামনা জেগে সমস্ত বুকে,—
ধারাসার অশ্রু-বর্ষণ ভিন্ন নেই আর কোনো আলম্ব।
* * *
যাও ছেড়ে আমাকে প্রাণের বন্ধুগণ!
যাও ছেড়ে আমাকে কাননে কান্তারে পর্বতে,
সাহস ধরো হে আমার মন, খোলা তোমার সামনে বিশ্বসংসার,
মাথার উপরে মহিমময় আকাশ, নীচে ধরণী;
দেখ, খোঁজো সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে—
তাহলে প্রকৃতি অবারিত করবে তার রহস্য-ভাণ্ডার।

আমারই সব, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি আমি নিজেকে—
যে-আমি ছিলাম এতদিন দেবতাদের অনুগৃহীত,
পাঠিয়েছেন তাঁরা পাণ্ডোরাদের† আমাকে বিপন্ন করার জন্যে,
বরদাত্রী এরা—ভয়ঙ্করীও এরা এত বেশী।
এই আনন্দ-মূর্তিরা প্রলুব্ধ করেছিল আমাকে রক্তিম ওষ্ঠাধর দিয়ে,
কিন্তু গেছে চলে—আমাকে লুটিয়ে ধুলায়।

এই কবিতা পড়ে একেরমান মন্তব্য করেন: এতে নৈতিক সমুন্নতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে নবযৌবনের প্রেমের দাহ ও দীপ্তি, এতে দেখা যাচ্ছে বাইরনের প্রভাব—অনুভূতির এমন উদ্দাম প্রকাশ সাধারণত গ্যেটের কবিতায় চোখে পড়ে না। একেরমানের মন্তব্যে গ্যেটে নাকি আপত্তি করেন না, তিনি বলেছিলেন:

> এটি এক প্রবল আবেগ-মুহূর্তের সৃষ্টি। যখন এই ভাবাবেগে আমার কেটেছিল তখন এর পরিবর্তে জগতের আর কিছুই আমার কাম্য ছিল না, কিন্তু এখন এর পুনরাবৃত্তি আমার কাম্য নয় আদৌ।
>
> মারীনবাড ছেড়েই এটি আমি রচনা করি, সেখানে যা কিছু ঘটেছিল তার স্মৃতি আমার মনে তখন অম্লান। সকালে আটটায় গাড়ী যখন প্রথম চৌকিতে থামলো তখন আমি লিখি এর প্রথম স্তবক। এমনি করে মনে মনে রচনা করে' চৌকিতে চৌকিতে তা লিখে চললাম। সন্ধ্যা

† গ্রীক-পুরাণের মোহিনী—দেবরাজ জেউস পাঠিয়েছিলেন মানববন্ধু প্রমেথেউসকে বিভ্রান্ত করতে।

পর্যন্ত সব ক'টি স্তবক দাঁড়িয়ে গেল। এজন্য এক বিশেষ ঋজুতা রয়েছে এতে—যেন সবটা এক সঙ্গে ঢেলে পড়েছিল—তাতেই হয়ত এর অখণ্ডতা লাভের সহায়তা হয়েছে।

লুডভিগও বলেছেন, এই কালে বাইরনের প্রভাব গ্যেটের উপরে প্রবল হয়েছিল। গ্যেটের এই উদ্দাম প্রেমাবেগে তিনি দেখেছেন তাঁর এত দিনের আত্মশাসন-প্রয়াসের নিদারুণ পরাভব; অবশ্য এই পরাভব থেকে কবি শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেয়েছিলেন।

কিন্তু বাইরনের প্রভাবের কথা না ভেবেও এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই ভাবে: উলরিকাকে লাভ করার পথে কবি তেমন কোনো বাধা দেখেন নি কেননা তিনি বিপত্নীক, আর তাঁর ডাক্তার তাঁর বিবাহের বিরুদ্ধে মত দেন নি; এজন্য তিনি এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন; তাঁর এমন চিত্তবিক্ষোভ হয়ত সেই নিশ্চয়তা থেকে।

তা যে কারণেই হোক এই জ্ঞানীকে আমরা এখানে দেখছি তাঁর এক অসতর্ক মুহূর্তে। কিন্তু কবি-দৃষ্টির অধিকারী তিনি, তাই সেই অসতর্ক—কিন্তু অকৃত্রিম—মুহূর্তকে তিনি রূপায়িত করতে পেরেছিলেন এমন উৎকৃষ্ট কাব্যে। মানবীর প্রতি প্রেমে কবি দেখেছেন ভগবদ্ভক্তির আভাস; এ কথাটি খুব অর্থপূর্ণ, বিশেষ করে' প্রাচ্যের রসিকদের কাছে। হয়ত এরই মধ্যে রয়েছে গেটের প্রকৃতির গূঢ় নির্মলতার পরিচয়।

উলরিকার প্রেমে কবি যখন বিহ্বল ও বিপন্ন সেই কালে তাঁর পরিচয় হয় মাদাম সীমানোভ্স্কা নাম্নী এক পোল-মহিলার সঙ্গে—তিনি ছিলেন পিয়ানো-বাজনায় অসাধারণ নিপুণা আর অসাধারণ সুন্দরী। এঁর সঙ্গীত ও সাহচর্য কবিকে অপরিসীম আনন্দ দান করে। এঁর উদ্দেশ্যে কবি তিনটি স্তবক রচনা করেন, তার নাম দেন "প্রায়শ্চিত্ত"—বোধ হয় এই কারণে যে সঙ্গীতের স্বর্গীয় প্রভাবে তিনি ফিরে পেয়েছেন স্বপ্রতিষ্ঠার আনন্দ:

প্রেম আনে দুঃখ। কে দেবে তোমাকে সান্ত্বনা,
ওগো আমার ব্যথাতুর মন, হলো তোমায় এত বড় ক্ষতি!
কোথায় সেই সুখের কাল? এত ক্ষণিক!
বৃথাই লাভ করেছিলাম অনুপমাকে ভাগ্যের হাত থেকে।
বিষাদজর্জর আমার আত্মা, খেই হারিয়ে গেছে সেই ক্ষুদ্র মধুর কাহিনীর;
আনন্দময় জগৎ আজ মৃত আমার চেতনায়!

অযুত সুরের ঘটছে সম্মেলন,
দিব্য পক্ষ বিস্তার করে' ভাসে সঙ্গীত,
বিদ্ধ করছে মানুষের মর্মমূল,
সৃষ্ট হচ্ছে শাশ্বত সৌন্দর্য;

নয়ন ভরে বাষ্পে, হৃদয়ের পূত বাসনায় নিবেদিত হয় শ্রদ্ধা
সঙ্গীতের দেবোপম মর্যাদার প্রতি, অশ্রুরও প্রতি।

এমনি ভাবে ভারমুক্ত চিত্ত অচিরে অনুভব করে
মরে নেই সে আজো, হচ্ছে স্পন্দিত, শোভন সেই স্পন্দন,
নিবেদিত করে নিজেকে স্বেচ্ছায় পরমানন্দে,
এমন প্রাণারাম দানের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতিতে :
অনুভূত হচ্ছিল তখন—চিরন্তন হোক সেই অনুভূতি—
সঙ্গীত ও প্রেমের দ্বিগুণিত আনন্দ।

এর পরের বৎসর ভের্টর-এর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার ভূমিকা-স্বরূপ কবি একটি কবিতা লেখেন। তাতেও তাঁর এই কালের ব্যর্থতা-বোধ গম্ভীর ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে।

এই তিনটি কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়ে অনুরাগ-ত্রয়ী (Trilogy of Passion) নাম পায়, এই ত্রয়ীর প্রথমটি "ভের্টরের প্রতি", দ্বিতীয়টি "মারীনবাড গাথা" আর তৃতীয়টি "প্রায়শ্চিত্ত"।

জয়ন্তী

ভাইমারের দরবারে, বিশেষ ক'রে ডিউক ও রাণীর কাছে, গ্যেটের মর্যাদা কত বেশী ছিল সে সম্বন্ধে লুইসের গ্রন্থে বর্ণিত এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য :

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভাইমারের ব্যবস্থাপক সভা রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ দাবি করেন। গ্যেটের উপরে ন্যস্ত ছিল শিল্প ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যয়ভার—তার পরিমাণ ১১৭৪৭ টালার। প্রথমে গ্যেটে এই হিসাব নিকাশের কথা কানে তোলেন নি, বরং এই সামান্য অর্থ নিয়ে এই ব্যস্ততায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক হিসাব দাখিল করতে হলো। তিনি লিখলেন : পাওয়া গেছে এত, ব্যয় হয়েছে এত, হাতে এত। লিখে নিজের নাম সই করে দিলেন। হিসাব দেওয়ার এই ভঙ্গি দেখে সভ্যেরা কেউ কেউ খুব হাসলেন, কেউ কেউ চটে গেলেন; তাঁরা বল্লেন এর পর আর তাঁরা এই ব্যয় মঞ্জুর করবেন না। কিন্তু অপরে এ মতে সায় দিলেন না। এ সম্বন্ধে গোপনে তাঁদের আলোচনা চললো। ক্রমে গ্যেটের কানে সব গেল। তিনি আরো অনড় হলেন। শেষে কথাটা গেল ডিউক ও রাণীর কানে। তাঁরা বুঝলেন গ্যেটে ঠিক কাজ করেন নি, তবু তাঁরা নিলেন তাঁরই পক্ষ। এ সম্বন্ধে রাণীর উক্তিটি অপূর্ব :

> ব্যবস্থাপক সভার মতই যে ঠিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মান্যবর গ্যেটেও ভাবছেন তাঁর মতই ঠিক। প্রচলিত আইনের উপরে আর

এক আইন আছে, সেটি হচ্ছে কবিদের ও নারীদের আইন। ব্যবস্থাপক সভা অবশ্য এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ যে মান্যবর তাঁর হাতে গচ্ছিত অর্থ বাবদ অনুযায়ীই মঞ্জুর করেছেন। এখন কেবল জানতে হবে যথাযথভাবে তার ব্যয় হয়েছে কি না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে বৃহত্তর জগতে, স্বদেশে, আমাদের এই রাজ্যে, আর ডিউকের কাছে এতদিন ধরে কি মর্যাদা তাঁর দাঁড়িয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূলে সেই মর্যাদা। তাঁর মতো লোকের হাতে যে অর্থ ন্যস্ত করা হয়েছে তার যোগ্য ব্যবহার সম্বন্ধে অপরের উপদেশের তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই এ অতি যথার্থ কথা। অবশ্য হিসাব নিকাশ আমি বুঝিনা। এ সম্বন্ধে কোনো সংশোধন নির্দেশ করার স্পর্ধাও আমার নেই। তবে আমি এই বুঝি যে আমাদের আর মান্যবরের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক; তাঁর কোনোরূপ বিরক্তির উদ্রেক না হোক। কিন্তু কেমন করে এটি সম্ভব হবে তা বলার সাধ্য আমার নেই। কোনো দ্বিতীয় মন্ত্রীর সম্পর্কে এমন ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা আদৌ নেই; সে বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভা নিঃসন্দেহ হতে পারেন। আমাদের মাত্র একজন গ্যেটেই আছেন, আর তিনিও যে কতদিন থাকবেন কে জানে। এমন দ্বিতীয় জন হাত আর শীগ্‌গির পাওয়া যাবে না।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ডিউক কার্ল আউগুস্টের রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। গ্যেটের উদ্যোগে তাঁর জুবিলি উৎসব সমারোহে সম্পাদিত হয়। সেই বৎসরই ৭ই নভেম্বর তারিখে গ্যেটের ভাইমার আগমনের ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। সেই দিনে কবিকে সম্মানিত করবার এক বিপুল আয়োজন ডিউক করেন অবশ্য কবিকে না জানিয়ে। লুইসের গ্রন্থে এই জয়ন্তীর যে বর্ণনা আছে তা সংক্ষেপে এই :

প্রত্যূষে শয়নকক্ষের জানালার খড়খড়ি খুলতেই কবি শুনলেন তাঁর বাগানের ঝোপে ঝোপে লুকোনো গায়কদের গান। এরপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বন্ধুদের প্রীতিসিক্ত বিচিত্র উপহার। সাড়ে আটটায় সহরের সমস্ত পদস্থ নাগরিক তাঁদের যানবাহনের শোভাযাত্রা চালালেন কবিতীর্থ পানে। কবির একটি ছোট বসবার ঘরে বহু গায়ক ও বিশিষ্ট গায়িকারা আসন গ্রহণ করেছিলেন রীমর-রচিত কবি-প্রশস্তিতে সুর-যোজনা করতে। সর্বত্র এত ভিড় হয়েছিল যে কবিকে আনা হলো পাশের এক দরজা দিয়ে। কবির চিরদীপ্ত মূর্তি নয়নগোচর হতেই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হলো। জলকুমারীবেশিনীরা

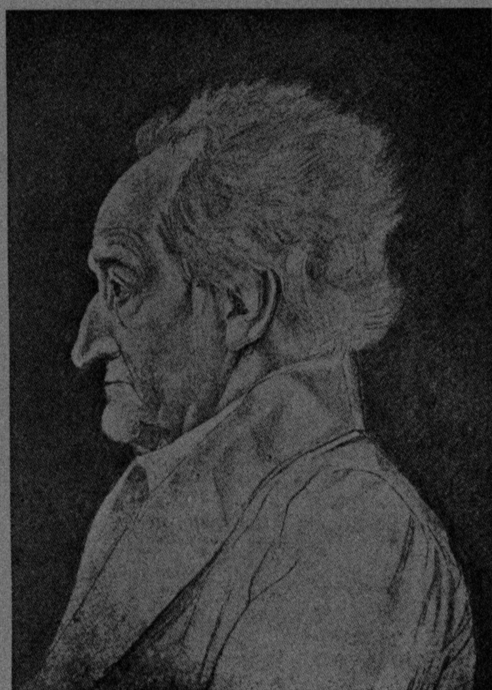
অভিনন্দন জানালেন আজকার স্মরণীয় দিনের প্রতি, গাইলেন কবির অমরতা। গভীর ভাবাবেগের সঞ্চার হলো সমাগত জনচিত্তে—সঙ্গীত ধ্বনি হলো স্তব্ধ। কবির মুখে ফুট্‌লো গাম্ভীর্য ও পরম বিনয়। সমাগত বন্ধুদের প্রসারিত কর তিনি সাবেগে মর্দন করলেন—সানুরাগ ধন্যবাদ জানালেন। এরপর কবিকে উপহার দেওয়া হলো গোপনে নির্মিত এক স্বর্ণপদক—তার এক পিঠে ডিউক ও রাণীর মূর্তি অপর পিঠে কবির পত্র-মুকুট-শোভিত শির! কবি উপহার-হাতে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কবিকে মানপত্র দেওয়া হলো। দ্বিপ্রহরে কবির সুপ্রশস্ত দরবার-কক্ষে সমস্ত পদস্থ মহিলা ও পুরুষ শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষে এক বেদিকার উপরে স্থাপন করা হয়েছিল রাউখ-নির্মিত কবির বিখ্যাত আবক্ষ মর্মর-মূর্তি আর ডিউকের মর্মর-মূর্তি, আর তার পাশে রাখা হয়েছিল এক পত্র-মুকুট। শোভাযাত্রা কক্ষের মধ্যস্থলে পৌঁছুতেই চারিদিকের গ্যালারি থেকে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হলো। সেই বহুমূর্তি ও বহুচিত্র-শোভিত কক্ষে এই সঙ্গীতের প্রভাব হলো অপূর্ব। বেলা দুইটায় দুই শতেরও অধিক অভ্যাগতকে নিয়ে এক ভোজের আয়োজন হলো। সন্ধ্যায় হলো ইফিগেনিয়ার অভিনয়। কবি তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত অবস্থিতি করলেন ডাক্তারের পরামর্শে। এরপর তাঁর গৃহের সম্মুখে চললো বিখ্যাত যন্ত্রীদের সঙ্গীত। এই অঞ্চলের সমস্ত গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত হলো।—এই দিনে লাইপৎসিগে ও ফ্রাঙ্কফোর্টেও উৎসব হলো।

ভিলহেল্‌ম মাইস্‌টারের ভ্রমণ

এটি প্রকাশিত হয় ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অল্প কিছুকাল পূর্বে। সমালোচকেরা প্রায় সবাই এটিকে বলেছেন শিল্পসৃষ্টি হিসাবে দুর্বল রচনা। এতে বিচিত্র ধরণের উপাখ্যান ও উক্তিকে এক মূল আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু সে-চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ হয়নি। এতে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে দেখা যাচ্ছে তার পুত্র ফেলিক্‌সের শিক্ষার জন্য ব্যগ্র, সেই সম্পর্কে সে নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। এসব অবশ্য কাল্পনিক প্রতিষ্ঠান—গ্যেটের শিক্ষা-পরিকল্পনার আলম্বন।

কিন্তু গঠনের দিক দিয়ে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হলেও এর কোনো কোনো কাহিনীতে কাব্য-সৌন্দর্য চমৎকার ফুটেছে, আর নানা জ্ঞানগর্ভ উক্তি একে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।



৭৭ বৎসর বয়সে

—এক জায়গায়, পাহাড়ের উপরে উঠে ভিলহেল্‌মের মাথা ঘুরে গেল। একটু সুস্থ হয়ে সে বলছে :

উপরে উঠে প্রথম নীচের দিকে তাকিয়ে যখন আমাদের মাথা ঘোরে তার মতো আনন্দকর মুহূর্ত আর নেই।

শিক্ষা সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছে :

এখন বিশেষজ্ঞতার কাল এসেছে।

এর এক বিখ্যাত অংশ হচ্ছে ধর্মভাব ও ধর্মভাবের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্যেটের মত, তার পরিচিত নাম "শ্রদ্ধাত্রয়" (Three Reverences), তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই :

প্রকৃতি মানুষকে যেসব শক্তি-সম্ভাবনা দিয়েছে তাই তার জন্য অশেষ কল্যাণের নিদান, মানুষের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষা অনেক সময়ে সে সবের উৎকর্ষ সাধন না ক'রে করে ব্যর্থ। কিন্তু একটি পরম প্রয়োজনীয় সামগ্রী সে প্রকৃতি থেকে পায়নি—তার নাম শ্রদ্ধা (Reverence)—প্রকৃতির নির্দেশ বরং শ্রদ্ধাহীন হবার দিকে। এই শ্রদ্ধা সহজভাবে সঞ্চারিত হয় কোনো কোনো ক্ষণজন্মা পুরুষের অন্তরে, তাঁদের লোকেরা মহাপুরুষ অথবা দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে, এই সব মহান্ আত্মার কাছ থেকেই এই পরমকল্যাণকর শ্রদ্ধা শিক্ষা করতে পারা যায়। শ্রদ্ধা ও ভয় এক জিনিষ নয়। ভয়ের সামগ্রীকে লোকে পরিহার করতে চায়, অথবা জয় করতে চায়, তাই ভয় থেকে মানুষের গতি হয় স্বস্তির দিকে অথবা স্বস্তি থেকে ভয়ের দিকে, কিন্তু শ্রদ্ধা থেকে মানুষের চিত্তে সঞ্চারিত হয় স্থায়ী আনন্দ। যে ধর্মের অধিষ্ঠান ভয়ের উপরে তা বর্জনীয়। এই শ্রদ্ধা বা ধর্ম ত্রিবিধ। প্রথমটির নাম দেওয়া যেতে পারে ঊর্ধ্বের দেবতা বা দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা—গুরু ও পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধা এর প্রতীক। এর নাম গোত্রধর্ম বা জাতীয় ভাব: এর সাহায্যে মানুষ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে আদিম বর্বর ভীত জীবনের দুর্দশা থেকে। জগতের প্রকৃতি-পন্থী ধর্মগুলো এই শ্রেণীর তা নাম তাদের যাই হোক।—দ্বিতীয়টির নাম দার্শনিক ধর্ম, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সে সবের প্রতি শ্রদ্ধা এর মূলে। দার্শনিক হচ্ছেন তিনি যিনি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন জগৎব্যাপারের মধ্যস্থলে, সমস্ত মানুষকে তিনি বুঝেছেন তাঁর সমকক্ষ বলে'—যা তুচ্ছ তাকে তিনি তুলতে চেষ্টা করেন তাঁর নিজের উচ্চতর গ্রামে, যা দুর্লভ তাকে তিনি নামিয়ে আনতে চান তাঁর দৈনন্দিন জীবনে, এই মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্যই তিনি

জানা, ক্ষুদ্র ও মহৎ, দূর ও নিকট, প্রয়োজনীয় ও আকস্মিক, জগদ্‌ব্যাপারের সব-কিছুর সঙ্গে এমন যোগযুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকেই বলা যায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত।—তৃতীয় শ্রদ্ধা হচ্ছে অবনত, হীন, এসবের প্রতি শ্রদ্ধা, খৃষ্টধর্মে এই ভাবের প্রকাশ। এতে দুঃখ ত্রুটি, পাপ, প্রভৃতির প্রতি শুধু শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না সে-সবকে জ্ঞান করা হয় দিব্য—আমাদের আত্মোৎকর্ষের পরিপন্থী নয় বরং সহায়। এ ভাব অল্পমাত্রায় ইতিহাসের সব যুগেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু খৃষ্টধর্মেই এটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে, সেজন্য খৃষ্টধর্ম হয়েছে অবিনশ্বর, মানুষের লাভ হয়েছে এক অক্ষয় সম্পদ। এই তিন শ্রদ্ধায় বা ধর্মেই মানুষের প্রয়োজন, এই তিনের সমবায়েই সত্যধর্ম। এই তিন শ্রদ্ধার সমবায় থেকে উদ্ভূত হয় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা যার নাম নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা থেকে আবার উৎসারিত হয় পূর্বোক্ত তিন শ্রদ্ধা। অন্তরে এই শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধার সঞ্চারের ফলে মানব নিজেকে জ্ঞান করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, অহমিকা ও দুরাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে সে এই উচ্চগ্রামে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। *

ধর্ম সম্বন্ধে এই ব্যাপক ও গভীর বোধের জন্যই তিনি যে প্রচলিত ইহবিমুখ আত্মম্ভরী খৃষ্টান মতবাদের বিরোধী হয়েছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়।—বাইবেল সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি ক্রোচের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে:

বাইবেল বহুধর্ম-গ্রন্থের সমষ্টি, কিন্তু সে সব এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যে বহুবিচ্ছিন্নতা এখানে রূপ ধরেছে অখণ্ডতার, সে-সবের প্রায়-পূর্ণাঙ্গতা দেয় তৃপ্তি, খণ্ডতা করে কৌতূহলের উদ্রেক, বর্বরতায় জাগায় প্রতিবাদ, সৌকুমার্য আনে প্রশান্তি …।

ইহুদিদের সম্বন্ধে এই উক্তিতে ক্রোচে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পেয়েছেন:

(আদর্শ রাষ্ট্রের সভ্য ক'রে) ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের অংশীদার করা যায় না, কেন না সেই উৎকর্ষের উৎপত্তি ও লালন-ধারা তারা অস্বীকার করে।

নরনারী সম্বন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে:

এক নারী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাব কোনো পুরুষ অন্য নারীর কাছে যেন কদাচ না দেখায়, তারা পরস্পরকে এত বেশী জানে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাদের রুচিকর হয় না। তারা যেন বিক্রেতা

* ভারতীয় ঋষির সোঽহম্, হজরত মোহম্মদের ‘আল্লাহ্‌র রূপে বিভূষিত হও’ মনসুর হাল্লাজের ‘আ’নাল হক’ প্রভৃতি বাণী স্মরণীয়। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সোঽহং তত্ত্বের ব্যাখ্যাও স্মরণীয়।

> আর পুরুষ ক্রেতা, বিক্রেতা তার জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, ক্রেতাকে কোন্ জিনিষ কোনভাবে দেখালে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হবে তা বিক্রেতা ভাল করেই জানে। কিন্তু ক্রেতা অজ্ঞ, তার জিনিসের গরজ, পরখ করে দেখবার সময় বা যোগ্যতা তার কোথায়। মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজনীয় তেম্নি প্রশস্ত, সমস্ত কেনা-বেচার, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহের এই ধারা।

এতে এক ক্ষুদে পরীর গল্প আছে, সেই ক্ষুদে পরীর প্রেমে এক যুবক খর্বাকৃতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে যে একদিন উন্নতদেহ ছিল সে কথা ভোলা তার পক্ষে কঠিন হলো। নিজের এই মানসিক অস্বস্তি সম্বন্ধে সে বলছে:

> দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বাবস্থার কথা আমি বিস্মৃত হইনি। সেই প্রাচীন মহিমার স্মৃতি আমাকে ক'রে তুলেছিল অস্থির ও অসুখী। এই থেকে আমি প্রথম বুঝলাম দার্শনিকরা আদর্শ বলেন কাকে, আর সেটি মানুষের কত অস্বস্তির কারণ। আমার নিজস্বতার একটি আদর্শ আমার মনে ছিল, ঘুমঘোরে কখন কখন দেখতাম আমি অতিকায় হয়েছি।*

এর অপর এক কাহিনীতে একজন পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় হয়েছে এক তরুণীর প্রেমপাত্র। প্রৌঢ়ের মনে দ্বন্দ্ব চলেছে এই বয়সে প্রেমের পাত্র হবার যোগ্যতা সত্যই তার আছে কিনা। তার এক বন্ধুর পরামর্শে সে ব্যাপক প্রসাধনের সাহায্যে নষ্ট যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝে এ চেষ্টা অসার্থক, নিবৃত্তি এখন তার জন্য প্রশস্ততর। গ্যেটের শেষ বয়সের অনেক রচনায় এই নিবৃত্তির (Renunciation) কথা ফুটে উঠেছে আমরা দেখেছি। বলা বাহুল্য এর দ্বারা তিনি নিরানন্দ বৈরাগ্য অবলম্বনের ইঙ্গিত দেন নি, তিনি বলেছেন সীমা-নির্দেশ ও প্রশান্তি লাভের কথা।

এই গ্রন্থে সাম্যবাদের (Socialism) দিকে গ্যেটের স্পষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ব্যাপক যান্ত্রিক উৎপাদন, ধনবৃদ্ধি, এ সবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে এ বিষয়ে তিনি অবহিত হন। তাই ব্যক্তির উৎকর্ষ-চিন্তা—ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্‌টারের শিক্ষানবিশীর যা প্রতিপাদ্য—তাঁকে আর সন্তুষ্ট রাখতে পারে না, গণের কল্যাণ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য এবিষয়ে তেমন কোনো স্পষ্ট কর্মধারার নির্দেশ তিনি দেননি। তিনি ছিলেন সহজভাবে মহৎ—ভাইমারে তাঁর কর্মজীবনের সূচনায় তার পরিচয় আমরা পেয়েছি—তাঁর সেই সহজ গভীর মানবপ্রেম প্রয়োজনের দিনে তাঁকে যে নিয়ে যাবে সাম্যবাদের দিকে এ প্রায় অপরিহার্য। জগতের সব মহামানবই সাম্যবাদী—বার্নার্ড শ'র এই উক্তি যথার্থ।

* আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান সনাতনীদের 'চেতনা' [illegible] ইত্যাদির পরিবর্তনবিমুখতা সম্বন্ধে গ্যেটের এ বক্তব্য রয়েছে সেটিও তাদের অনুধাবনের যোগ্য।

একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ

এটি এক বিখ্যাত গ্রন্থ। অজার্মানদের কেউ কেউ—যেমন Outline of Literature-এর লেখক John Drinkwater—এতেই পেয়েছেন গ্যেটে-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

গ্রন্থের সূচনায় একেরমান আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন অতি দরিদ্রের সন্তান। তাঁর পিতা ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। যথেষ্ট বয়স হলে বহু চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শেখেন ও গ্যেটে-সাহিত্যের ভক্ত হয়ে পড়েন। গ্যোটিঙ্গেন থেকে তিনি পায়ে হেঁটে ভাইমারে যান গ্যেটের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর চরিত্রের সরলতা ও অন্তরের শ্রদ্ধা কবিকে মুগ্ধ করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কবির তিরোধান পর্যন্ত তিনি তাঁর সাহচর্য ভোগ করেন। প্রথমে কবি তাঁকে ভার দেন তাঁর অপ্রকাশিত রচনাসমূহ সুসম্বদ্ধ করতে। কবির মৃত্যুর পরে—কবির নির্দেশে—তাঁর রচনাবলী সম্পাদনার ভার তিনি পান।

একেরমানের লিপিবদ্ধ আলোচনার অনেক অংশ গ্যেটে দেখে দিয়েছিলেন। সোরে (Soret) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকও কবির আলাপ লিপিবদ্ধ করেন—সেটিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সোরের যেসব বিবৃতি আমরা উদ্ধৃত করবো তাতে মূলের অনুযায়ী তারকা-চিহ্ন দেওয়া থাকবে।

* ১৮২২ খৃষ্টাব্দ—মঙ্গলবার, ৩রা ডিসেম্বর।

…গ্যেটে তাঁর Charon কবিতা আমাদের পড়ে শোনালেন।

…এমন সুন্দর আবৃত্তি আর শুনিনি। কী উদ্দীপনা! চোখে কী দৃষ্টি! কী কণ্ঠ! একবার বজ্রনির্ঘোষ আর বার মৃদু ও কোমল। যে ছোট কামরায় আমরা বসেছিলাম, তার তুলনায় কখনো কখনো যেন অতিরিক্ত শক্তি তিনি প্রয়োগ করছিলেন; কিন্তু তবু আবৃত্তি যা করলেন তা ভিন্ন আর কিছু আমাদের ভাবনার বাইরে!…

১৮২৩ খৃষ্টাব্দ—ভাইমার, ১০ই জুন (গ্যেটের সঙ্গে একেরমানের প্রথম সাক্ষাৎকার)

…নির্দিষ্ট সময়ে আমি উপস্থিত হলাম। দেখলাম, একজন ভৃত্য অপেক্ষা করছে আমাকে উপরে নিয়ে যাবার জন্যে।…গৃহের অভ্যন্তর দেখে আনন্দ হলো; জমকালো কিছুই নয়, সব সরল ও উন্নতরুচির। সিঁড়ির উপরে রয়েছে প্রাচীন গ্রীক মূর্তির অনুকৃতি, সাক্ষ্য দিচ্ছে কারু-শিল্পের প্রতি আর প্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রতি গ্যেটের পক্ষপাত।…

অনতিবিলম্বে গ্যেটে কামরায় প্রবেশ করলেন, তাঁর পরিধানে সবুজ ফ্রককোট, পায়ে জুতা, কী মহিমময় মূর্তি! আমার উপরে যে প্রভাব হলো তা বিস্ময়কর, কিন্তু অচিরে তিনি আমার সব অস্বস্তি দূর করে দিলেন অত্যন্ত সহৃদয় আলাপে।···

আমি তাঁর পাশেই বসেছিলাম ; কথা বলতে ভুলে গিয়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম, চেয়ে চেয়ে আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। তাঁর মুখমণ্ডল এমন শক্তির পরিচায়ক—এমন রোদে ঝলসানো! এত বলি-রেখা, প্রত্যেক রেখা ভাবব্যঞ্জক! সর্বত্র এমন মহিমা, এমন দৃঢ়তা! এমন প্রশান্তি, এমন ঔদার্য! ধীরে শান্তভাবে তিনি আলাপ করছিলেন—যেন কোনো বর্ষীয়ান নৃপতির মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে বাণী। তাঁকে দেখেই বোঝা যায় স্বপ্রতিষ্ঠ তিনি, প্রশংসা ও নিন্দার বহু ঊর্ধ্বে তাঁর আসন। তাঁর পাশে বসে আমার অপরিসীম আনন্দ হলো; আমার চিত্ত শান্ত হলো, দীর্ঘ শ্রম দুঃখ ও প্রতীক্ষার পরে অবশেষে সিদ্ধ হয়েছে যার মনস্কাম, আমার অবস্থা তার মতো।

বুধবার, ১১ই জুন

আজ ভোরে গ্যেটের নিজের হাতের লেখা একখানি চিঠি পেলাম, লিখেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে কাটালাম। আজ তাঁকে মনে হলো কালকের তুলনায় স্বতন্ত্র লোক—যুবকের অস্থিরতা ও প্রবলতা তাঁতে।

যেনা—বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর

···গ্যেটে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারকার গ্রীষ্মে আমি কবিতা লিখছি কিনা। আমি বল্লাম, কয়েকটি লিখেছি, কিন্তু কবিতা রচনার স্বচ্ছন্দ শক্তি আমার নেই। তিনি বল্লেন: "সাবধান কোনো বড় কাব্যে হাত দিও না।···বর্তমানের দাবি প্রবল, প্রতিদিন যেসব চিন্তা ও অনুভূতি কবির মনে জাগে, সে সব প্রকাশ চায়, চাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু যদি কোনো বড় বইতে মন দাও, তাহলে আর কিছু আর তার পাশে বাড়বার সুবিধা পাবে না, বরং হবে বর্জিত, সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের জন্য জীবনের আনন্দই পাবে লোপ। একটা বড় বই দাঁড় করাতে চাই কত শক্তি, তাকে পুরোপুরি রূপ দিতে চাই কত নির্বিঘ্নতা। যদি সমগ্রতার দিক দিয়ে কোনো ভুল

করে থাক, তবে সব শ্রম হলো পণ্ড, আর যদি এত বড় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচরণ তোমার আয়ত্ত হয়ে না থাকে, তবে তোমার রচনা হল ত্রুটিপূর্ণ, পাবে নিন্দা। এত শ্রম করে পুরস্কার ও আনন্দের পরিবর্তে কবি শেষে পেলে কিনা অস্বস্তি, ক্ষয় হলো তার শক্তি। কিন্তু যদি প্রতিদিন সে সচেতন থাকে বর্তমান সম্বন্ধে, রচনা করে যায় প্রতিদিনের সরসতা নিয়ে, তবে ভাল-কিছু লাভ তার জন্য সুনিশ্চিত, যদি কখনো বিফল হয়, তবে ক্ষতি হয় না তার তেমন কিছুই। ·

·· জগৎ এত বড়, এত সমৃদ্ধ, জীবন এত বৈচিত্র্যময় যে, কবিতার ঘটনার অভাব হয় না কখনো। সব কবিতাই হওয়া চাই কিন্তু সাময়িক কবিতা অর্থাৎ বাস্তবতা থেকেই আসবে তার প্রেরণা আর বাস্তবতাই হবে তার বিষয়। বিশেষ বিশ্বব্যাপক ও কবিত্বময় হয় কবির হাতের স্পর্শ পেয়ে। আমার সমস্ত কবিতাই সাময়িক কবিতা, বাস্তব ঘটনা থেকে সে-সবের সূচনা, বাস্তবে সে-সব দৃঢ়মূল। খেয়ালী কবিতার কোন মূল্য আমার কাছে নেই। . নবযৌবনে বিষয়ের জ্ঞান মাত্র একদেশদর্শী। বড় কাব্য রচনা করতে চাই বহু বিষয়ের জ্ঞান, কাজেই বড় কাব্যে নষ্ট হয় তরুণ লেখকের শক্তি।

তোমাকে আরো সাবধান করছি বড় বড় ঘটনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্পর্কে। তরুণদের জন্য এ-সব নয়। আমি বরং বলি, যেসব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করা হয়েছে, সে-সব দিয়ে আরম্ভ করতে। কত 'ইফিগেনিয়া' লেখা হয়েছে। তবু সে সব একটি অন্যটি থেকে পৃথক, কেননা প্রত্যেক লেখক বিষয়টি ভাবেন ও সাজান ভিন্ন রকমে, অর্থাৎ তাঁর নিজের ধরনে।"

বৃধবার, ২৯শে অক্টোবর

আজ যখন গ্যেটের কাছে গিয়েছিলাম, তখন বাতি জ্বালানো হচ্ছিল। দেখলাম তাঁকে খুব প্রফুল্ল, প্রদীপের আলোকে তাঁর চোখ ঝকমক করছিল আর সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠেছিল যৌবন, উৎফুল্লতা ও শক্তি।

আমার সঙ্গে পায়চারি করতে করতে তিনি কালবিলম্ব না করে'

যে সব কবিতা (ঋতু সম্বন্ধে) তাঁকে পাঠিয়েছিলাম, সে সব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন…"প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার বিশেষ বোধ ও অনুভূতি আছে মনে হচ্ছে। তোমার কবিতাগুলো সম্বন্ধে মাত্র দুটী কথা বলবো। শিল্পের যেটি প্রধান ও কঠিন ব্যাপার—বিশেষের বোধ—তাতে প্রবেশ করবার সময় তোমার এসেছে, নিজের উপরে কিছু জবরদস্তি করেও তোমাকে সাধারণ ধারণা (idea) থেকে মুক্তি পেতে হবে।…সম্প্রতি তোমার কিছুকাল টিফ্রুটে কেটেছে; তা থেকেই তোমার বিষয় নির্বাচিত হতে পারে। হয়ত আবার টিফ্রুটে ফিরে গিয়ে তিন চার বার তাকে ভাল করে দেখে তবে তার বিশেষ রূপটি তোমার আয়ত্ত হবে।…খাটুনিতে কমতি করো না, পুরোপুরি দেখ, তারপর তার ছবি আঁকো। এই বিষয় নিয়ে বহু পূর্বেই আমার লেখা উচিত ছিল—কিন্তু পারি নি, কেননা এর সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যাপার আমার অতীত জীবনের বিষয় আর আমার সত্তা সে-সবের দ্বারা এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপার আমার মনের উপরে চেপে বসে বোঝা হয়ে। কিন্তু তুমি এসেছ সদ্য, তোমার চোখে পড়বে এর যা বর্তমান প্রধান অর্থপূর্ণ শুধু সেই সব।… জানি আমি, বিষয়টি কঠিন; কিন্তু শিল্পের প্রাণ হচ্ছে বিশেষের ধারণা ও রূপায়ণ। সাধারণ লক্ষণের বর্ণনায় সহজেই অপরে তোমার অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু বিশেষের বর্ণনায় পারে না, কেননা অন্যে ঠিক তোমারই মতো অনুভব করেনি।

…আর যে কবিতা যেদিন লেখ, সেই তারিখ তাতে দিয়ে রেখো। তোমার কবিতাগুলো এইভাবে হবে তোমার অগ্রগতির দৈনন্দিন পরিচয়-লিপি।"

সোমবার, ৩রা নভেম্বর

…গ্যেটে বল্লেন, "যদি বিষয় অযোগ্য হয়, তবে শিল্পীর সব শক্তি হয় ব্যর্থ।

আধুনিক শিল্পীরা যোগ্য বিষয় পাচ্ছে না, তাতেই আধুনিক শিল্পে মানুষ পাচ্ছে এত বাধা। এর জন্য আমরা সবাই ভুগছি। আমি নিজেও আমার আধুনিকতা বর্জন করতে পারি নি।

…প্রত্যেক ঘটনা—প্রত্যেক মুহূর্ত—অশেষ মূল্যবান; কেননা তা অনন্তের প্রতিনিধি।"

*রবিবার—২১শে ডিসেম্বর

…গ্যেটের পুত্রবধূ কামরায় প্রবেশ করে শ্বশুরকে জানালেন যে, তাঁর মা আসছেন, তাঁকে এগিয়ে আনার জন্য তিনি বার্লিনে যাচ্ছেন।

তিনি চলে গেলে নবীন-নবীনাদের সজীব কল্পনা নিয়ে গ্যেটে তামাসা করলেন। বল্লেন, "আমি এখন বুড়ো মানুষ, তাকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা যে, মাকে বহুদিন পরে দেখার আনন্দ এখানেও তার ততখানি হতো যতখানি হবে বার্লিনে। এই শীতের মধ্যে এমন ভ্রমণের দুর্ভোগ সহ্য করা অর্থহীন। কিন্তু নবীন-নবীনাদের চিন্তায় অর্থহীন ব্যাপারের মূল্য ঢের, আর শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিই-বা এতে এমন কি হয়। মানুষকে মাঝে মাঝে কিছু অকাজ করতেই হয়, অন্তত, খানিকটা সজীবতা বোধ করার জন্যে। যখন নবীন ছিলাম, তখন আমিও এই করেছি, কিন্তু রক্ষা পেয়েছি প্রায় অক্ষত দেহেই।"

বুধবার—৩১শে ডিসেম্বর

…এরপর ধর্মসংক্রান্ত বিষয় ও ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো। গ্যেটে বল্লেন, 'লোকেরা এ বিষয়ে এমন আচরণ করে যেন সেই দুর্জ্ঞেয়, মহত্তোমহীয়ান, চিন্তার অতীত, সত্তা তাদের সমশ্রেণীর। নইলে তারা বলতে পারতো না—প্রভু ঈশ্বর, প্রিয় ঈশ্বর, দয়াল ঈশ্বর; এই সব কথা তাদের মুখে, বিশেষত যাজকদের মুখে—যারা প্রত্যহ উচ্চারণ করছে এসব—অর্থহীন কথার কথা মাত্র হয়ে পড়েছে। যদি তাঁর মহিমা তারা বুঝতো, তবে মূক হয়ে যেতো, শ্রদ্ধায় আনতো না তাঁর নাম মুখে।"

১৮২৪ খৃষ্টাব্দ

শুক্রবার—২রা জানুয়ারী

গ্যেটে বল্লেন: "যে মানতে চায় না যে, শেক্‌স্‌পীয়রের মাহাত্ম্য বহুল পরিমাণে তাঁর অসাধারণ প্রাণবন্ত যুগের গুণে, সে এই কথা চিন্তা করুক যে তেমন বিস্ময়কর ঘটনা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডে, এই ছিদ্রান্বেষী সূক্ষ্মতর্কপরায়ণ সাময়িক পত্রিকার দিনে, সম্ভবপর কিনা।—সেই অবিক্ষুব্ধ, অকলঙ্ক, স্বপ্ন-পরিক্রমার মতো অনায়াস সৃষ্টি—কেবল এইভাবেই বড় কিছু সম্ভবপর হতে পারে—আজ আর সম্ভবপর নয়। আজকার গুণীরা অনাবৃত জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে। পঞ্চাশ জায়গায় চলছে সমালোচনা,

আর তার জের চলেছে জনসাধারণের মধ্যে, এর ফলে যা স্থায়ী হবে এমন কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাহত। আজকার দিনে যে এসব থেকে দূরে না থাকে, জোর করে' নিজেকে সরিয়ে না নেয়, তার আশা নেই। শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্য-বিচার সম্পর্কে পত্রিকাগুলোর অক্ষম, প্রধানত ত্রুটি-অন্বেষী, সমালোচনার ভিতর দিয়ে এক শ্রেণীর অর্ধ-চিত্তোৎকর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে জনসাধারণের মধ্যে, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পক্ষে তা অবাঞ্ছিত কুযাশা, বিষপ্রসেক, শোভাবর্ধক সবুজপত্র থেকে গূঢ় মজ্জা এমন কি সুগুপ্ত তন্তু পর্যন্ত বৃক্ষের সব সৃষ্টি-শক্তি তাতে হয় নষ্ট।

তাছাড়া এই দুই অসুন্দর শতাব্দীর ভিতর দিয়ে জীবন হযে পড়েছে কত দুর্বল, স্ফূর্তিহীন। কোনো মৌলিক প্রকৃতির লোক আজকাল কি আর চোখে পড়ে? আমি যা, আমি তাই— এ কথা বলবার মতো জোর আজ কার আছে?"

বৃহস্পতিবার—২৬শে ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বল্লেন:…"রুচির বিকাশ হতে পারে কেবল উৎকৃষ্ট শিল্পের ধ্যান ধারণা থেকে, মাঝারি ধরণের শিল্পের চর্চা থেকে নয়।…

…সত্যকার কবির জন্ম জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান সহজাত, এর যথাযোগ্য চিত্রণে তার বিস্তারিত অভিজ্ঞতার বা ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হয় না।……ফাউস্টে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ত আছে, কিন্তু যদি আমার অন্তরে পূর্বে থেকেই জগৎ না থাকতো, তবে চোখ থাকতেও হতাম কানা, সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনই হতো প্রাণহীন নিষ্ফল শ্রম।"

শনিবার—২৮শে ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বল্লেন: "নিম্নশ্রেণী শিল্পীরা অনন্যমনে শিল্প উপভোগ করতে পারে না। রচনার কালে তাদের চোখে শুধু ভাসে তা থেকে যে লাভ হবে, সেই কথা। এমন পার্থিব দৃষ্টি ও প্রবণতা নিয়ে কেউ কখনো বড় কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি।"

মঙ্গলবার—৩০শে মার্চ্চ

গ্যেটে বলেন…"সাধারণত লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্র জনসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তার শিল্প-প্রতিভা তেমন নয়।"…

বুধবার—১৪ই এপ্রিল

বেলা প্রায় একটার সময়ে গ্যেটের সঙ্গে বেরুলাম। বিভিন্ন

লোকের রচনা-রীতি সম্পর্কে কথা উঠ্‌লো। গ্যেটে বল্লেন: "মোটের উপর দার্শনিক প্রবণতা জার্মানদের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে, এর ফলে তাদের রচনা-রীতি হয়ে পড়েছে অস্পষ্ট, কঠিন ও দুর্বোধ্য। বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রতি যাদের যত অনুরাগ তারা লেখে তত বিশ্রী ভাবে। যে সব জার্মান ব্যবসায়ীরূপে অথবা কাজের লোক হিসাবে বাস্তবজীবনের দিকে দৃষ্টি রাখে, তারাই লেখে সব চাইতে ভাল। শিলারের রচনা-রীতি মহৎ ও মর্মস্পর্শী হয়েছে যেখানে তিনি দার্শনিকতা বিসর্জন দিয়েছেন।

জার্মাণ নারীদের অনেকে যথেষ্ট সহৃদয়, তাদের রচনারীতি বাস্তবিকই চমৎকার, অনেক খ্যাতনামা পুরুষলেখকের চাইতে তারা লেখে ভাল।

ইংরেজরা প্রায়ই ভাল লেখে, কেন না তারা স্বভাববাগ্মী ও কাজের লোক—বাস্তবিকতার দিকে তাদের প্রবণতা।

ফরাসীদের রচনারীতি সাধারণত তাদের জাতীয় চরিত্রের অনুযায়ী। তাদের প্রকৃতি সামাজিক, জনসাধারণ তাদের লক্ষ্য, তাদের কখনো তারা ভোলে না; তাদের চেষ্টা সুস্পষ্ট হবার দিকে, যেন পাঠকদের তারা বোঝাতে পারে—প্রিয় হবার দিকে, যেন পাঠককে তারা খুশী করতে পারে।

মোটের উপর লেখকের রচনা-রীতি হচ্ছে তার মনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি; সেজন্য যদি কেউ চায় স্বচ্ছ রচনা-রীতি আয়ত্ত করতে, তবে প্রথমে তার চিন্তা হোক স্বচ্ছ, যদি মহৎ রীতি আয়ত্ত করতে চায় তবে প্রথমে তার আত্মাটি হোক মহৎ।"

এরপর গ্যেটে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কথা তুললেন, বল্লেন, "তাদের বংশ কখনো লোপ পাবে না। এদের এক দল হচ্ছে নির্বোধ …এই বিরাট দল আমাকে জীবনে বহু যন্ত্রণা দিয়েছে; তবু তারা ক্ষমার যোগ্য, কেননা তারা অজ্ঞান।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে ঈর্ষাপরায়ণদের। আমার প্রতিভার বলে যে সৌভাগ্য ও পদগৌরবের অধিকারী আমি হয়েছি, তা তাদের অসহ্য।

আমার আর একদল বিরুদ্ধবাদী হচ্ছে জীবনে যারা বিফল হয়েছে, তারা। এই দলে অনেক শক্তির অধিকারী ব্যক্তি আছে, তাদের যে আমি হীনপ্রভ করেছি, এটি তাদের চোখে ক্ষমার অযোগ্য।

চতুর্থ দল আমার বিপক্ষতা করেছে—বিচারশীল হয়েই। যেহেতু আমি মানুষ, সেজন্তে দোষ-ত্রুটি আমাতে স্বাভাবিক, আমার রচনাও তাই দোষ-ত্রুটি-মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আমার নিরবচ্ছিন্ন প্রযাস ছিল আত্মোন্নতি—মহত্তর জীবন, সেজন্য নিত্য অগ্রগতি আমার লাভ হযেছিল। তাই আমার বিপক্ষ দল অনেক সমযে আমার সেই সব দোষ নিযে ব্যস্ত হযেছে যা আমি অতিক্রম করে এসেছি। এই সাধুসংকল্প ব্যক্তিরা আমার সব চাইতে কম ক্ষতি করতে পেরেছে, কেননা আমার যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করে' এরা নিন্দাবাণ নিক্ষেপ করেছে সেসব থেকে আমি তখন বহু দূরে। যখন আমার কোনো লেখা শেষ হযে যেতো তখন সাধারণত আমি তাতে আর আনন্দ বোধ করতাম না। তার কথা আর ভাবতাম না, তখন ব্যস্ত হতাম নতুন পরিকল্পনা নিযে।

আর একটি বড় দল আমার বিরুদ্ধাচারী হযেছিল, আমার সঙ্গে তাদের মতামত ও রীতিনীতির পার্থক্যের জন্তে। কথায় বলে গাছের দুটো পাতা এক রকমের নয, তেমনি হাজার হাজার লোকের মধ্যে এমন দুজনকেও পাওয়া যাবে না, মতামত ও চিন্তা-ভাবনার দিক দিযে যাদের পুরো মিল। এই যদি সত্য হয, তবে আশ্চর্যের কথা এ নয যে, আমার বিরুদ্ধ দল সংখ্যায এত বেশী, বরং আশ্চর্যের কথা এই যে, আমার বন্ধু ও অনুরাগীর সংখ্যা এত বেশী। আমার প্রবণতা ছিল আমার যুগের বিপরীতপন্থী·· সেই যুগ ছিল একান্ত আত্ম-কেন্দ্রিক, আমার বস্তু-কেন্দ্রিক সাধনায আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব।"

রবিবার, ২রা মে

···আমি বল্লাম, "সামাজিক মেলামেলায় আমার পছন্দ অপছন্দ চেপে রাখি না। আমি খুঁজি সেই প্রকৃতির লোক আমার সঙ্গে যার প্রকৃতির মিল। এমন লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশায আমার আনন্দ, এ ভিন্ন অন্য ধরণের লোকের সঙ্গে কোনো প্রযোজন নেই আমার।"

গ্যেটে বললেন, "তোমার এই স্বাভাবিক প্রবণতা ঠিক সামাজিক নয, যদি এই সব স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা আমাদের না হয, তবে চিৎপ্রকর্ষ আমাদের কোন্ প্রয়োজনে লাগ্‌বে? এ আশা করা এক বড় রকমের নির্বুদ্ধিতা যে অন্য

লোকের সঙ্গে আমাদের পুরো মিল হবে। আমি কখনো এ প্রত্যাশা করিনি, প্রত্যেক লোককে আমি সব সময়ে জ্ঞান করেছি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, চেষ্টা করেছি তাকে বুঝতে, তার সমস্ত বিশেষত্ব সমেত, কিন্তু তার কাছ থেকে বেশী সহানুভূতি আশা করিনি। এইভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আলাপ আলোচনা করতে পেরেছি, আর এই ভাবে জন্মাতে পারে বিচিত্র চরিত্রের বোধ, জীবনযাপনে দক্ষতা। ভিন্ন প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থেকেই মানুষের লাভ হতে পারে জীবনযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য, বিকাশ পায় আমাদের বিচিত্র দিক, আর অচিরে লাভ হয় প্রত্যেক শত্রুর সম্মুখীন হবার যোগ্যতা। তোমাকেও এই করতে হবে; যতটা ভাবতে পারছ তার চাইতে বেশী যোগ্যতা এ বিষয়ে তোমার আছে; বিরাট জগতে তোমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে, তা চাও আর নাই চাও।"

…সন্ধ্যার দিকে গ্যেটে বললেন তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে যেতে। পাহাড়ী পথে আমরা চললাম।…আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অস্তগামী সূর্য। কিছুক্ষণের জন্য গ্যেটে ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন। তারপর তিনি উচ্চারণ করলেন প্রাচীন কবির এই বাণী:

সেই একই সূর্য অস্তগমন কালেও!

তিনি সানন্দে বলে চললেন: "এই পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুর কথা কখনো কখনো মনে আসা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই চিন্তা আমাতে অস্বস্তি আনে না আদৌ; কেননা এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমার অন্তরাত্মা এক অবিনশ্বর-প্রকৃতি-সম্ভূত, তার ক্রিয়া চলে অনন্তকাল থেকে অনন্তকালে। সে সূর্যের মতো, তাকে অস্তগামী হতে আমরা দেখি চর্মচক্ষে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অস্তগমন নেই, চিরদিন বিতরণ করে চলে আলো।"

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ

বৃহস্পতিবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বললেন,…যে কাজ করতে চায় সে পরনিন্দা না করুক, খুৎ ধরতে ব্যস্ত না হোক, বরং ভাল করে' করুক নিজের কাজটি। কেননা বড় ব্যাপার হচ্ছে গঠন, ধ্বংস নয়, সেই গঠনের কাজেই মানুষের অনাবিল আনন্দ।

বুধবার, ২০শে এপ্রিল

গ্যেটে বললেন, সব চাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে নিজের সীমা ও পরিধি নির্দেশ করা।

বুধবার, ১৫ই অক্টোবর

গ্যেটে বললেন, আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যের সমস্ত ক্রটির মূলে হচ্ছে আমাদের পণ্ডিতদের আর লেখকদের চারিত্র-শক্তির ন্যূনতা।

...আমাদের দরকার লেসিঙের মতো লোকের। তাঁর মাহাত্ম্যের মূলে চরিত্র—দৃঢ়তা—এ সব ভিন্ন আর কি? তাঁর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চিত্তোৎকর্ষ অনেকের আছে, কিন্তু কোথায় সেই চরিত্র?

...মাদাম দ্য জেঁলি (genlis) ভলটেয়ারের বেপরোয়া ভাব ও ধর্মনিন্দার বিরুদ্ধে কথা বলে' সঙ্গত কাজই করেছিলেন। ভলটেয়ারের সেই সব উক্তিতে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে কিন্তু সেসব থেকে জগতের কোন উপকার হয়নি, সেসব হয়নি মহৎ কিছুর ভিত্তি। বরং সেসব হয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা লোকেরা হয়েছে বিভ্রান্ত, প্রয়োজনীয় আলম্বন থেকে বঞ্চিত।

মোটের উপর, কতটুকুই-বা আমরা জানি, বুদ্ধি-বিদ্যার সাহায্যে কত দূরই-বা যেতে পারি?

মানুষের জন্ম হয়নি বিশ্বজগতের সমস্যাবলীর রহস্য ভেদ করবার জন্যে, বরং তার কাজ হচ্ছে কোথায় সেই সমস্যার আরম্ভ তা উপলব্ধি করা আর নিজেকে ব্যাপৃত রাখা যা জ্ঞেয় সেই পরিধির মধ্যে।

জগদ্ব্যাপারের পরিমাপ তার সাধ্যায়ত্ত নয়; তার সংকীর্ণ বুদ্ধি-বিচার দিয়ে বিশ্ব-ভুবনের ব্যাখ্যার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। মানুষের বুদ্ধি বিচার আর ঈশ্বরের বুদ্ধি-বিচার দুই পৃথক বস্তু।

..উচ্চতর সত্য আমাদের মুখে আনা উচিত শুধু এই উদ্দেশ্যে যে সে-সবের দ্বারা হবে জগতের উপকার। আর-সব রয়ে যাবে আমাদের অন্তরে, আবৃত সূর্যের মতো সে-সব আমাদের কর্মে ফুটিয়ে তুলবে কোমল দীপ্তি।

রবিবার, ২৫শে ডিসেম্বর

...গ্যেটে বললেন, "আমরা যা কিছু করি তার ফল আছে। কিন্তু যা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত তা থেকে সব সময়ে ভাল ফল ফলে

না ; তেম্‌নি যা অসঙ্গত ও অযুক্তিযুক্ত তা থেকে সব সময়ে মন্দ ফল ফলে না ; বহু সময়ে হয় এর বিপরীত। কিছুকাল পূর্বে পুস্তক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমার নিজের বইগুলো সম্পর্কে এক ভুল করেছিলাম, করে' দুঃখিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন ব্যাপার এমন বদলে গেছে যে তখন সেই ভুল না করলে এখন আমাকে করতে হতো আরো বড় ভুল। এমন ব্যাপার জীবনে বহু সময়েই ঘটে, আর এইজন্যই দেখা যায় সংসার-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কাজ করে যায় বেপরোয়াভাবে, অসীম সাহসে।"

…শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে গ্যেটে বললেন, "শেক্সপীয়র অতি অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিমন্ত। কোনো সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতি বৎসরে তাঁর একটি নাটকের বেশী যেন না পড়ে যদি বিধ্বস্ত হতে না চায়। আমি 'গ্যোৎস' আর 'এগমণ্ট' লিখেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর বাইরন রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান না হয়ে আর নিজের পথে চলে। কত গুণী-জার্মান তাঁর দ্বারা আর কাল্‌ডেরনের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে।

শেক্সপীয়র আমাদের জন্য পরিবেশন করেছেন সোনালি আপেল রূপালি থালায়। সেই রূপালি থালাটি আমরা আয়ত্ত করি তাঁর রচনা পাঠ করে'। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা তাতে পরিবেশন করতে পারি শুধু আলু।

…যদি লর্ড বাইরন তাঁর চরিত্রের সমস্ত বৈপরীত্য পার্লিয়ামেণ্টে কতকগুলো গরম বক্তৃতার দ্বারা প্রকাশ করে' ফেলতে পারতেন তবে কবি হিসাবে আরো অনেক নির্দোষ তিনি হতে পারতেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা দেওয়া ত তাঁর দ্বারা হয়নি, তাই তাঁর জাতির বিরুদ্ধে তাঁর মনের সব ঝাল তাঁকে মনেই রাখতে হয়েছিল, আর কাব্যে ভিন্ন আর কোনো উপায়ে তা থেকে মুক্তি পাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বাইরনের ধ্বংসধর্মী রচনার একটা বড় অংশকে আমি তাই বলি নিরুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টী বক্তৃতা।"…

এরপর সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক জার্মান-কবি প্লাটেন-এর কথা উঠ্‌লো, তাঁর ধ্বংসধর্মী রচনাও গ্যেটে অপছন্দ করলেন। বললেন : "অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাঁতে অনেক চমৎকার গুণ রয়েছে। কিন্তু নেই তাঁতে—প্রেম। নিজেকে তিনি ভালবাসেন না, তাঁর পাঠকদের ও অন্যান্য কবিদেরও নয়।…যতখানি সফল

তাঁর হওয়া উচিত ততখানি সফল তিনি হতে পারবেন না। লোকে তাঁকে ভয় করবে, তিনি তাদেরই প্রিয় হবেন যারা তাঁর মতো ধ্বংসধর্মী হতে চায় অথচ তাঁর মতো প্রতিভা তাদের নেই।"

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ

রবিবার সন্ধ্যা, ২৯শে জানুয়ারী

...রঙ্গমঞ্চ আর আধুনিক দুর্বল, ভাবালু, নৈরাশ্যপূর্ণ নাটকের কথা উঠ্‌লো।

আমি বললাম: বর্তমানে মলিয়ে (Moliere) আমার বল ও ভরসা। তাঁর 'Avare' অনুবাদ করেছি, তাঁর Medecin Malgre Lui এখন আমার হাতে। মলিয়ে বাস্তবিকই একজন উঁচুদরের লোক—খাঁটি লোক।

গ্যেটে বলেন: হাঁ—খাঁটি লোক। ঠিক বলেছ। বিকৃত কিছু তাঁতে নেই। তাঁর কালে তাঁর শাসনে চলতো সামাজিক চালচলন কিন্তু আমাদের কালের ইফ্‌লাণ্ড ও কোৎসেবুয়ে শাসিত হচ্ছেন তাঁদের যুগের দ্বারা, নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাতেই। মলিয়ে মানুষকে শায়েস্তা করতেন যে যেমন তাকে সেই ভাবে এঁকে।

আমি বললাম: তাঁর নাটকগুলো যদি কাটছাঁট না করে' করা যেতো তবে সেজন্যে কিছু খরচ করতেও আমি রাজি। কিন্তু আমার ধারণা, সেই সব অবিকৃত ব্যাপার মানুষের বরদাস্ত হবে না। এই অতিরিক্ত ভব্যতা কতকগুলো তথাকথিত আদর্শবাদী লেখকের রচনার ফল নয় কি?

গ্যেটে বললেন: "না, এর জন্য দায়ী সমাজই। আমাদের অল্পবয়স্কা বালিকাদের থিয়েটারে যাওয়া কেন? তাদের জন্য থিয়েটার নয়, তাদের জন্য ইস্কুল; থিয়েটার বয়স্ক নরনারীর জন্য, মানুষ সম্বন্ধে যাদের কিছু জ্ঞান হয়েছে। মলিয়ের কালে বালিকারা থাকতো ইস্কুলে, তাদের কথা তাঁকে ভাবতে হতো না। কিন্তু এখন এই বালিকাদের এড়াবার যো নেই, কাজেই যে-সব লেখা দুর্বল, আর সেই জন্যই পছন্দসই, তৈরী হয় তাই।

আজকাল কাব্য-চর্চা জার্মানীতে এমন ব্যাপক হয়েছে যে, কারুর আর ছন্দে ভুল হয় না। তরুণ কবিরা তাদের যে-সব লেখা আমাকে পাঠায় সে-সব তাদের পূর্ববর্তীদের চাইতে খারাপ নয়, কিন্তু তারা ভেবে পায় না কেন পূর্ববর্তীদের এত প্রশংসা করা হয় আর তাদের

প্রশংসা করা হয় না। কিন্তু বাস্তবিকই এই সব তরুণকে উৎসাহ দেওয়া যায় না। কারণ একই ধরণের যোগ্যতার ভিড় জমে গেছে, প্রয়োজনীয় বহু কিছু যখন করবার আছে তখন অনাবশ্যক আর প্রশ্রয় পেতে পারে না। যদি এদের মধ্যে একজনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো সবার উপরে তবেই হতো ভাল, কেননা জগতের কাজ হতে পারে কেবল অসাধারণদের দ্বারাই।"

বুধবার, ১৩ই ডিসেম্বর

খাবার টেবিলে মহিলারা এক তরুণ শিল্পীর চিত্রের প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, "সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনি সব শিখেছেন নিজের চেষ্টায়।" হাতগুলো ভাল আঁকা হয়নি, তাই থেকে বোঝা যাচ্ছিল এই ব্যাপারটি। গ্যেটে বললেন, "এই তরুণ শিল্পীর প্রতিভা আছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইনি যে কারো কাছে শেখেন নি এজন্য প্রশংসার নয় নিন্দারই যোগ্য। যে শক্তি নিয়ে জন্মেছে তার কাজ নয় নিজে নিজে শিখতে চেষ্টা করা, তার কাজ হচ্ছে শিল্প-চর্চা করা, আর সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া, সেই গুরুরা তাকে একটা কিছু করে তুলতে পারবেন।"...

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ

বুধবার, ৩১শে জানুয়ারী

গ্যেটে বললেন: কবির জানা চাই কি প্রভাব তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান, তাঁর 'চরিত্র'দের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবেন তিনি সেই ভাবে। যদি ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরাবৃত্তি কবির একমাত্র কাজ হতো, তবে কবিদের কি প্রয়োজন? সোফোক্লেসের অঙ্কিত সমস্ত চরিত্রে রয়েছে তাঁর মহান আত্মার স্পর্শ। শেকস্‌পীয়রের চরিত্র-গুলোও তেমনি। হওয়াও চাই তাই। এমন কি, শেক্‌স্‌পীয়র আরো এক ডিগ্রি এগিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর রোমানদের করেছেন ইংরেজ, এও খুব সঙ্গত কাজ তিনি করেছেন; নইলে তাঁর জাতি তাঁকে বুঝতে পারতো না।

* বুধবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী

...গ্যেটে বললেন: "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একান্ত প্রয়োজন খাল কেটে মেক্‌সিকো উপসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগর এই দুয়ের সংযোগ সাধন। আমি নিঃসন্দেহ যে, এটি তারা করবে।

আমি যদি দেখে যেতে পারতাম! কিন্তু তা পারবো না। আর একটী ব্যাপারও দেখতে চাই, সেটি হচ্ছে দানিউব ও রাইন এই দুই নদীর যোগ সাধন। কিন্তু এ এমন বিরাট কাজ যে, এ যে শেষ হবে তা ভরসা হয় না, বিশেষ করে' আমাদের জার্মানদের সঙ্গতির কথা যখন ভেবে দেখি। আর তৃতীয় ও শেষ ব্যাপারটি হচ্ছে ইংলণ্ডের জন্য সুয়েজ যোজকের মধ্যে দিয়ে একটি খাল। যদি এই তিন বিরাট কাজ দেখে যেতে পারতাম! এর জন্য আরো পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে থাকার কষ্টও স্বীকার্য।

বুধবার, ২৮শে মার্চ্চ

…গ্যেটে বল্লেন: "স্বীকার করতে হবে যে, শ্লেগেলের জানাশোনা ঢের, তাঁর অসাধারণ গুণপনা ও পড়াশুনা দেখে ভীত হতে হয়। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। জগৎজোড়া পাণ্ডিত্য থাকলেও বিচার-ক্ষমতা না থাকতে পারে। শ্লেগেলের সমালোচনা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী, তার কারণ নাটকে তিনি দেখেন শুধু প্লট ও সাজাবার কৌশল আর পরবর্তীদের সঙ্গে (আলোচ্য) লেখকের ছোটখাটো মিল, সেই লেখক জীবনের মাধুর্য্য ও মহৎ চিত্তের প্রভাব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। কিন্তু প্রতিভার সমস্ত কলানৈপুণ্যের কি মূল্য যদি নাটকে আমরা না পাই লেখকের মধুর অথবা মহৎ ব্যক্তিত্ব? জনসাধারণের চিত্তের উৎকর্ষ ঘটে এরই গুণে।…শ্লেগেলের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব মহৎদের প্রকৃতি বুঝবার ও সমাদর করবার অযোগ্য।"

বুধবার, ১৮ই এপ্রিল

…গ্যেটে বল্লেন: সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের চেষ্টা দেখে না হেসে পারি না, তাদের কৃচ্ছ্রসাধনা হচ্ছে যে বর্ণনাতীত ব্যাপারকে সৌন্দর্য নাম দেওয়া হয়েছে কতকগুলো সাধারণ শব্দের দ্বারা তারই সংজ্ঞা নির্দেশ করা। সৌন্দর্য এক আদি ব্যাপার, তা রূপ ধরে কখনো আমাদের সামনে আসে না, সৃষ্টিধর্মী চিত্তের বাণীতে নানা ভঙ্গিতে আমরা পাই তার আভাস, প্রকৃতির মতোই তা বিচিত্র।…

…প্রকৃতির সব রূপ যে সুন্দর তা নয়। তার উদ্দেশ্য অবশ্য সব সময়েই ভাল; কিন্তু যে পরিবেশে সে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা সব সময়ে ভাল থাকে না। যেমন ওক গাছ দেখতে খুব ভাল হতে পারে কিন্তু কত অনুকূল ঘটনার একত্র

সমাবেশের ফলে প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে একটি যথার্থ সুন্দর ওক গাছ! বনের ভিতরে বড় বড় গাছের পাশে যে ওকের জন্ম হয়েছে তার প্রবণতা হবে শুধু আকাশের দিকে বেড়ে ওঠা··· তাতে জন্মাবে সরু সরু ডাল। যদি তার জন্ম হয় ভিজা বেশী-রসাল মাটীতে তবে অকালেই তাতে জন্মাবে বহু ডালপালা, হবে না তেমন শক্ত সমর্থ...। যদি তার জন্ম হয় পর্বতের গায়ে পাথুরে মাটিতে হবে তাতে বহু গিঁঠ, ব্যাহত হবে তার বাড়। বালু মাটি হচ্ছে ওকের জন্য সব চাইতে ভাল, তাতে সব দিকে প্রবিষ্ট হতে পারে তার জোরালো শিকড়; তারপর চাই ভাল অবস্থিতি যেখানে সব দিক থেকে তা পাবে আলো, রোদ, বৃষ্টি, বাতাস। যদি ঝড়-বাদলের সঙ্গে সংগ্রাম না করবার মতো অবস্থিতি তার হয় তবে হবে না তা কিছুই; এক শ বছর ধরে ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংগ্রাম করে হয় তা সবল ও শক্তিমান, তখন সেই পূর্ণপরিণত ওক দেখে আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হই।"

বৃহস্পতিবার, ৩রা মে

···গ্যেটে বললেন: আমরা জার্মানরা মাত্র সেদিনকার লোক। আমরা যথার্থভাবে সভ্যরুচির হযেছি একশ' বছর হলো; আরো কযেক শতাব্দী গত হওযা চাই, তবে আমাদের সর্বসাধারণের মন ও রুচি এতখানি উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে যে তারা সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে গ্রীকদের মতো, সুন্দর গান তাদের অন্তরে জাগাবে প্রেরণা, আর তখন তাদের সম্বন্ধে বলা চলবে—এদের অসভ্য দশা গত হয়েছে অনেক দিন পূর্বে।"

রবিবার, ৬ই মে

···গ্যেটে বললেন: "মোটের উপর বলতে পারি কবিরূপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি কোনো তত্ত্বকথাকে (abstraction) রূপ দিতে। আমার মনে জাগতো ছবি—অনুভব-গম্য, জীবন্ত, আনন্দপ্রদ, বিচিত্র মূর্তির ও বিচিত্র প্রকৃতির ছবি—আমার সবল কল্পনার গুণে ঘটতো এ সব—আর কবি হিসাবে আমার কাজ হতো মনে মনে সেই সব অনুভূতি ও ছবি পূর্ণাঙ্গ করে' তোলা, আর তারপর সে-সব পরিচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা যেন আমার লেখা পড়ে বা শুনে অপরের মনেও জাগতে পারে তেমন-সব ছবি।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ

মঙ্গলবার, ১১ই মার্চ

…গ্যেটে বললেন: "শুধু কাব্য নাটক রচনাতেই যে সৃজনী-শক্তি প্রকাশ পায় তা নয়, কর্মেও এক ধরণের সৃজনী-শক্তি প্রকাশ পায়, সে-সব অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর মর্যাদার।"

আমি বললাম: প্রতিভার এই সৃজনী-শক্তি শুধু মনের ব্যাপার, না দেহেরও ব্যাপার?

গ্যেটে বললেন: দেহের প্রভাব এর উপরে সব চাইতে বেশী; এক সময়ে জার্মানীতে প্রতিভা বলতে বোঝা হতো খর্ব দুর্বল ন্যুব্জকে। কিন্তু আমি চাই সুঠামদেহ প্রতিভা।

নেপোলিয়নকে বলা হতো পাথরের তৈরী, সেই পাথরের উপাদান বিশেষভাবে ছিল তাঁর দেহে।……সিরিয়ার আগুনঢালা মরুভূমি থেকে মস্কোর তুষার-প্রান্তর পর্যন্ত কত অভিযান, কত রণ, কত শিবিরহীন নিশাযাপন তাঁকে করতে হয়েছে!…সামান্য নিদ্রা, সামান্য আহার, কিন্তু সর্বদা পরিচয় দিচ্ছেন প্রখরতম মানসশক্তির।…বড় কিছু করবার জন্য যৌবনের তেজ চাই-ই!

…আমি যদি রাজ্যের কর্তা হতাম, তবে বংশমর্যাদার গুণে আর বেশী দিন চাকরি করে যারা উপরের পদে উঠেছে বড় বড় পদে তাদের দিতাম না কখনো; বুড়োকালে চিরদিনের অভ্যাসমতো তারা চলে ধীরে সুস্থে, এই পদ্ধতিতে প্রতিভা-বিকাশ সম্ভবপরও নয়। আমি বরং এসব পদ দিতাম যুবকদের—অবশ্য যাদের রীতিমতো যোগ্যতা আছে, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি আর কর্মশক্তি আছে, আর আছে সাধু সংকল্প এবং মহৎ চরিত্র। তাহলে আনন্দের হতো রাজ্য শাসন আর জাতির উৎকর্ষ বিধান।"…

…আমি কয়েকজন উচ্চপদস্থ জার্মানের নাম করে বললাম—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁদের কর্ম-শক্তির পরিচয় পর্যাপ্ত।…

গ্যেটে বলেন: এসব লোক স্বাভাবিক প্রতিভা, এঁদের কথা স্বতন্ত্র, এঁরা নতুন করে অনুভব করেন যৌবন, সাধারণে যৌবন আসে মাত্র একবার।

শ্রেষ্ঠ সৃজনী-শক্তি, অসাধারণ আবিষ্কার, ফলপ্রসূ মহৎ চিন্তা, এসব মানুষের ক্ষমতায়ত্ত নয়, সমস্ত পার্থিব ক্ষমতার উর্ধ্বে এসবের স্থান। এসব মানুষকে জ্ঞান করা চাই উর্ধ্বের অপ্রত্যাশিত দান,

ভগবানের অনাবিল সন্ততি—মানুষের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সামগ্রী। এসব 'দানো'র মতো, মানুষের জীবনে যা খুশী তাই করে, মানুষ এর কাছে আত্মসমর্পণ করে অজানিত ভাবে, যদিও এবিশ্বাস তাদের লোপ পায় না যে কাজ করে' চলেছে তারা নিজেদের প্রেরণাযই। এসব ক্ষেত্রে মানুষকে কখনো কখনো জ্ঞান করা যেতে পারে জ্ঞান-অগোচর বিশ্ব-শাসনের যন্ত্র—ঐশ্বরিক প্রভাব-ধারণক্ষম আধার। একথা বলছি এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে' যে, কত সময়ে একটিমাত্র চিন্তা কয়েক শতাব্দীকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র রূপ, বিশেষ বিশেষ মানুষের আত্মপ্রকাশ তাঁদের যুগের উপরে এমন ছাপ রেখে গেছে যা মুছবার নয়, পরবর্তী যুগ-সমূহের উপরেও সে-সব বিস্তার করে চলেছে মঙ্গলময় প্রভাব।"

বুধবার, ১২ই মার্চ

…গ্যেটে বললেন: "অন্যান্য অনেক জাতির সঙ্গে তুলনায় ইংরেজদের মনে হয় উন্নততর, তা তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, মাটির গুণ, স্বাধীন শাসন-পদ্ধতি, স্বাস্থ্যপ্রদ শিক্ষাব্যবস্থা, যে-জন্যেই হোক। এই ভাইমারে আমরা অল্প ইংরেজই দেখি, আর তারাও হযত উৎকৃষ্ট ইংরেজ নয; কিন্তু কত চমৎকার, কত সুদর্শন তারা। বয়স যত অল্পই হোক এই বিদেশে তারা কোনো রকমে নিজেদের বিপন্ন বোধ করে না, বরং সামাজিক মেলামেশায় তাদের ব্যবহার এমন সপ্রতিভ এমন সচ্ছন্দ যেন তারাই কর্তা, সমস্ত জগৎ তাদের। আমাদের নারীরা তাদের প্রতি প্রসন্ন এই কারণে।"

আমি বললাম: 'আমার ত মনে হয় না যে-সব ইংরেজ যুবক আমরা ভাইমারে দেখি তারা অপরের সঙ্গে তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান বা বেশী চালাক, অথবা বেশী জানেশোনে, কিংবা অন্তরের দিক দিয়ে বেশী ভাল।'

গ্যেটে বললেন: "এসব গুণে নয, বংশ-মর্যাদায বা ধন-সম্পদের জন্যেও নয, এদের বড় গুণ হচ্ছে এই যে, স্বভাব এদের যেমন করে' গড়েছে তাই হবার সাহস এদের আছে। কোনো বিকৃতি বা বাড়াবাড়ি তাদের মধ্যে নেই, লুকোছাপি অথবা প্যাঁচফের নেই; তারা যে যা তাই পুরোপুরি। কখনো কখনো তারা যে পুরোপুরি নির্বোধ তা স্বীকার করছি অকপটে; কিন্তু এও অর্থপূর্ণ, প্রকৃতির পাল্লায এরও ওজন আছে।

প্রায় প্রত্যহ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে বাইরের লোক। কিন্তু যদি বলি, উত্তরাঞ্চল থেকে যে সব কৃতবিদ্য যুবক-জার্মান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের দেখে আমি খুশী হই, তবে মিথ্যা কথা বলা হবে।

চোখে দেখে কম, ফ্যাকাসে, বুক-মরা, যুবক কিন্তু যৌবন নেই —এই তাদের অনেকের চেহারা। যদি আলাপ করতে যাই তবে বুঝতে দেরী হয় না যাতে তোমার আমার আনন্দ তা তাদের কাছে তুচ্ছ, অর্থহীন, তাদের সমস্ত দৃষ্টি idea-র—তত্ত্বের—পানে, আর সেই তত্ত্বও হওয়া চাই খুব দুরূহ। সুস্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে আনন্দ, এসবের চিহ্ন মাত্র নেই, যৌবনসুলভ সমস্ত অনুভূতি সমস্ত সুখ নিয়েছে চিরবিদায়; বিশ বৎসর বয়সে যে যুবক নয় চল্লিশ বৎসর বয়সে তার যৌবন কেমন করে থাকবে?"

গ্যেটে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে নীরব হয়ে রইলেন।

…আমি বল্লাম: "এই গুরুগম্ভীর ভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে, এর নিদারুণতা থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় ত্রাণকর্তার প্রয়োজন।"

গ্যেটে উত্তর দিলেন: "তিনি এলে পুনর্বার তাঁকে চড়ানো হবে ক্রুশে। কিন্তু এত বড় ব্যাপারের প্রয়োজন নেই। যদি জার্মানদের আমরা গড়তে পারতাম ইংরেজদের ধরণে, আমাদের দার্শনিকতা যেত কমে, বাড়তো কর্মশক্তি, তত্ত্ব হতো কম, বেশী হতো কাজ, তবে অনেকখানি পরিত্রাণ আমাদের লাভ হতো—দ্বিতীয় খৃষ্টের ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা না করেও।

নীচের দিক থেকে স্কুল আর পারিবারিক শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণ অনেক কাজ করতে পারেন আর উপরের দিক থেকে অনেক কাজ করতে পারেন দেশের শাসনকর্তারা আর তাঁদের মন্ত্রদাতারা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, ভবিষ্যৎ-দেশশাসকদের জন্য যত বেশী পুস্তকগত জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তা আমার অপছন্দ, এর ফলে তরুণদের দেহ ও মন দুইই নষ্ট হয় অকালে। কর্মক্ষেত্রে যখন তারা প্রবেশ করে তখন অবশ্য দার্শনিক ও অন্যান্য পুঁথিগত বিদ্যা তাদের লাভ হয়েছে, কিন্তু তাদের সংকীর্ণ-পরিসর জীবনে সে-সবের প্রয়োগের সুযোগ কোথায়? অনাবশ্যক বোধে সে-সব ভুলে যেতে

তারা বাধ্য। অথচ যাতে তাদের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তাই ফেলেছে তারা হারিয়ে, ঘাটতি পড়েছে তাদের মনের ও দেহের বীর্যে— কর্মজীবনে যা নইলে নয়।

তা'ছাড়া মানুষের শাসনভার যাদের হাতে তাদের জন্য চাই প্রেম ও উদারতা, কিন্তু যে নিজে অসচ্ছন্দ প্রকৃতির সে কেমন করে অপরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হবে, উদার ব্যবহার করবে ?"

…গ্যেটে হাসিমুখে বল্লেন : তা আপাতত এই আশা পোষণ করা যাক যে, এক শ বছর পরে আমাদের জার্মান জাতির উন্নতি হবে, দেখা যাক তখন আমরা এতটা অগ্রসর হতে পারি কি না যে, পণ্ডিত ও দার্শনিক না হয়ে আমরা হব মানুষ।"

* শুক্রবার, ১৬ই মে

গ্যেটের সঙ্গে গাড়ীতে বেরুলাম। তিনি খুশী মনে স্মরণ করলেন কোৎসেবুয়ে-দলের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া-বিবাদের কথা, আর কতকগুলো ভারি সরস ছোট কবিতা আবৃত্তি করলেন, যে সবে ঠাট্টা তামাসা করা হয়েছে বেশী, আঘাত তেমন নেই। আমি জানতে চাইলাম এগুলো তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি কেন।

গ্যেটে বল্লেন : এমন ছোট ছোট বহু কবিতা আমার আছে। কিন্তু এসব রাখি লুকিয়ে, খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরই কখনো কখনো শোনাই। আমার বিরোধীদলের বিরুদ্ধে এই ছিল আমার একমাত্র নির্দোষ অস্ত্র। তাদের হীন আঘাতের ফলে তাদের প্রতি আর জনসাধারণের প্রতি মনে যে দারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হতে চাইতো এই উপায়ে নীরবে সে-সব থেকে পেতাম মুক্তি, মন হতো নির্বিষ এই সব কবিতা দিয়ে তাই আমার নিজের খুব উপকার হয়েছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বাদ-বিসম্বাদ নিয়ে জনসাধারণ বিব্রত হোক এ আমি চাই না, জীবিত কারো ক্ষতিও করতে চাই না। [illegible]রে এ সবের কিছু কিছু অবশ্যই বার করা যাবে।

রবিবার, ১৫ই জুন

…দূরের কামরা থেকে গানের সুর আসছিল।…এই বিশেষ সুরটি আমরা তরুণ-তরুণীরা খুব উপভোগ করছিলাম। …গ্যেটে আমাদের মতো খুশী হতে পারছিলেন না। তিনি বল্লেন : চেরী আর স্ট্রবেরির স্বাদ কেমন তা জানতে হবে খোকাখুকুদের আর পাখীদের কাছ থেকে।

…গ্যেটের পুত্রকে বাইরে ডেকে নেওয়া হলো। তিনি ফিরে এসে গান বন্ধ করে দিলেন। তাঁর পিতাকে বল্লেন: আমাদের বন্ধুদের আজ সকালেই থিয়েটারে যেতে হবে।

গ্যেটের পুত্র অতিথিদের বিদায় দিয়ে দিলেন—তাঁর পিতাকে তিনি দিতে চাচ্ছিলেন ডিউকের সদ্য মৃত্যু সংবাদ। গ্যেটে পুত্রের আচরণ বুঝতে না পেরে বিরক্ত হচ্ছিলেন।…

* * * *

একটু রাত হলে আমি গ্যেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কামরায় ঢুকবার পূর্বেই কানে এলো তাঁর দীর্ঘশ্বাস, নিজে নিজে জোরে জোরে কি তিনি বলছিলেন, তিনি যেন অনুভব করছিলেন তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে এক গভীর ফাঁকা, সে ফাঁকা আর ভরবে না। কোনো সান্ত্বনার কথা তিনি কানে তুলছিলেন না, সব করছিলেন প্রত্যাখ্যান।

তিনি বল্লেন: 'ভেবেছিলাম আমি যাব তাঁর আগে, কিন্তু ঘটে বিধাতার যা ইচ্ছা তাই। হতভাগ্য মানুষদের যেতে হবে সব সহ্য করে' আর নিজেদের রাখতে হবে খাড়া যতদিন পারা যায়।"

মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর

…শেষে কথা উঠ্‌লো সব মানুষ এক দম্পতি আদম-হাওয়ার সন্তান কি না। ফন মার্টিয়াস বাইবেলের বিবরণ সমর্থন করলেন, কেন না প্রকৃতিকে দেখা যায় সৃষ্টি-ক্রিয়ায় খুব হিসাবী।

গ্যেটে বল্লেন: "এ মানতে পারি না। আমরা দেখি প্রকৃতি বরং বেহিসাবী, এমন কি অপব্যয়ী; তাকে বেশী ভাল বোঝা যাবে যদি এই কথা মানা যায় যে এক দম্পতি থেকে নয়—হাজার হাজার দম্পতি থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবী যখন অপেক্ষাকৃত কঠিন হলো, জল গেল সরে, শুকনো ডাঙা ভরে উঠ্‌লো সবুজ গাছপালায়, তখন এল মানুষ সৃষ্টির কাল আর ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা বলে মানুষের জন্ম হলো যেখানেই পৃথিবীর অবস্থা হলো তার অনুকূল—সম্ভবত প্রথমে পাহাড়ী অঞ্চলে।

এহেন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বিশ্বাস আমার কাছে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু কেমন করে' ঘটলো এটি সে সম্বন্ধে মীমাংসা করতে চেষ্টা করা অর্থহীন শ্রম, যাদের আর কিছু করবার নেই তারা এই নিয়ে মাথা ঘামাক।"

শনিবার, ১১ই অক্টোবর

...আমি বল্লাম: কালাহল বাস্তবিকই 'মাইস্টার' পড়েছেন, আর এর মর্মের সঙ্গে এমন পরিচিত হয়েছেন বলেই তাঁর ইচ্ছা গেছে এর প্রচারের দিকে, চাচ্ছেন, প্রত্যেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ থেকে তেম্নি উপকার ও আনন্দ লাভ করুক।

গ্যেটে আমাকে জানালার পাশে গিয়ে বল্লেন: "তরুণ বন্ধু, তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি, তাতে তোমার কাজ হবে ঢের। আমার লেখা জনপ্রিয় হতে পারে না। যে ভাবে তা জনপ্রিয় হবে আর সেজন্যে চেষ্টা করে সে ভুল করে। আমার লেখা সর্বসাধারণের জন্যে নয়, আমার লেখা শুধু সেই সব ব্যক্তির জন্যে যারা নিজেদের মনের মতো কিছু চায়, আমার লক্ষ্যের সঙ্গে তাদের লক্ষ্যের মিল রয়েছে।"

* শুক্রবার, ১৭ই অক্টোবর

গ্যেটে বল্লেন: 'মৃত অতীতের যত সব রীতিনীতি কায়দা কানুন দিয়ে কি হবে? ক্লাসিক্যাল আর রোমান্টিক নিয়ে এত সোরগোলেরই বা প্রয়োজন কি। প্রত্যেক লেখা হওয়া চাই পুরোপুরি ভাল, তবে তা ক্লাসিক্যাল হবেই।

সোমবার, ২০শে অক্টোবর

.. আমি বল্লাম, একটু পূর্বে মহাশয় এই অতি মনোরম মন্তব্য করেছেন যে, গ্রীকরা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল আপন মাহাত্ম্য নিয়ে, আমার মনে হয় এ' এক অতি গভীর কথা।

গ্যেটে বল্লেন: হা, সব কিছু নির্ভর করছে এরই উপরে: কিছু হতে হবে তোমাকে যদি কিছু করতে চাও। দান্তে আমাদের চোখে বড়, কিন্তু তাঁর পেছনে রয়েছে কত শত বৎসরের সংস্কৃতি। রথচাইল্ড পরিবার ধনী, কিন্তু সে-সম্পদ আহরণ এক পুরুষে হয়নি। এসব চিন্তা ভাবনার চেয়ে গূঢ়তর। আমাদের যে-সব শিল্পী অনুকরণ করে চলেছে প্রাচীন জার্মান রীতি তারা বোঝে না এসব কিছুই, প্রকৃতির অনুকরণ করছে তারা ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও অযোগ্যতা নিয়ে, ভাবছে বড়-কিছু করছে। তারা দাঁড়িয়ে প্রকৃতির নীচে। কিন্তু যে বড় কিছু করতে চায় তাকে নিজের চিৎপ্রকর্ষ এতখানি উন্নত করতে হবে যে গ্রীকদের মতো প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাথার্থ্যকে সে উন্নীত করতে পারবে আপন চিত্তের স্তরে, সুসম্পন্ন করবে তাকে ভিতরের দুর্বলতা অথবা বাইরের বাধার ফলে প্রকৃতিতে যা রয়ে গেছে অভিলাষ মাত্র।

বুধবার, ২২শে অক্টোবর

আজ খাবার সময়ে মেয়েদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, গ্যেটে চমৎকার মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন: "মেয়েরা হচ্ছে রূপালি থালা তাতে আমরা সাজাই সোনালি আপেল। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বাস্তব-জীবনে যেমন দেখা যায় তাই থেকে সিদ্ধান্ত নয়, ওসব আমার সহজাত, অথবা সৃষ্টি হয়েছে আমার মধ্যে, কেমন করে তা ভগবান জানেন। সেজন্যে আমি যেসব নারী-চরিত্র এঁকেছি সবই ভাল হয়েছে। বাস্তবের চাইতে আরো ভাল সেসব।"

বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর

গ্যেটে বললেন: "আমরা যত শীগগিব আশা করছি তত শীগগির জগৎ তার উচ্চ লক্ষ্যে পৌছবে না। পিছিয়ে দেবার দানবরা প্রতি পদে সক্রিয় রয়েছে, ফলে উন্নতি মোটের উপর হয়, কিন্তু বড় ধীরে। আরো বয়স হোক তখন বুঝবে যা বলছি তা সত্য।

মানুষ আরো সচেতন আরো কুশাগ্র-বুদ্ধি হবে, কিন্তু বাড়বে না তাদের মহত্ত্ব, সুখ, কর্মদক্ষতা, যদিও বাড়ে তবে বিশেষ বিশেষ যুগে। এমন কালের কথা ভাবতে পারি যখন ঈশ্বর মানুষে আর কোনো আনন্দ পাবেন না। তখন সব ভেঙেচুরে তিনি গড়বেন নতুন করে।···অবশ্য তার বহু দেরী আছে, আরো হাজার হাজার বছর ধরে এই পরিচিত পৃথিবীর বুকে আমাদের বহু সুখ-সম্ভোগে কাটতে পারবে।"

···এরপর পুনরায় ডিউক কার্ল আউগুসট সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো। গ্যেটে বললেন: "রাজ্য-শাসনের বিশেষ উপযোগী তিনটি গুণ ডিউকে ছিল। প্রথমত তিনি বাছাই করতে পারতেন কে মস্তিষ্কশক্তির অধিকারী আর কে চারিত্র-শক্তির অধিকারী, আর প্রত্যেককে দিতেন তার যোগ্য ক্ষেত্র।···দ্বিতীয়ত, তাঁর অন্তরে ছিল সুমহৎ ঔদার্য, অতি নির্মল পরহিতৈষণা··তিনি সব সময়ে প্রথমে ভাবতেন তাঁর দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আর সব শেষে অতি সামান্যভাবে ভাবতেন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা।··তৃতীয়ত, চারপাশের পারিষদদের চাইতে তিনি ছিলেন বড়: দশজনের কথা শুনবার পরে তিনি শুনতেন আর একটি মুখের কথা, সেই কথা আরো মূল্যবান, সেই কথা তাঁর নিজের অন্তরের কথা।

তিনি পছন্দ করতেন যা অমসৃণ আর অস্বস্তিকর, আরাম-আয়েসের তিনি ছিলেন শত্রু।"

আমি বললাম: আপনার 'ইল্‌মেনাউ' কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে।...

গ্যেটে বললেন: "তখন তাঁর বয়স খুব অল্প, আমাদের দিন কাটতো প্রায় পাগলের মতো। তিনি ছিলেন উঁচুদরের টাটকা মদের মতো—গেঁজানির কাল তখনো শেষ হয়নি। তাঁর শক্তি কিসে খাটাবেন তা ভেবে পেতেন না, বহুবার প্রাণসংশয়কর বিপদের সম্মুখীন আমরা হয়েছি। সমস্ত দিন চালিয়েছি ঘোড়া নালা ও বেড়াব উপর দিয়ে, নদীর মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে, আর শেষে রাত কাটিয়েছি মাঠে তাঁবু খাটিয়ে, পাশের জঙ্গলে জ্বলছে আগুন।—এই ছিল তাঁর প্রিয়। তিনি যে পূর্বপুরুষ থেকে একটি ছোটখাটো রাজ্য পেয়েছিলেন এটি তাঁর জন্য ছিল অকিঞ্চিৎকর; তিনি খুশী হতেন যদি তেমন রাজ্য নিজে জয় করে নিতে পারতেন।"

...আমি বললাম: তাঁর বেখেয়াল শাদামাটা বাইরের দিকটা দেখে মনে হতো খ্যাতি প্রতিপত্তি তিনি চান না, তার মূল্য তাঁর কাছে নেই। মনে হয়, তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন চেষ্টা না করে, কেবলমাত্র তাঁর অনাড়ম্বর গুণগ্রামের জন্যে।

গ্যেটে বললেন: এরই মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থ। কাঠে আগুন ধরে, কেন না তার যোগ্য উপাদান তাতে রয়েছে। খ্যাতি চাইবার জিনিষ নয়, সে চেষ্টা বৃথা। কেউ কেউ নিপুণ চালচলন ও নানা কৃত্রিম উপায়ে এক ধরণের খ্যাতি লাভ করতে পারে। কিন্তু ভিতরকার বস্তু যদি না থাকে তবে সব চেষ্টা বৃথা, টিকবে না সে-খ্যাতি একদিনও।"

এরপর জার্মানীর একতাবদ্ধ হওয়ার কথা উঠ্‌লো।

গ্যেটে বললেন: জার্মানীর এই একতাবদ্ধ হওয়ার কথায় আমি ভয় পাইনা। আমাদের বড় বড় রাস্তা আর ভবিষ্যতের রেলপথ বিস্তার করে যাবে তাদের প্রভাব। তবে সকলের উপরে জার্মানী মিলুক প্রেমে। জার্মানী সব সময়ে এক হোক শত্রুর বিরুদ্ধে। এক হোক যেন জার্মান ডলার আর গ্রোশেন সাম্রাজ্যের সর্বত্র একমূল্যের হতে পারে। এক হোক যেন আমার

সঙ্গের বেড়াবার বাক্স এই ছত্রিশ রাজ্য ঘুরে আসতে পারে না-খোলা অবস্থায়।

এক হোক পাল্লা-পাথরে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, এবং এরকম আরো শত শত ব্যাপারে·! কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে জার্মানীর এক হওয়ার অর্থ এই যে প্রত্যেক বড় সাম্রাজ্যের একটি মাত্র বৃহৎ রাজধানী থাকবে, আর সেই একটিমাত্র বৃহৎ রাজধানী প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করবে, জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করবে, তবে আমরা ভুল করবো।

ফ্রাঙ্কফোর্ট, ব্রেমেন, হামবুর্গ ও ল্যুবেক বড় ও সুন্দর; জার্মানীর সমৃদ্ধির উপরে তাদের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু তারা যদি স্বাধিকার হারিয়ে কোনো বড় জার্মান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক নগরে পর্যবসিত হয় তবে কি তাদের এই গৌরব থাকবে? আমি সন্দেহের হেতু দেখতে পাচ্ছি।"

মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর

···গ্যেটে বললেন: "আমরা অবশ্য শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি; কিন্তু আমাদের বিকাশের সহায়তা করে এই প্রকাণ্ড জগতের বহুবিধ প্রভাব, সে-সব থেকে আমরা আত্মস্থ করি যতটা পারি ও যতটা আমাদের উপযোগী। আমি গ্রীক ও ফরাসীদের কাছে বহু ঋণী, শেকসপীয়র, স্টার্ণ ও গোল্ডস্মিথের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই; কিন্তু এই কথায় আমার চিৎপ্রকর্ষের বিচিত্র উৎসের পরিচয় দেওয়া হয় না; তার শেষ নেই, আবশ্যকও নেই। আসল ব্যাপারটি হচ্ছে—চাই এমন অন্তর সত্য যার প্রিয়, সেই সত্যকে সে গ্রহণ করে যেখানে পায়।

সত্য প্রচার করতে হবে বারবার, কেননা মিথ্যা বারবার প্রচারিত হচ্ছে শুধু ব্যক্তির দ্বারা নয় জনসঙ্ঘের দ্বারাও। সাময়িক পত্রে, বিশ্বকোষে, ইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র মিথ্যা আছে ছড়িয়ে, আরামে আছে এই বোধে যে পাল্লা তার দিকেই ভারী।"

গ্যেটে জিজ্ঞাসা করলেন ফরাসী সাহিত্য আমি কেমন পড়ছি। আমি বললাম, মাঝে মাঝে ভলটেয়ার দেখছি, তাঁর অসাধারণ শক্তি দেখে গভীর আনন্দ পাই।···

গ্যেটে বললেন: ভলটেয়ারের মতো উঁচুদরের প্রতিভা যা লেখেন তাই হবে ভাল, কিন্তু তাঁর ধর্মদ্রোহ আমি ক্ষমা করতে পারি না।

এরপর বাইরন সম্বন্ধে কথা উঠল। আমি বললাম বাইরন সম্বন্ধে মহাশয়ের যা অভিমত তা আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নি, কিন্তু এই কবি প্রতিভাবান হিসাবে যত বড়ই হোন আমার খুব সন্দেহ আছে তাঁর লেখা থেকে বিশুদ্ধ মানবীয় প্রকর্ষের কোনো সত্যকার উপকার হবে কি না।

গ্যেটে বললেন: "তোমার কথার প্রতিবাদ করতে হচ্ছে; বাইরনের দুঃসাহস ও বিরাটত্ব নিঃসন্দেহে চিৎপ্রকর্ষের অভিমুখী। এই চিৎপ্রকর্ষের সন্ধান আমরা যেন যা বিশুদ্ধ ও সুনীতিপূর্ণ সর্বদা শুধু তার মধ্যেই না করি। যা-কিছু বিরাট তা চিৎপ্রকর্ষের অনুকূল হয় যখনই আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারি।*

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ
বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বললেন: "খৃষ্টান ধর্মের নিজস্ব শক্তি আছে, সেই শক্তির গুণে ভগ্নচিত্ত পীড়িত মানুষ সময় সময় উন্নীত হয় মহত্তর জীবনে, ধর্মের এই শক্তি স্বীকার করে নেওয়ার ফলে ধর্মের স্থান লাভ হয় দর্শনের ঊর্ধ্বে, দর্শন থেকে সমর্থনলাভের প্রয়োজন তার আর থাকে না। তেমনি দার্শনিকেরও নেই ধর্মের সমর্থনের প্রয়োজন কতকগুলো মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে; যেমন অনন্ত জীবন। অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস মানুষের থাকা চাই, এতে তার অধিকার রয়েছে, তার প্রকৃতির প্রয়োজনাবলীর সঙ্গে এর যোগ, তাই ধর্মের আশ্বাসে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কিন্তু দার্শনিক যদি আত্মার অনশ্বরতা প্রমাণিত করতে চান কোনো উপকথার সাহায্যে তবে সেটি হয় খুব দুর্বল ও অযোগ্য কাজ।† আমার চোখে আমার আত্মার অনশ্বরতার প্রমাণ রয়েছে কর্ম-তৎপরতা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাতে; যদি আমৃত্যু আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাই তাহলে আমার বর্তমান রূপ যখন আর আমার চেতনার আধার হতে পারবে না, তখন প্রকৃতি আমার অস্তিত্বের আর এক রূপ দিতে বাধ্য।"

* ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডে আছে:
নিষ্ক্রিয়তায় নেই আমার কোনো কল্যাণ:
ভয়ের শিহরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,
যতই জগৎ অনুভূতিকে মহার্ঘ করুক
ভয়ের কবলেই মানুষ অনুভব করে বিরাটকে।

† গ্যেটে এখানে দার্শনিক হেগেলের প্রতিবাদ করেছেন।

বৃহস্পতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী

এরপর খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ লাগ্রাঞ্জে সম্বন্ধে কথা উঠলো, গ্যেটে তাঁর মহৎ চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করলেন।

তিনি বললেন: তিনি ছিলেন সদাশয় ব্যক্তি, আর সেইজন্যই মহাপুরুষ। কারণ সদাশয় ব্যক্তির যদি প্রতিভা থাকে, তবে কবি-রূপে হোক, দার্শনিকরূপে হোক অথবা শিল্পীরূপে হোক সর্বদা তাঁর শুভ-সাধনা চলে বিশ্বের মুক্তির উদ্দেশ্যে।"

এরপর কি সম্পর্কে মনে নেই গ্যেটে এই মন্তব্য করলেন:—

"যা কিছু মহৎ ও দক্ষতার পরিচায়ক তা সাধিত হয়েছে মুষ্টিমেয়ের দ্বারা। অনেক মন্ত্রী বড় বড় পরিকল্পনা সুসিদ্ধ করেছেন নিজেদের চেষ্টায়, রাজা ও দেশের লোক ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে। ভাবা যায় না যে বিচার কোনো দিন হবে জনপ্রিয়। উত্তেজনা, আবেগ, এসব জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু বিচার চিরদিন রয়ে যাবে মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণের নিজস্ব সম্পদ।"

শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বললেন: "ঐশ্বরিক কাজ চলে প্রাণবানের মধ্যে, প্রাণহীনের মধ্যে নয়; যা পরিণতি লাভ করছে ও রূপান্তরিত হচ্ছে তার মধ্যে যা পরিণতি লাভ করেছে ও অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়েছে তার মধ্যে নয়। বিচার-বুদ্ধিরও প্রবণতা হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির দিকে তাই তারও কাজ চলে যা পরিণতি লাভ করছে যা প্রাণবান তার মধ্যে আর যা পরিণত ও অপরিবর্তনীয় তাকে তা বুঝতে চায় যেন তা কাজে লাগাতে পারে।

মঙ্গলবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

গ্যেটে বললেন: "ইংরেজরা যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তবে ভারতীয় দর্শনে অদ্ভুত কিছুই নেই বরং যে সব যুগের মধ্যে দিয়ে আমরা জীবন অতিবাহিত করি তারই পরিচয় রয়েছে তাতে। বাল্যে আমরা সবাই রূপের উপাসক; যখন অন্তরে প্রেম জাগে তখনই হই আদর্শবাদী, প্রিয়াতে আরোপ করি সেই সব গুণ যা তাতে প্রকৃতই নেই। প্রেম হয় চপল; প্রিয়ার বিশ্বস্ততায় জাগে সন্দেহ, আর অজ্ঞাতসারে আমরা হয়ে পড়ি সন্দেহবাদী। আমাদের অবশিষ্ট জীবন কাটে উদাসীনভাবে, মাথা ঘামাই না জীবনের সমস্যা নিয়ে, এইভাবে ভারতীয় দার্শনিকের মতো অন্তিমে হই নিষ্কামধর্মী।"

সোমবার, ২৩শে মার্চ

গ্যেটে বললেন :...“প্রাসাদ, জমকালো কামরা এসব আমার প্রকৃতিতে অসহ্য। কার্লস্‌বাড-এ আমার যে প্রাসাদের মতো বাড়ী ছিল সে-রকম বাড়ীতে আমি হয়ে পড়ি আলসে, কাজে মন যায় না। কিন্তু এই যে ছোট শাদাসাটা কামরায় আছি, এক রকমের অশৃঙ্খল শৃঙ্খলা রয়েছে এতে, জিপ্‌সীদের ধরণের—এ আমার খুব পছন্দসই। আমার অন্তরপ্রকৃতি এতে পুরোপুরি ছাড়া পায়, সৃষ্টি করে চলে নিজের শক্তিতেই।”

মঙ্গলবার, ২৪শে মার্চ

গ্যেটে বললেন : · মানুষের শক্তি যত বাড়ে তত বাড়ে তার জন্য দৈবশক্তির প্রভাব, তাকে সাবধান হতে হবে যেন তার পরিচালনী ইচ্ছা তাকে ভুল পথে পা বাড়াবার মন্ত্রণা না দেয়।

শিলারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এক বিশেষ দৈব-প্রভাবের (demonic) ব্যাপার ; পূর্বে বা পরেও আমাদের মিলন ঘটতে পারতো ; কিন্তু আমাদের মিলন ঘটলো যখন আমি ফিরেছি আমার ইতালি-ভ্রমণ শেষ করে আর শিলার বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন দার্শনিকতার প্রতি—এর ফল আমাদের দুজনের জন্যই হয়েছিল বিশেষ অর্থপূর্ণ।”

বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল

·· এরপর আধুনিকতম ফরাসী কবিগণ আর ‘ক্লাসিক’ ও ‘রোমান্টিক’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

গ্যেটে বলেন : “একটি নতুন সংজ্ঞা মনে পড়ছে, তা দিয়ে ব্যাপারটির মন্দ ব্যাখ্যা হবে না। ক্লাসিক বলব তাকে যা স্বাস্থ্যবান, আর রোমান্টিক হচ্ছে রুগণ। এই অর্থে একালের Nibelungenlied (মধ্যযুগের জার্মান মহাকাব্য) সেকালের ইলিয়াডের মতোই ক্লাসিক, কারণ দুইই সতেজ ও স্বাস্থ্যবান। অধিকাংশ আধুনিক রচনা রোমান্টিক, নতুন বলে নয়, দুর্বল ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃত বলে, অপরপক্ষে প্রাচীন রচনা ক্লাসিক, প্রাচীন কালের বলে নয়, সবল-সতেজ আনন্দপূর্ণ ও স্বাস্থ্যবান বলে ; ক্লাসিক ও রোমান্টিকের লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করলে আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে সহজে।

সোমবার, ৬ই এপ্রিল

...এরপর ছন্দ সম্বন্ধে কথা উঠলো, সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম এ ব্যাপারে খাটবে না।

গ্যেটে বল্লেন: "ছন্দ কবির বিশেষ ভাবমুহূর্ত থেকে যেন উৎসারিত হয়ে আসে অজানিতভাবে! যদি কবিতা লিখবার সময়ে ছন্দের কথা কবিকে ভাবতে হতো তবে সে পাগল হয়ে যেত, বেরুত না ভাল কিছুই।"

...গ্যেটে বল্লেন: "গিজো মন্তব্য করেছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটি পাওয়া গেছে জার্মানদের কাছ থেকে, জার্মান জাতির মধ্যেই এই ভাবটি বেশী রয়েছে।

চমৎকার কথা বলেছেন। আর খুব সঙ্গতও। একাল পর্যন্ত এই ভাবই আমাদের জাতীয় জীবনে কাজ করে এসেছে। এটি যেমন Reformation-এর মতো সার্থক প্রচেষ্টার মূলে তেমনি Burschen-ষড়যন্ত্রের মতো নির্বোধ ব্যাপারেরও মূলে। আমাদের সাহিত্যের রকম-বেরকমের চেহারা; আমাদের কবিদের মৌলিক হবার দুর্জয় সাধ—তাঁদের প্রত্যেকের মনে কাজ করছে এই বিশ্বাস যে এক নূতন পথের আবিষ্কর্তা হবেন তিনি; আমাদের পণ্ডিতদের পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা—প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র-ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী—সবের মূলে এই ভাব।

ফরাসী ও ইংরেজেরা কিন্তু অনেক বেশী মিলেমিশে চলে, একে হয় অন্যের অনুবর্তী। পোষাকে চালচলনে তাদের একের সঙ্গে অন্যের খুব মিল। বিচ্ছিন্ন হতে তারা ভয় পায়—পাছে বড় বেশী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, হয়ত বা তামাসার পাত্রও হতে হয়; কিন্তু জার্মানরা চলে যার যার পথে, লক্ষ্য তাদের নিজের সন্তোষ; অন্যের পছন্দ অপছন্দের প্রত্যাশী তারা নয়; গিজো যথার্থই বলেছেন, তাদের মনে কাজ করছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটি; এর থেকে, যেমন বলেছি, আমাদের লাভ হয়েছে অনেক চমৎকার কিছু, অনেক অদ্ভুত কিছুও।"

মঙ্গলবার, ৭ই এপ্রিল

...নেপোলিয়নের মিশর-অভিযান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

গ্যেটে বল্লেন: "যারা প্লেগে ভুগছিল তিনি বাস্তবিকই তাদের দেখতে গিয়েছিলেন এই প্রমাণ দেবার জন্তে যে যিনি ভয়কে জয়

করেছেন তিনি প্লেগকেও জয় করতে পারেন। তাঁর এই মত নিঃসন্দেহে সত্য। আমার নিজের জীবন থেকে এর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এক সময়ে বিষাক্ত জ্বরের ছোঁয়াচের মধ্যে আমাকে যেতে হয়েছিল, তার বিষক্রিয়া আমি প্রতিহত করেছিলাম কেবল প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। শুভসাধনী ইচ্ছাশক্তি এরূপ ক্ষেত্রে যে কত কার্যকরী হতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। তা যেন সঞ্চারিত হয় সর্বদেহে, দেহকে এতখানি সক্রিয় করে তোলে যে সব ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে ভয় হচ্ছে নিষ্ক্রিয় দুর্বলতার ও আক্রান্ত হবার দশা—সুবিধা পায় সব শত্রুই। নেপোলিয়ন একথা ভাল করেই জানতেন, তিনি বুঝেছিলেন তাঁর সৈন্যদের সামনে এমন এক জাঁকালো দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি বিপদ বরণ করছেন না আদৌ।"

খুশী হয়ে তিনি আরো বল্লেন—"কিন্তু সেলাম ঠোকো এইবার। নেপোলিয়ন তাঁর অভিযান-গ্রন্থাগারে কোন্ বই সঙ্গে নিয়েছিলেন জান? —আমার 'ভেটর'।"

বুধবার, ১৪ই এপ্রিল

যাদের সত্যকার ক্ষমতা নেই অথচ লেখারও বিরাম নেই আর যারা লেখে এমন সব বিষয়ে যার জ্ঞান তাদের নেই, তাদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

গ্যেটে বল্লেন: "এই তরুণরা প্রলুব্ধ হচ্ছে এই কারণে: আমরা যে-যুগে বাস করছি তাতে প্রকর্ষ এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, তরুণরা সে-সব পাচ্ছে যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজভাবে। কাব্য ও দর্শন-বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে, তারা সে-সব গ্রহণ করছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, মনে করছে সে-সব তাদের নিজস্ব সম্পদ, প্রকাশও করছে সে-সব সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু যুগের কাছ থেকে তারা যা পেয়েছে তা যখন ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই যুগকে তখন তারা হয়ে পড়ছে নিঃস্ব। তারা যেন ফোয়ারা, কিছুক্ষণের জন্য চলে তাতে জলের খেলা কিন্তু জল নিঃশেষিত হবার সঙ্গে হয় তার শেষ।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ

*রবিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

আজ ভাইমারে শোকের দিন, রাণী লুইসা আজ দেড়টায় পরলোকগমন করেছেন!...আমি প্রথমে গেলাম কুমারী ফন ভাল্‌ড্‌নের (Waldner)-এর ওখানে; দেখলাম গভীর দুঃখে তিনি কাঁদছেন।...

তারপর গেলাম গ্যেটের ওখানে। ···এই মৃত্যু তাঁকে কম স্পর্শ করেনি, কিন্তু মনে হলো অনুভূতির উপর পুরো কর্তৃত্ব রয়েছে তাঁর। জনৈক বন্ধুর সঙ্গে তিনি আহারে বসেছিলেন, এখন মদিরা পান করছিলেন, উদ্দীপনার সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি, মনে হলো তাঁকে খুব প্রফুল্ল। আমাকে দেখে বল্লেন: "এসো বসো। যে আঘাতের ভয় আমরা করছিলাম দীর্ঘদিন ধরে' অবশেষে তা এসেছে, অন্ততঃ নিষ্ঠুর অনিশ্চযতার সঙ্গে আর যুঝতে হবে না আমাদের। এখন আমাদের দেখতে হবে আবাব জীবনের কাজে লাগা যায কেমন করে।"

* সোমবার, ১৫ই ফেব্রুযারী

আজ সকালে গ্যেটের ওখানে গিযেছিলাম কেমন আছেন তিনি তাই জানতে···। আজ দেখলাম তাকে নিরানন্দ ও চিন্তাকুল, কালকার সেই কিছু বেশী উদ্দীপনা কোথায অন্তর্হিত হযে গেছে, আজ যেন তিনি উপলব্ধি কবছেন পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধুত্বের স্মৃতিতে মৃত্যু কি গভীর ফাঁকা এনে দিযেছে।

তিনি বল্লেন: "এই অকস্মাৎ বিচ্ছেদে নিজেকে ঠিক রাখবার জন্য আমাকে খুব খেটে যেতে হবে। মৃত্যু এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার যে আমাদের প্রিযজন যে এর কবলিত হতে পারে এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমবা ভাবি তা অসম্ভব ; এ সব সময আসে এক অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত ব্যাপাররূপে। এই প্রায-অসম্ভব ব্যাপার সহসা ধরে সম্ভবের রূপ। যা আমাদের জানাশোনা সেই অবস্থা থেকে যা জানাশোনা নয় আদৌ তাতে এই যে পরিবর্তন, এ এমন প্রবল যে যারা বেঁচে থাকে তাদের ভযঙ্কর আঘাত না দিযে আর ছাড়ে না।"

রবিবার, ১৪ই মার্চ

···এব পর কথা উঠলো ফরাসী সাহিত্য ও কোনো কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের অতি-রোমান্টিক প্রবণতা সম্পর্কে। গ্যেটে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন:···এই যে কাব্য-বিপ্লবের সূচনা মাত্র হয়েছে, এর ফল সাহিত্যের জন্য হবে খুব শুভ কিন্তু এই বিপ্লবকর্তা সাহিত্যিকদের জন্য একান্ত ক্ষতিকর।

তিনি বল্লেন: "কোনো বিপ্লবেরই চরম পরিণতি এড়াবার যো নেই! বাজনৈতিক বিপ্লবে প্রথমে কামনা করা হয় অন্যায়ের অবসান মাত্র। কিন্তু অজ্ঞাতসারে জন-সাধারণ হাজির হয় গিয়ে রক্তারক্তি ও বিভীষিকার মধ্যে। এই কাব্য-বিপ্লবে ফরাসীরা প্রথমে চেয়েছিল

বাহ্যরূপের কিছু অদলবদল মাত্র; কিন্তু থামবে না তারা এতেই, সাহিত্যের প্রচলিত বাহ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন দেবে তারা তার অন্তরের বস্তুও। তারা বলতে শুরু করেছে মহৎ ভাব ও কর্মের অবতারণা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, আর চেষ্টা করছে যত বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করতে। গ্রীকপুরাণের সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানের পরিবর্তে এখন এসে পড়ছে ভূত প্রেত ডাকিনী ও রক্ত-চোষার কাহিনী. অতীতের বীরদের স্থান দখল করছে জাদুকর আর জেলখাটিয়ের দল। ঝাঁঝালো এসব ব্যাপার! লাগে ভাল! কিন্তু এমন চড়া তার মুখে লাগার পরে জনসাধারণ চাইবে আরো চড়া তার। যাদের শক্তি আছে, পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে এমন সব তরুণ লিখিয়ে সমাদর পাবার আশায় তেমন জিনিষই দেবে যা সাময়িকরুচিসম্মত, এমন কি তাদের কাজ হবে বিভীষিকার অবতারণায় পূর্ববর্তিদের ডিঙিয়ে যাওয়া। কিন্তু সাফল্যের এই সব বাহ্য উপকরণ সংগ্রহের লোভে উপেক্ষিত হবে তাদের অভিনিবিষ্ট পাঠ, শক্তির ধীর ও পূর্ণ বিকাশ—তাদের অন্তরাত্মা। প্রতিভার পক্ষে এর চাইতে বড় ক্ষতি নেই, কিন্তু এই সাময়িক প্রবণতায় সাধারণভাবে সাহিত্যের উপকারই হবে।

আমি বললাম: যাতে প্রতিভার ক্ষতি হয় তা দিয়ে সাধারণভাবে সাহিত্যের উপকার হবে কেমন করে?

গ্যেটে বলেন: "এই সব বাড়াবাড়ি কালে যাবে দূর হয়ে কিন্তু রয়ে যাবে এই সব ভাল ফল: শুধু বাহ্যরূপের অদল-বদল নয় তার সঙ্গে সঙ্গে আসবে বিষয়ের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য, বিরাট বিশ্ব-জগতের ও অশেষবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কিছুই আর কাব্যকলার অযোগ্য বিষয় জ্ঞান করা হবে না। এই সাহিত্যিক যুগকে আমি তুলনা করি খুব কড়া জ্বর ভোগের সঙ্গে; সে-জ্বর কাম্য নয় কারো, কিন্তু তার একটা ভাল ফল এই যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এখন বীভৎসতাই কাব্যের গোটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে হবে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ মাত্র, শুধু তাই নয়, যে পবিত্র ও মহৎ ভাব এখন বর্জিত হয়েছে অচিরে বাড়বে তার সমাদর।"

বুধবার, ১৭ই মার্চ

…গ্যেটে বললেন: "ক্ল্যাসিক্যাল আর রোমাণ্টিক কাব্যের যে পার্থক্যের কথা এখন জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তা নিয়ে

নানা বাদ-প্রতিবাদ দলাদলি চলেছে, প্রথমে তার উৎপত্তি শিলার আর আমার কাছ থেকে। আমার মত ছিল কাব্য হবে বস্তুনিষ্ঠ, অন্য পদ্ধতি অচল, কিন্তু শিলারের পদ্ধতি ছিল আত্মনিষ্ঠ, তাঁর সেই পদ্ধতি তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান করতেন আর আমার মতের বিরুদ্ধে নিজের মত দাঁড় করাবার জন্যে লিখেছিলেন তাঁর "অকৃত্রিম ও ভাবপ্রবণ কাব্য" প্রবন্ধটি (Naive and Sentimental Poetry) তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে হতে হয়েছে রোমান্টিক, ভাবপ্রাধান্য হেতু আমার "ইফিগেনিয়া" ততটা ক্ল্যাসিক্যাল ও প্রাচীনরীতির হতে পারেনি যতটা ভাবা হয়।

শ্লেগেলরা দুই ভাই এই ভাবটি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন, ফলে এটি এখন ছড়িয়ে পড়েছে জগতের সর্বত্র, ক্লাসিসিজম রোমান্টিসিজম এখন সবার মুখে,—কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই বিষয়ে কেউ ভাবতো না।

সোমবার, ৫ই এপ্রিল

সবাই জানে গ্যেটে চশমা-চোখে লোক সহ্য করতে পারেন না। বহুবার তিনি বলেছেন :..."যার সঙ্গে কথা বলছি তার চোখ দুটি যদি না দেখতে পেলাম, তার আত্মার দর্পণ ঢাকা রইলো এক জোড়া চোখ-ধাঁধানো কাচ দিয়ে, তবে কি পেলাম তার কাছ থেকে···

···যারা দেহে মনে সমৃদ্ধ তারাই বরং বিনীত, যাদের বিশেষ কোনো মানসিক খুঁৎ আছে তারাই নিজেদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। মনে হয়, সদয়া প্রকৃতি যাদের যথেষ্ট গুণপনা দেয় নি তাদেরই দিয়েছে কল্পনা-প্রবণতা আর অহঙ্কার, ক্ষতিপূরণ হিসাবে !"

২০শে নভেম্বর, শনিবার—(গ্যোটিঙ্গেন)

আমি ভাইমারে থেকে এসেছি, ফিরে যাব ভাইমারে, এই কথা জেনে সন্ধ্যায় হোটেলস্বামী আমাকে শান্তকণ্ঠে বললেন : মহাকবি গ্যেটেকে বৃদ্ধ বয়সে এক বড় দুর্দৈব সহ্য করতে হলো, আজকার কাগজে বেরিয়েছে যে তাঁর একমাত্র পুত্র ইতালিতে পক্ষাঘাত রোগে মারা গেছেন।···

চোখে ঘুম এলো না সমস্ত রাত্রি।···আমার সব চাইতে বড় ভয় হলো, এই বয়সে গ্যেটে এই নিদারুণ পুত্রশোক কাটিয়ে

উঠতে পারবেন না। মনে হলো আমার, গিয়েছিলাম আমি কবির পুত্রের সঙ্গে, কিন্তু ফিরে এসেছি একা—কেমন লাগবে যখন ফিরে যাব ভাইমারে! যেন আমাকে দেখেই তিনি বুঝবেন তাঁর পুত্রকে সত্যই হারিয়েছেন।...

বৃহস্পতিবার, ২৫শে নভেম্বর

...দুপুরে কবির ওখানে খেতে গেলাম। তিনি কতকগুলি খোদাইয়ের কাজ ও ছবি দেখছিলেন...। বললেন: আজ ভোরে (নতুন) রাণী এসেছিলেন, তাঁকে আমার ফিরে আসার কথা তিনি বলেছেন।

কবির পুত্রবধূ আমাদের সঙ্গে আহারে বসলেন। আমাদের ভ্রমণের বিবরণ আমাকে দিতে হলো।...

আহারের পরে গ্যেটে আমার 'আলাপ' সম্বন্ধে কথা তুললেন দেখে খুশী হলাম।

তিনি বললেন: "এই হবে তোমার প্রথম বই, সবটা লেখা ও ভালো সাজানো না হওয়া পর্যন্ত এটি বার করা হবে না।"

তবু মনে হলো গ্যেটে আজ কথা বললেন অনেক কম, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, মনে হলো লক্ষণ ভাল নয়।

মঙ্গলবার, ৩০শে নভেম্বর

গত শুক্রবারে আমাদের কেটেছে খুব দুশ্চিন্তায়। রাত্রে গ্যেটের ভয়ানক রক্তস্রাব হয়, সমস্ত দিন তাঁর কেটেছে মরমর অবস্থায়।...যা হোক তাঁর চিকিৎসক হোফরাট-ফোগেল-এর (Hofrath Vogel) অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আর তাঁর অসাধারণ শক্ত ধাতের গুণে এ যাত্রা রক্ষা পেলেন।...

...গ্যেটে পুরোপুরি সেরে উঠলেন শীগগিরই আর মন দিলেন তাঁর ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অঙ্ক আর আত্মচরিত চতুর্থ খণ্ড শেষ করতে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ

রবিবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

...আমি (ফাউস্ট সম্পর্কে) বললাম :—কবির বড় কাজ হচ্ছে বহুধাবিচিত্র জগৎ রূপায়িত করা, কোনো প্রসিদ্ধ নায়কের কাহিনীটি হচ্ছে তাঁর জন্য মাত্র একটি সূত্র—তাতে গাঁথেন তিনি যা খুশী। Gil Blas আর Odysseyতে ঘটেছে এই ব্যাপার।

গ্যেটে বললেন : "যথার্থ বলেছ তুমি, আর এরূপ রচনায় বেশী দৃষ্টি রাখতে হবে যেন বিভিন্ন অংশ হয় সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ আর সমগ্র ব্যাপারটি রয়ে যায় দুর্জ্ঞেয়—আর সেই-জন্যই এক কূট সমস্যার মতো এটি মানুষকে বারবার প্রলুব্ধ করবে এর অর্থ উদ্ধারের দিকে।"

…নিউ টেস্টামেণ্ট সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো। যীশু যেখানে জলের উপরে হাঁটছেন আর পিটার তাঁর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন সেখানে পড়ছি, উল্লেখ করলাম।—বললাম : কিছুকাল বাদে সুসমাচার লিখিয়েদের বিবরণ যখন পড়া যায় তখন তাঁদের আত্মিক মহিমা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। আমাদের নৈতিক ইচ্ছা-শক্তিকে যেভাবে উদ্‌বোধিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে আমরা অনুভব করি যেন এক অকুণ্ঠ আদেশ।

গ্যেটে বললেন : "প্রত্যয়ের এই ধরণের অকুণ্ঠ আদেশ বিশেষভাবে রয়েছে মোহম্মদে, তাঁতে এটি হয়েছে আরো দূরপ্রসারী।"

…(শিল্পীর চারিত্রিক বীর্য ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল), গ্যেটে বললেন : "নিশ্চয়, শিল্পে ও কাব্যে ব্যক্তিত্বই সব; কিন্তু একালের সমালোচকদের মধ্যে অনেক দুর্বল ব্যক্তি রয়েছেন তাঁরা একথা স্বীকার করেন না, কাব্যে অথবা শিল্পে বড় ব্যক্তিত্ব তাঁদের চোখে এক তুচ্ছ আনুষঙ্গিক ব্যাপার।"

বৃহস্পতিবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

…গ্যেটে হেসে বললেন : "লোকেরা ভাবে বুড়ো হলে জ্ঞানী হওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে বয়স যত বাড়ে পূর্বের বুদ্ধিমত্তা বজায় রাখা তত কঠিন হয়। বিভিন্ন বয়সে লোকে বিভিন্ন ধরণের হয়, মিথ্যা নয়; কিন্তু বলা যায় না যে আরো ভাল হয়। কোনো কোনো ব্যাপারে ষাট বৎসর বয়সের মতো বিশ বৎসর বয়সেও লোকে নির্ভুল হতে পারে।"

রবিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী

…গ্যেটে বললেন : "কি উদ্দেশ্যে, কেন—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কি ভাবে?—এই প্রশ্ন সাহায্য করে আমাদের অগ্রগতি।"…

বুধবার, ২রা মার্চ

গ্যেটের সঙ্গে আজ আহার করলাম। শীগগিরই দৈবশক্তি (daemonic) সম্বন্ধে কথা উঠলো, তিনি নিম্নবর্ণিত মন্তব্য করলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেবার অভিপ্রায়ে। তিনি বললেন: "দৈবশক্তি তাই যুক্তি বা বিচারের দ্বারা যার ব্যাখ্যা করা যায় না; এই শক্তি মানুষের প্রকৃতিগত নয়, মানুষ বরং এর প্রভাবাধীন।"

আমি বললাম: মনে হয় নেপোলিয়নে এই দৈবশক্তি সক্রিয়।

গ্যেটে বললেন: "তিনি দৈবচালিত ছিলেন পুরোপুরি, অতিশয় সার্থক ভাবে, সেজন্য তাঁর সঙ্গে আর কারো প্রায় তুলনা হয় না। আমাদের ভূতপূর্ব ডিউকও ছিলেন এমন দৈবচালিত প্রকৃতির, অসাধারণকর্মশক্তিসম্পন্ন ও অশান্ত, তাঁর নিজের রাজ্য তাঁর জন্য ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র, অতি বড় রাজ্যও হতো তেম্‌নি ক্ষুদ্র। এমন দৈবচালিত ব্যক্তিদের গ্রীকরা জ্ঞান করতেন দেবতাস্থানীয়।"

আমি বললাম: দৈবচালনার পরিচয় কোনো কোনো ঘটনায়ও দেখা যায় না কি?

গ্যেটে বললেন: "বিশেষ করে' সেই সবে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা আমরা যার ব্যাখ্যা দিতে পারি না। এর বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতিতে—অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয়েই। অনেক জীব সম্পূর্ণরূপে দৈব-চালিত…।"

আমি বললাম: "মেফিসটোফিলিস"-এ দৈবচালনার পরিচয় নেই কি?"

গ্যেটে বললেন: "না, মেফিসটোফিলিস অনেক বেশী ধ্বংস-ধর্মী। দৈবচালনার পরিচয় পরিপূর্ণ কর্মশক্তিতে।"

তিনি আরো বললেন: "শিল্পীদের শ্রেণীতে এই দৈবচালনা সঙ্গীতবিদ্‌দের মধ্যে বেশী, চিত্রকরদের মধ্যে কম।"

মঙ্গলবার, ৮ই মার্চ

…এরপর তাঁর আত্মচরিতের চতুর্থ খণ্ড সম্বন্ধে কথা উঠলো, আর অজ্ঞাতসারে আমরা উপনীত হলাম দৈবশক্তি প্রসঙ্গে।

গ্যেটে বললেন: "বিশেষ করে' কাব্যে যা সজাগ চেষ্টার ব্যাপার নয়, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যেখানে কুলোয় না, আর সেজন্য ফল যার হয় আশার অনেক বেশী—দৈবশক্তির ক্রিয়া তাতে সব সময়ে বর্তমান।

তেমনি সঙ্গীতে এর ক্রিয়া খুব বেশী, কেননা সঙ্গীত এমন উঁচুস্তরের ব্যাপার যে বুদ্ধি তার নাগাল পায় না, সবাই অভিভূত হয় সঙ্গীতের প্রভাবে অথচ বোঝে না কেন। এইজন্ম ধর্মচর্চার সঙ্গে এর এমন অচ্ছেদ্য যোগ, মানুষের উপরে অলোক-সামান্য প্রভাব বিস্তার করার জন্ম সঙ্গীত এক প্রধান উপায়। দৈবশক্তি অনেক সময়ে ক্রিয়াশীল হয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে, বিশেষত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিতে—যেমন ফ্রেডারিক দি গ্রেটে ও পিটার দি গ্রেটে।

আমাদের পরলোকগত ডিউকে এই দৈবশক্তি এতখানি ছিল যে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারতো না। তাঁর নীরব উপস্থিতি লোকদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতো, তাঁর প্রসন্ন বন্ধুভাব দেখাবার প্রয়োজন পর্যন্ত হতো না। তাঁর উপদেশ নিয়ে যাতে হাত দিয়েছি তাতেই সফলকাম হয়েছি। সেজন্যে যেখানে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনায় আর কুলোতো না সেখানে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিতাম কি করা সঙ্গত, আর তাঁর সহজবুদ্ধিজাত উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হতাম সুফল লাভ সম্বন্ধে।

আমার ভাব-ভাবনার ও মহত্তর প্রয়াসের অধিকারী যদি তিনি হতে পারতেন তবে তিনি হতেন পরম ঈর্ষার পাত্র; দৈবশক্তি যখন তাঁতে সক্রিয় থাকতো না, থাকতো মানুষী শক্তি, তখন তিনি ভেবে পেতেন না কি করবেন, হয়ে পড়তেন অনেকখানি অস্বস্তিপূর্ণ।

এই শক্তি বাইরনেও সক্রিয় ছিল হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে, তারই ফলে লোককে আকর্ষণ করার শক্তি তাঁর জন্মেছিল, বিশেষভাবে নারীরা তাঁর আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে পারতো না।

বুঝে দেখবার জন্ম আমি বললাম: ঐশ্বরিক শক্তি বলতে আমরা যা বুঝি এই দৈবশক্তি তার অন্তর্গত হয়ত নয়।

গ্যেটে বললেন: বন্ধু, ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আমাদের আছে? সেই মহাশক্তি সম্বন্ধে আমাদের সীমাবদ্ধ ভাব ও ভাবনায় কি-ই বা ব্যক্ত হতে পারে। মুসলমানের মতো যদি শত নাম তাঁর দিই তবু বলা হবে সামান্য, আর তাঁর অন্তহীন মহিমার কথা ভাবলে বুঝবে, বলা হয়নি কিছুই।"

শুক্রবার—১৮ই মার্চ

…গ্যেটে বললেন: "দৈবশক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষকেও করতে হবে যথাসাধ্য চেষ্টা; আমার এই গ্রন্থের (বৃক্ষের রূপান্তর-

তত্ত্বের অনুবাদ) মধ্যে সাধ্য ও সুযোগ অনুযায়ী উৎকর্ষ-চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। ফরাসীদের Codille খেলায় যেমন এসব ব্যাপারেও তেম্নি, দান যা পড়লো তার উপরে নির্ভর করে অনেকখানি কিন্তু সেই সঙ্গে খেলোয়াড়ের ঘুঁটি সাজাবার যোগ্যতাও চাই।"

সোমবার—২১শে মার্চ

রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কথা উঠ্লো—প্যারিসে যে ক্রমাগত গণ্ডগোল চলেছে আর তরুণরা রাজ্যের বড় বড় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে সেই সব।

আমি বললাম, ইংলণ্ডেও কিছুদিন পূর্বে ছাত্ররা ক্যাথলিক সমস্যার মীমাংসা প্রভাবিত করতে চেয়েছিল এক দরখাস্ত পাঠিয়ে, কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি হলো, আর বেশীদূর গড়ালো না।

গ্যেটে বললেন: "নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের তরুণদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা সেই মহাপুরুষের প্রভাবে বেড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে, এক আত্মগরিমার সৃষ্টি করেছে; আর এক বড় বীর যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাদের সাধ-স্বপ্নকে পূর্ণাঙ্গতা দান করছেন সে পর্যন্ত তারা শান্ত হতে পারছে না। দুর্ভাগ্য এই যে নেপোলিয়নের মতো লোকের জন্ম এত শীগ্‌গির হবে না; আমার ভয় হয়, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ব্যর্থ হবার পরে তবে যদি জগতে পুনরায় শান্তি দেখা দেয়।

সাহিত্যের দ্বারা প্রভাব বিস্তারের কথা এখন ভাবাই যায় না। এখন একমাত্র কাজ কোনো সুশৃঙ্খল ভবিষ্যৎ কালের জন্য শান্ত মনে ভাল রচনা দাঁড় করিয়ে যাওয়া।

মঙ্গলবার—২২শে মার্চ

···গ্যেটে বললেন: "যা শ্রেষ্ঠ তার সমাদর যে যুগে নেই তা ভিন্ন বর্বর যুগ আর কি?"

মঙ্গলবার—২৯শে মার্চ

মের্ক সম্বন্ধে কথা উঠলো··।

গ্যেটে বললেন, পরলোকগত ডিউক মের্ককে খুব ভালবাসতেন, এজন্য এক সময়ে মের্কের চার হাজার ডলার ঋণের জামিন তিনি হন। কিন্তু অল্প দিনেই মের্ক সেই ঋণের দলিলাদি ফিরিয়ে দিলেন দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়নি।

আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না নতুন কি বন্দোবস্ত তিনি করেছেন। তাঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো তখন তিনি এর রহস্য সম্বন্ধে এই বললেন :

ডিউক অতি চমৎকার উদার লোক, মানুষকে তিনি বিশ্বাস করেন আর সাহায্য করেন সুযোগ পেলেই। আমি ভাবলাম তাঁকে যদি এই টাকাটা ঠকাই তাহলে হাজার হাজার লোকের ক্ষতি করা হবে, কেননা তাঁর ভিতরে যে মানুষকে বিশ্বাস করার ভাবটি রয়েছে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে এক জোচ্চোরের জন্যে বহু অভাবগ্রস্ত ও ভাল লোক বিপন্ন হবে। এজন্য কি করলাম জান এক ফন্দি বার করে এক ধড়িবাজের কাছ থেকে এই টাকাটা কর্জ করেছি, কেননা এমন লোককে ঠকালে কিছু এসে যায় না কিন্তু আমাদের ডিউকের মতো ভাল লোককে ঠকালে খুব খারাপ হতো।

মের্কের এই খেয়ালী মহত্বের কথা ভেবে আমরা খুব হাসলাম।…

রবিবার—২৯শে মে

‥এক তরুণ ভাস্কর একটি গাভী ও তার বাছুরের এক প্রতিমূর্তি গ্যেটেকে পাঠিয়েছিলেন, তা দেখে কবি এই মন্তব্য করেন :

"এ এক অতি উচ্চ বিষয়। যে পালনী বৃত্তি জগৎকে আছে ধারণ করে', প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছে ওতপ্রোতভাবে তারই এক প্রতীক দেখছি আমাদের সামনে। এই ধরণের রূপকল্পনাকে আমি জ্ঞান করি ভগবানের সর্বময়তার যথার্থ প্রতীক।"

রবিবার—২৭শে জুলাই

ভিকটর হুগো সম্বন্ধে আলাপ হলো। গ্যেটে বললেন : তাঁতে চমৎকার প্রতিভা রয়েছে, কিন্তু সমসাময়িক অস্বস্তিকর রোমাণ্টিক ভাবের জালে তিনি এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে প্রলুব্ধ হয়েছেন যা সুন্দর তার সঙ্গে যা অসহ্য ও উৎকট এমন সবের অবতারণায়। সম্প্রতি তাঁর Notre Dame de Paris পড়ছিলাম, কিন্তু পড়তে গিয়ে যে দারুণ বিতৃষ্ণা বোধ করছিলাম তা অতিক্রম করে বইখানি শেষ করতে আমাকে খুব বেগ পেতে হয়েছে। এমন বীভৎস গ্রন্থ আর লেখা হয়নি। তার উপর সেই পড়ার কষ্টের

ক্ষতিপূরণ যে হবে মানবপ্রকৃতি ও মানবজীবনের সত্য চিত্র দেখে তাও ঘটেনি। বরং তাঁর গ্রন্থ স্বভাব ও সত্য বর্জিত। যেসব নায়ক নায়িকার অবতারণা তিনি করেছেন তারা রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ নয়, বরং তুচ্ছ কাঠের পুতুল, তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী নানা ধরণের অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে তারা। কিন্তু অদ্ভুত সেই যুগ যাতে এমন গ্রন্থের শুধু সৃষ্টি হয় না সমাদরও হয়।

রাত্রির আহারের পরে ঘণ্টাখানেক গ্যেটের সঙ্গে কাটালাম। তিনি আজ খুব খোশ মেজাজে ছিলেন। বহু কথা বলতে বলতে শেষে তুললেন কার্লস্বাড-এর কথা। তাঁর সেখানকার সব প্রেমের ব্যাপার নিয়ে হাসি তামাসা করলেন। বললেন: "কিঞ্চিৎ প্রেমই কেবল সমুদ্রের ধারের স্বাস্থ্যনিবাসে মানুষের জীবন চালু রাখতে পারে, নইলে মরতে হতো একঘেয়েমির বিরক্তিতে। ভাগ্যক্রমে আমার প্রায়ই জুটতো ছোটখাটো 'স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী'। কাটতো আনন্দে যে কয় সপ্তাহ থাকা যেতো। একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে, এখনো খুশী হই সে কথা ভেবে।

একদিন এক মহিলার সঙ্গে দেখা করলাম। সাধারণ কথাবার্তার পরে যখন বিদায় নিলাম তখন এলেন আর একজন মহিলা, তাঁর সঙ্গে দুই সুন্দরী কন্যা। আগন্তুক মহিলা পূর্বের মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন: যে ভদ্রলোক এখন চলে গেলেন তিনি কে?" উত্তরে শুনলেন "গ্যেটে।" তখন আগন্তুক মহিলা দুঃখ করে বললেন, "উনি রইলেন না, ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না।" পূর্বের মহিলা বললেন: "কিছু ক্ষতি হয়নি তাতে, মেয়েদের সভায় ওঁর মুখ খোলে না, তোমার আমার বয়সের মহিলারা যে ওঁকে আলাপী করে তুলতে পারবে সে আশা বৃথা।"

তরুণী দুটির মনে কথাটা ধরলো, বললে তারা "আমরা তরুণী, দেখতেও সুন্দরী, এস দেখি এই নামজাদা বর্বরকে বাগে আনতে পারি কি না।" পরদিন সকালে রাস্তায় তারা আমাকে অতি মধুরভাবে অভিবাদন করলে। তাদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ ত্যাগ করতে পারলাম না। চমৎকার তারা, বাক্যালাপ আলাপ করলাম। তারা নিয়ে গেল আমাকে তাদের মায়ের কাছে, এমনিভাবে পড়লাম ধরা। এই সময় থেকে প্রতিদিন আমাদের দেখা ও আলাপ হতো। এদের একজনের বাগদত্ত পাত্র এসে

পড়লে অপর একজনের সঙ্গে খুব আলাপ জমলো। এদের মায়েব সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহাব কবতাম তা বলাই বাহুল্য। এই পরিবারের সংশ্রবে আমাব বহুদিন আনন্দে কেটেছিল সেকথা মনে হলে আজো আনন্দ পাই। অল্পদিনেই বালিকা দুটি আমাকে জানিযেছিল তাদের মা ও তাঁর বন্ধুর সেই আলাপ আব আমাকে পাকড়াও করবার তাদের এই চক্রান্তের কথা।"

আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে, এর পূর্বে এটি গ্যেটে আমাকে বলেছিলেন, এখানে বলছি।

"একদিন সন্ধ্যাব দিকে প্রাসাদেব বাগানে এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, এক পথের প্রান্তে সহসা আমাদের চোখে পড়লো আমাদের দলের দুইজন তন্ময হযে আলাপ করতে করতে এগিযে চলেছেন। মহিলা যিনি ছিলেন আর ভদ্রলোক যিনি ছিলেন - কাবো নাম করবো না, তাব দবকারও নেই—তাঁরা আলাপ করে চলেছিলেন আর কোনো দিকে তাঁদের খেয়ালই ছিল না। সহসা দুজনের মাথা পরস্পরের নিকটবর্তী হলো, আর তাঁবা গভীর আনন্দে চুম্বন বিনিময করলেন। তারপর তাঁরা পূর্বের মতো পথ চলতে লাগলেন, যেন কিছুই ঘটেনি। আমার বন্ধুটি মহা বিস্মযে বলে উঠলেন: দেখেছ ব্যাপাবটা? আমার দুই চোখকে কি বিশ্বাস করবো? আমি ব্যস্ত না হযে বললাম: "হাঁ দেখেছি, কিন্তু বিশ্বাস কবিনি।"

বুধবার—২১শে ডিসেম্বর

.. গ্যেটে বললেন: "প্রাকৃতিক দৃশ্য যে আঁকতে যাবে তার নানা বিষযের জ্ঞান থাকা দরকার। পটভূমি, গৃহনির্মাণরীতি, মানুষ ও পশুর শাবীরিক গঠন এসব বিষযে জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট নয, উদ্ভিদতত্ব ও খনিজ তত্ত্বেরও কিছু জ্ঞান থাকা চাই, যাতে বড় গাছ, চারা গাছ, বিভিন্ন ধরণের পাহাড়, এ সবের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে ভুল না হয। অবশ্য খনিজতত্বে বিশেষজ্ঞ হতে হবে না তাকে, কেননা তাব কাজ হচ্ছে চুণেব, স্লেটের ও বালু-কাঁকরের পাহাড় নিযে, তাকে জানতে হবে কি অবস্থায এসব আছে, আবহাওযাব প্রভাব এ-সবের উপর কি ধরণের হয, আর এই সব পাহাড়ে কোন্ ধবণেব গাছ বাড়ে, কোন্ গুলো বেঁটে হযে থাকে।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ

রবিবার—১১ই মার্চ

আজ সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক ধরে গ্যেটের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হলো। আমি সম্প্রতি একখানি ইংরেজি বাইবেল কিনেছিলাম, দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম যে তাতে ওল্‌ড্ টেস্‌টামেণ্টের যেসব অংশকে পরবর্তীকালের রচনা জ্ঞান করা হয় আর সেইজন্ত অকৃত্রিম ও ভগবদ্দত্ত জ্ঞান করা হয় না, সে-সব বর্জিত হয়েছে।...এই মতের সংকীর্ণতায় আমার বিরক্তির কথা আমি গ্যেটেকে বললাম। তিনি বললেন:...যা প্রকৃতই মহৎ, অকৃত্রিমতম প্রকৃতি ও বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সুসঙ্গত, আজো যার দ্বারা সম্ভবপর হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সে-সব ভিন্ন অকৃত্রিম আর কি হতে পারে? যা অযৌক্তিক ও অসার, ফলপ্রসূ নয়, অন্তত সুফলপ্রসূ নয়, তা ভিন্ন কৃত্রিমই বা কি হতে পারে?...

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্বভাবত খৃষ্টের প্রতি আমি ভক্তিমান কিনা, আমার উত্তর: নিশ্চয়। তাঁকে আমি অভিবাদন করি শ্রেষ্ঠ নৈতিক জীবনের দিব্য প্রকাশ জ্ঞানে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্বভাবত সূর্যের প্রতি আমি ভক্তিমান কিনা, পুনরায় আমার উত্তর হবে; নিশ্চয়। কেননা সূর্যেও সেই পরমপুরুষের প্রকাশ, হয়ত আমাদের মতো ধরিত্রীর সন্তানদের পক্ষে মহামহিম প্রকাশ। সেই সূর্যে আমি নতি জানাই আলোক ও ভগবানের সৃষ্টিশক্তির প্রতি, আমাদের সবার—সব বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর জীবনলীলার মূলে সেই শক্তি। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় বার্তাবহ পীটার আর পোলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থির প্রতি আমি ভক্তিমান কি না, তবে বলব—মাফ করো—সরে দাঁড়াও তোমাদের সব অদ্ভুত মত নিয়ে।

"...লুথার ও ব্যাপকভাবে 'রিফরমেশনে'র কাছে আমরা যে কতখানি ঋণী তা আমরা খুব কমই জানি। আত্মিক সংকীর্ণতা থেকে আমরা পেয়েছি মুক্তি, আমাদের প্রকর্ষের বিকাশের ফলে আমরা সন্ধান করতে পেরেছি উৎসমূলের—খৃষ্টান ধর্মের অবিকৃত রূপের। পুনরায় আমরা বুকে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছি ভগবানের এই ধরিত্রীর উপরে, অনুভব করছি আমাদের সত্তা আমাদের ভগবদ্দত্ত মানবীয় প্রকৃতিতে। আমাদের প্রকর্ষধারা হোক বাধাবন্ধ-

হীন, বিজ্ঞান হোক আরো গভীর আরো বিস্তৃত, মন হোক আরো বিকশিত, তবু কখনো অতিক্রান্ত হবে না সুসমাচারে খৃষ্টান ধর্মের যে নৈতিক উৎকর্ষ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই মহিমা।

"আমরা প্রোটেস্টাণ্টরা যত বেশী আত্মোন্নতি করবো তত দ্রুত ক্যাথালিকরা হবে আমাদের অনুগামী। কালের যে চিরপ্রবহমান উৎকর্ষ-ধারা তার প্রভাবে এলেই তাদের চলতে হবে এগিযে তা যত বাধাবিঘ্নই তারা ঘটাক, আর শেষে সবাইকে দাঁড়াতে হবে এক জাযগায।

"প্রোটেস্টাণ্টদের হীন সাম্প্রদাযিকতারও হবে বিরতি আর সেই সঙ্গে পিতা-পুত্র ভাই-বোন এদের মধ্যে যে ঘৃণা-বিদ্বেষের সূচনা হয়েছে সেই সব; তাব কারণ, প্রকৃত ধর্মমত ও খৃষ্টের প্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি কবার ফলে ধর্ম জীবন্ত হযে উঠ্‌লে আমরা বুঝব, আমরা মানুষ, মহৎ উদার ও মুক্ত, ধর্মের বাহ্য রূপের—তা যে ধরণেরই হোক —বিশেষ মর্যাদা তখন আর আমরা দেব না। আর আমরা সবাই ক্রমে এগিযে চলব কথা ও মতবাদের খৃষ্টানী থেকে অনুভূতি ও কর্মের খৃষ্টানীর দিকে।"

··এর পর কথা উঠ্‌লো বর্তমান জগতের প্রধান ব্যক্তিরা কি পরিমাণে ভগবানের দ্বারা প্রভাবিত।

গ্যেটে বলেন: "লোকদের কথাবার্তা শুনে ধারণা হয় যেন তাদের মত এই যে অতীতকালের পরে ঈশ্বর মৌনাবলম্বন করেছেন, মানুষকে এখন দাঁড়াতে হবে নিজের পাযের উপরে, তাকে ভাবতে হবে, ভগবান ও তাঁর প্রতিদিনের অদৃশ্য প্রেরণা বাদ দিযে কেমন করে চলা যায। ধর্ম ও নীতিগত ব্যাপারে এখনো ঐশ্বরিক প্রভাবের কথা ভাবা হয, কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে ভাবা হয়, এসব পার্থিব মানুষী শক্তির ফল।

"মানুষী ইচ্ছা ও মানুষী শক্তি দিযে কেউ চেষ্টা করুক মোৎসার্ট বেটোফন অথবা শেকস্‌পীযরের সৃষ্টির সঙ্গে তুলিত হতে পারে এমন কিছু সৃষ্টি করতে। আর শুধু এই তিন মহাপ্রাণই নন, শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যাহীন গুণী এঁদেরই মতো চমৎকার সৃষ্টি করে গেছেন। মোৎসার্ট প্রভৃতির মতো শক্তিসম্পন্ন বলে এঁরাও তাঁদেরই মতো সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক উঁচুস্তরের, আর সেই অনুপাতে দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন।"

তাছাড়া কি অর্থই বা এসব কথার? সেই বিখ্যাত ছয় দিনের সৃষ্টির পরে ভগবান বিশ্রাম নিতে যাননি, বরং তিনি কর্মতৎপর রয়েছেন সেই প্রথম দিনের মতোই। যদি কতকগুলো সাধারণ উপকরণ দিয়ে এই প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টি করে ভগবান একে ছেড়ে দিতেন বৎসরের পর বৎসর সূর্যের কিরণে শুকিয়ে চলতে, এই বস্তুগত ভূমিকার উপরে তাঁর পরিকল্পনা যদি না থাকতো বিশ্বের ভাবুকদের জন্য একটি লালন ক্ষেত্র তৈরির, তবে তা হতো তাঁর পক্ষে অতি অসার কাজ। নিম্নস্তরের লোকদের আকর্ষণ করার জন্য আজো তিনি সদাসক্রিয় রয়েছেন উচ্চতর প্রকৃতির লোকদের মধ্যে।"

(এই কালে অন্য দিনেব আলাপ --একেরমান তারিখ দেননি।) গ্রীকদের নিয়তির ধারণা সম্বন্ধে আলাপ হলো।

গ্যেটে বললেন: "ও চিন্তা দিয়ে আমাদের আর চলবে না; ওটি এখন সেকেলে, আমাদের ধর্মগত ধারণারও বিপরীত। একালের কোনো নাট্যকার যদি তাঁর নাটকে এই প্রাচীন ভাবের অবতারণা করেন তবে ব্যাপারটা হয়ে পড়ে কৃত্রিম। এ বহুকাল পূর্বের পোষাক, রোমান "টোগা"র মতো—আমাদের জন্য বেমানান।

আমরা আধুনিকরা বরং নেপোলিয়নের মতো বলতে পারি—রাজনীতি হচ্ছে নিয়তি! কিন্তু সাবধান, আধুনিকতম সাহিত্যিকদের মতো বলো না যে রাজনীতিই কাব্য অথবা কবির জন্য যোগ্য বিষয়। ইংরেজ কবি টমসন ঋতু সম্বন্ধে চমৎকার কবিতা লিখেছেন কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে লিখেছেন অপাঠ্য কবিতা, তাঁর কবিত্ব লোপ পেয়েছে বলে নয়, বিষযটিতে কবিত্ব নেই বলে।*

যদি কবি রাজনীতি বিষয়ে লিখতে চায় তবে তাকে ভিড়তে হবে কোনো দলে: আর তা করলেই কবি হিসাবে হবে তার মৃত্যু; তার স্বাধীনতা, অপক্ষপাত, এসব বিসর্জন দিতে হবে, আর কান পর্যন্ত টেনে দিতে হবে অযৌক্তিক পক্ষপাত ও অন্ধবিদ্বেষের টুপি।

কবিকে সাধারণ মানুষ ও নাগরিক হিসাবে ভালবাসতে হবে তার দেশকে; কিন্তু তার কবিপ্রতিভা ও কবিকর্মের সত্যকার স্বদেশ হচ্ছে যা উপাদেয যা মহৎ যা সুন্দর, কোনো প্রদেশ বা দেশের দ্বারা । সীমাবদ্ধ নয়, তা সে আত্মসাৎ ও রূপদান করে যেখান থেকে পায়।

* গেটে কিন্তু ফরাসী কবি Beranger-এর রাজনৈতিক কবিতার প্রশংসা করেন, তাঁর লেখায় তিনি পান বাণীর সৌন্দর্য্য ও জনচিত্ত উন্নয়নের ক্ষমতা।

এ ব্যাপারে সে যেন ঈগল, পাখা মেলে ভাসছে দেশ-দেশান্তরের উপরে, তার ভাবনার বিষয় নয় যে-খরগোশের উপরে সে ছোঁ মারলে তা লুকোতে চাচ্ছে প্রাশিয়ায় না সাক্‌সোনি-তে।

তাছাড়া স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, স্বদেশের কাজ, এসব কথার কি অর্থ! যদি কবি সারা জীবন ব্যয় করে থাকে হীন অন্ধতার সঙ্গে সংগ্রামে, সংকীর্ণতা দূর করাব কাজে, দেশের লোকের চিত্তে আলোক সঞ্চারে, রুচির বিকাশে, অনুভূতি ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে, তবে তার চাইতে ভাল আর কি তার দ্বারা সম্ভবপর? তাব চাইতে স্বদেশ-হিতকর আর কিই বা সে করতে পারে?

কবির কাছে এমন অকৃতজ্ঞ ও অযোগ্য দাবি করা যেন সৈন্যদলের নায়ককে বলা, নিজের কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে নতুন নতুন রাজনৈতিক কাজে ব্যাপৃত হয়ে সে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিক। সেনানায়কেব স্বদেশ হচ্ছে তার সৈন্যদল, সে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেবে ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতির সঙ্গে তার যতটুকু যোগ শুধু ততটুকুর কথা ভেবে আর তার অধীনে যেসব সৈন্যদল রয়েছে তাদের রীতিমত কুচকাওয়াজ করিয়ে—যেন স্বদেশের যথার্থ বিপদের দিনে তারা তাদের কর্তব্য সমাধা করতে পারে।

সমস্ত অনধিকার-চর্চাকে আমি জ্ঞান করি পাপের মতো ঘৃণ্য, বিশেষ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা, যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের অনর্থ ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

জানো তুমি আমার সম্বন্ধে কে কি লিখলে সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না বললেই চলে; কিন্তু তবু আমার কানে আসে, জানিও সে-সব, যে, যত পরিশ্রম আমি করেছি সারা জীবন সব কারো কারো বিচারে বৃথা হয়েছে যেহেতু রাজনৈতিক দলে আমি যোগ দিইনি। এসব লোককে খুশী করার জন্যে কোনো অতিঅগ্রসর রাজনৈতিক সঙ্ঘে যোগ দিয়ে আমার প্রচার করা উচিত ছিল—চাই রক্ত চাই শির! কিন্তু এই ঘৃণিত বিষয়ে আর একটি কথাও নয়, নির্বোধদের নিন্দা করে নির্বোধ হতে চাই না।"

এইভাবেই গ্যেটে কবি উলাণ্ডের (Uhland) বহুল-প্রশংসিত রাজনৈতিক কবিতার নিন্দা করলেন।

বললেন: মনে রেখো রাজনীতিক এক্ষেত্রে গ্রাস করবে কবিকে। রাষ্ট্রসমবায়ের সভ্য হওয়া, প্রতিদিনের ধ্বস্তাধ্বস্তি ও

মাতামাতি সহ্য করা কবির সুকুমার ধাতের অনুকূল নয়। থেমে যাবে তাঁর গান—ব্যাপারটা শোচনীয়। সোয়াবিয়ায় (Swabia) রাষ্ট্রসমবায়ের সভ্য হবার মতো সুশিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও বলবার কইবার ক্ষমতা অনেকের আছে, কিন্তু উলাণ্ডের মতো কবি আছে মাত্র একজন।

আরো কয়েকটি বাণী

প্রধানত লুডভিগের "গ্যেটের বচনাবলী" ও পল কেবাসের গেট্যে-চরিত থেকে আমরা কবির আরো কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করছি।

ঈশ্বরে যার নির্ভর
শক্ত তার ঘরের ভিত।

যে যেমন,
তেম্‌নি তার ঈশ্বর।
সেই জন্যই ঈশ্বর
বহু সময়ে অদ্ভুত।

সন্দেহ !
দাও আমাকে শান্তিতে থাকতে অথবা দাও আমাকে আরো জ্ঞান।

তাবার মতো—
নেইক ত্বরা, নেইক বিরাম,
প্রত্যেকে লাগুক আপন কাজে,
খাটুক সাধ্যমত।

গোঁড়া ধর্মমত অনুসারে যে ভাবা হতো, ঈশ্বর ক্রোধী, ঈর্ষাপরায়ণ, অবিবেচক, পক্ষপাতপ্রিয়, এর চাইতে বড় অধর্ম আর নেই।

যাকে কুসংস্কার বলা হয় অবিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশী গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবের উপরে তার প্রতিষ্ঠা।

(শোপেনহাউয়র-এর প্রতি)
চাও অপরে স্বীকার করুক তোমার মূল্য ?
তবে দাও জগৎকে এমন কিছু আছে যার মূল্য।

জীবন আর জীবনের ভার খুশী মনেই বহন করা যেতো
যদি ছাত্ররা গুরু সাজতে না চাইত আর একটু বয়স না হওয়া পর্যন্ত।

এক সময়ে গ্যেটে একটি কবিতায় লিখেছিলেন ;

অনন্ত স্পন্দিত হচ্ছে সবার মধ্যে
পড়তে হবে সবাইকে নাস্তিতে
যদি চাও চিরজীবন।

পণ্ডিতেরা ভাবলেন গ্যেটে নির্বাণ-মুক্তির কথা বলছেন। তাঁদের ভুল ভাঙবার জন্যে তিনি অপর একটি কবিতায় লিখলেন :

কেউ পড়তে পারে না নাস্তিতে,
অনন্ত বাস করে প্রত্যেকের মধ্যে।
ধন্য হও তাই সত্তায় !
সত্তা চিরন্তন, নির্ধারিত ধারা
রক্ষা করে এর চিরজীবন্ত সম্পদ,
তাতেই বিশ্বের মহিমময় রূপায়ণ।

কবি ও শিল্পীরূপে আমি বহুদেববাদী, প্রকৃতিবিদ্‌রূপে সর্বব্রহ্মবাদী, আর যেমন নিঃসংশয়ে একটি তেমনি অন্যটি। নৈতিক চেতনার জন্যে যদি ব্যক্তিগত জীবনে আমার প্রয়োজন হয়ে থাকে ঈশ্বরের তবে তাতেও আমার বঞ্চিত না হবার কথা। স্বর্গের ও মর্ত্যের ব্যাপারগুলো এমন বহুবিস্তৃত যে সবটা স্পর্শ করতে হলে চাই একসঙ্গে সব রকমের চেষ্টা।

যে বোঝে তার সৃজনী-শক্তি আছে তাকে হতে হবে জনসাধারণের জন্য যন্ত্রণাবিশেষ। সে বসে' থাকবে না কখন তার ডাক পড়বে সেই আশায়, বিদায় দিলেও নেবে না বিদায়। সে হবে ডাঁসের মতো, একদিক থেকে তাড়া খেয়ে অন্যদিকে করবে আক্রমণ—হোমর তাঁর

বীরদের এই গুণের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতি এমন দোষ আমাদের দেয় নি যা না হতে পারে গুণ, এমন গুণ দেয়নি যা না হতে পারে দোষ। আর গুণগুলোই হচ্ছে বেশী মারাত্মক।

সুন্দরীর হলো সুন্দরী কন্যা
প্রতিভাবানের হলো নির্বোধ পুত্র;
সুন্দরীর বংশ হলো রক্ষা,
কিন্তু প্রতিভাবানের রইল না বংশ।
কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে
প্রতিভাবানের জন্ম হয় মাটি থেকে;
তাই আবার জন্ম হলো প্রতিভাবানের, চললো যে শ্রম করে,
আর পেলো তার পুরস্কারস্বরূপ সুন্দরীকে,
তাতে পেলো সে তার যৌবন

গ্যেটের স্মৃতি রক্ষায় পড়বে কত খরচ?
জিজ্ঞাসা করছে নর জিজ্ঞাসা করছে নারী।
যদি নিজে না পারতাম নিজেকে গড়ে তুলতে,
তবে কেমন করে রক্ষা হতো স্মৃতি?

যারা বড় তাদের সব ক্ষমতাই বড়; সাধারণ লোকের যে সব দোষ গুণ থাকে তাদেরও সেই সব থাকে—আরো বেশী পরিমাণে। দোষগুণের অনুপাত হয়ত একই রকমের।

কোনো সখের গুণী সত্যকার গুণীকে চিনতে পারে না। তাঁর ক্ষমতা তাদের মনে হয় আত্মম্ভরিতা।

"তোমার যৌবন রক্ষা করে চলেছ: কেমন করে?"
ভালবাস যা মহৎ, তাহলে পারবে তুমিও।
মহত্ত্ব আনে জীবন, উদ্দীপনা, স্বাস্থ্য,—
ক্ষুদ্রতায় হিম ধরে মরে ক্ষুদ্র জীব।

শত্রুর গুণপনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—
মানুষের জন্ম এর চাইতে বড় লাভ নেই।

জটিলতা না থাকলে চারিত্রশক্তি বলতে যা বোঝায় তা লাভ হতে পারে না : বহু ধরণের গুণের ফলে তবে মানুষ হয় মানুষ।

মহা সঙ্কট মানুষকে করে উন্নত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কট তাকে করে শিথিল।

অবশ্যকর্তব্যের দাবি নিষ্ঠুর, কিন্তু তা স্বীকার করে নেওয়াতেই মানুষের সত্যকার পরিচয়। খেয়াল-খুশী মতো চলবার জন্য শক্তির দরকার নেই।

আমার জন্য উৎসব নয়! চাইনা ওসব :
রাত্রি আনে খাটুনি থেকে বিশ্রাম আর যথেষ্ট শান্তি।
মনের মতো কাজ খাঁটি লোকের উৎসব।

ধৈর্য, আশা, বিশ্বাস, প্রেম, এসবই কর্মক্ষেত্রের বিচার-বুদ্ধি : এসব বিচার-বুদ্ধির ব্যবহারিক দিক।

এই বিখ্যাত উপদেশ "নিজেকে জানো" শুনতে এত ভাল হলেও চিরদিন আমার মনে জাগিয়াছে সন্দেহ : মনে হয়েছে এ যাজক-সমাজের এক ফন্দীবাজী—ওরা মানুষকে চলেছে ঠকিয়ে তাদের কানে অসম্ভব সব মন্ত্র দিয়ে, মানুষের মুখ কর্মময় জীবন থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আত্মার-রহস্য-চিন্তারূপ নিষ্ফল ভাবনার দিকে। মানুষ যতটা জগৎকে জানে ততটাই জানে নিজেকে, এর একটি সম্বন্ধে তার জ্ঞান আসে অন্যটির সাহায্যে। নতুন বস্তু ভাল করে' দেখার ফলে আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় নতুন ইন্দ্রিয়।

এমন অতীত নেই যা ফিরে পাবার কামনা আমরা করতে পারি, আছে কেবল চিরনূতন জীবন, বিকাশের ধারায় রূপলাভ করে চলেছে; আমাদের কামনা হবে সৃষ্টিধর্মী, সৃষ্টি করে চলবে সুকুমারতর কিছু।

চিরদিনের সত্য এই: সংকীর্ণ করতে হবে নিজের পরিধি, সর্ব্বান্তঃকরণে চাইতে হবে একটি বস্তু—সামান্য কয়েকটি বস্তু—তাদের বাসতে হবে ভাল, ব্যবহার করতে হবে পুরোপুরি, এক হয়ে যেতে হবে তাদের সঙ্গে—এমনি করেই সৃষ্টি হয় কবির, শিল্পীর, মানুষের।

একজনকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারলেই যথেষ্ট, তখন সবাইকে মনে হবে প্রীতির যোগ্য। প্রশংসা ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও একথা খাটে। জগতে কত প্রশংসার সামগ্রী আছে সে কথা আমরা বুঝি যখন একজনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রশংসা করতে পেরেছি।

সত্য ভিন্ন আর কিছুই বড় নয়, অতি ছোট যে সত্য তাও বড়। যে সত্যের দ্বারা ক্ষতি হয় তাও ভাল: ক্ষতি তার দ্বারা হতে পারে অল্পক্ষণের জন্য কিন্তু তার পরই সে সত্য নিয়ে যায় এমন সব সত্যে যাতে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে, হয়ত আরো বেশী প্রয়োজন সে-সবে। পক্ষান্তরে প্রয়োজনীয় হলেও ভুল অনিষ্টকর, কেননা সেই প্রয়োজনের দাবি মেটে শীগগির কিন্তু ভুল নিয়ে যায় আরো ভুলের দিকে, করে আরো ক্ষতি। অবশ্য মানুষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা বলছি।

নেপোলিয়নের মতো অ-সাধারণ লোক নৈতিক গণ্ডীর বাইরে। তাঁদের কাজ প্রকৃতির মতো—আগুন জল প্রভৃতির মতো।

কোনো দোষারোপ নয়, যা হয়ে গেছে, বদলানো যাবে না তা নিয়ে কোনো ভর্ৎসনা নয়। প্রতিটি দিন হোক স্বয়ংপূর্ণ: কেমন করে মানুষ আদৌ বাঁচতে পারে যদি প্রতি রাত্রে সে সম্পূর্ণ ক্ষমা না করে নিজেকে, সব মানুষকে?

মানুষের সম্বল পরিমিত, বুদ্ধি আরো পরিমিত, কাজেই কারো সঙ্গে বা সাহায্যে কাজ করার বেলায় তাদের কাছ থেকে আমাদের আশা করতে হবে যথাসম্ভব কম।

স্বদেশপ্রেম ইতিহাসের সর্ব্বনাশ করে। ইহুদি গ্রীক ও

রোমানরা সব ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে না শিখিয়ে তাদের নিজেদের দেশের ও অন্যান্য জাতির ক্ষতি করেছে। জার্মানরাও তাই করছে।

কখনো কখনো মানুষ পড়ে অধৈর্যের হাতে অথচ তারা বলে তারা পড়েছে দুর্দৈবের হাতে।

আমরা ক্ষমতা চাই কেননা আমরা মানুষ—ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে নিজের রুচি অনুযায়ী বিনা বাধায় কাজ করতে পারা আর জীবন উপভোগ করা। অমার্জিত প্রকৃতির লোকেরা এটি পেতে চেষ্টা করে বলের দ্বারা, মার্জিত প্রকৃতির লোকেরা স্বাধীনতার দ্বারা।

রাজা অথবা শাসক তাঁর রাজ্যের খবর সব চাইতে কম পান তখন যখন তিনি তৎপর হন তা নিজে সংগ্রহ করতে।

অক্ষম ঘৃণা সব চাইতে মারাত্মক উত্তেজনা। যাকে নষ্ট করতে পারবো না তাকে যেন কখনো ঘৃণা না করি।

শিষ্যদল তৈরী করার অর্থ বিপক্ষদল তৈরি করা।

রাজনীতিকরা রোগীর মতো, কেবল এপাশ ওপাশ করছে, আরামের অবস্থায় যদি শেষে পৌছুতে পারে এই আশায়।

মানুষ কখন পুরো অকেজো ?
যখন হুকুম দেবার পুরো ক্ষমতা তার নেই, তা মানবার ক্ষমতাও নেই।

প্রত্যেক আইন অসম্ভবের সমন্বয়, যেমন বিবাহ-প্রথা। কিন্তু ভাল এটি, কেননা অসম্ভবের সাধন করতে গিয়ে আমরা পাই শ্রেষ্ঠ সম্ভবপরকে।

ঈশ্বর সব সময়ে সাক্ষাৎ করছেন নিজের সঙ্গে। মানুষের ভিতরে যে ঈশ্বর আছেন তিনিও নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন

মানুষের মধ্যে। সেজন্য তুচ্ছতম যে ব্যক্তি তারও প্রয়োজন নেই শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে হেয় জ্ঞান করা। বিশ্বের মহত্তম পুরুষ যদি পড়েন জলে আর অপারগ হন সাঁতার কাটতে তখন গ্রামের তুচ্ছতম চাষী তাঁকে তুলতে পারে ডাঙায়। এই জগৎ এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে গঠিত যে প্রত্যেক মানুষ তার স্থানে ও তার কালে সবার চাইতে বড়।

যে চায় জগতের জন্য কিছু করতে তাকে থাকতে হবে জগৎ থেকে দূরে।

কেবল শিল্পের সৃষ্টি আমাদের শিক্ষা দিতে পারে ধ্যান। আমাদের সমসাময়িক কালের বড় বড় ঘটনা ও ব্যাপার উদ্রেক করে চলে আমাদের ঘৃণা অথবা সমাদর, সহানুভূতি অথবা বিরূপতা, সমর্থন অথবা প্রতিবাদ, কেবল শিল্পের দর্পণে আমরা প্রতিফলিত দেখি ধ্যান, স্থৈর্য আর আলম্বন।

ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড

ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড গ্যেটের সর্বশেষ গ্রন্থ। এর কোনো কোনো অংশ, যেমন প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ও হেলেনা-অঙ্কের অনেকখানি, প্রথম খণ্ডের যুগে রচিত হয়েছিল, কিন্তু মোটের উপর এর রচনা-কাল গ্যেটের জীবনের শেষ ছয় সাত বৎসর। এটি লেখা শেষ ক'রে কবি তাঁর দ্ব্যশীতিতম জন্মদিনে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) সিল করে' রাখেন, উদ্দেশ্য তাঁর মৃত্যুর পরে এটি প্রকাশিত হবে। তাঁর সমসাময়িকরা, বিশেষ করে' নবীন সাহিত্যিকরা, তাঁকে বুঝবে না আর না বুঝে অর্থহীন সমালোচনা করে' তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করবে, এই বিবেচনা থেকে তিনি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর অনুমান মিথ্যা হয়নি। এটি যে বৃদ্ধ কবির অক্ষম রচনা এই মত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়েছিল। লুইসও এটিকে বলেছেন দুর্বল রচনা। কিন্তু পরে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রাণ্ডেস ও ফান ডের স্মিশেন এটিকে বলেছেন শিল্পসৃষ্টি হিসাবে গ্যেটের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বেয়ার্ড টেইলর এটিকে নাট্যকাব্য হিসাবে প্রথমখণ্ডের সঙ্গে তুলনায় দুর্বলতর বলেছেন, কিন্তু মনস্বিতার দিক দিয়ে এটিকে বলেছেন মহত্তর—এর

সুনিপুণ পরিকল্পনা, চিত্র-সম্ভার, ছন্দের অপরিসীম বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য তাঁর সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ক্রোচে এর প্রশংসায় খুব উচ্ছ্বসিত নন, তবে এটিকে তিনি বৃদ্ধ কবির অক্ষম রচনা জ্ঞান করেননি আদৌ, এতে মাঝে মাঝে যে বুদ্ধির দীপ্তি ও জ্ঞানবত্তা প্রকাশ পেয়েছে তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন; এটিকে তিনি জ্ঞান করেছেন এক অনুপম কবি ও মনস্বী-জীবনের সমৃদ্ধ সমাপ্তি—এক বিপুল অগ্নিকাণ্ডের শেষ স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি।

ফাউস্‌ট প্রথম খণ্ডের তুলনায় ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড দুর্বোধ্য, মিথ্যা নয়। বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী ও রূপক কবি যে এতে ব্যবহার করেছেন তাতেই এর দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রোচে এটিকে বলেছেন প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক স্বতন্ত্র কাব্য। গ্যেটে নিজে বলেছেন: ফাউস্‌ট প্রথম খণ্ড মোটের উপর আত্মকেন্দ্রিক ;...কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের জগৎ বিস্তীর্ণতর, পরিচ্ছন্নতর; সংসার সম্বন্ধে যার কিছু অভিজ্ঞতা না হয়েছে তার পক্ষে এটি বোঝা কঠিন হবে।......ফাউস্‌টে যে সমৃদ্ধ বহুবর্ণ বহুবিচিত্র জীবনের সমাবেশ ঘটেছে তা একটিমাত্র ভাবসূত্রের দ্বারা বিধৃত মনে করলে ভুল করা হবে।

ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের সাতটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য—এক রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ; কাল প্রদোষ; ফাউস্‌ট শায়িত পুষ্পিত শষ্পদলে, সে পরিশ্রান্ত, অস্থির, নিদ্রালোলুপ; তার মাথার উপরে ঘুরছে সুন্দর ক্ষুদ্রদেহ দেবযোনিগণ। প্রথমে দেবযোনিদের নেতা এরিয়েলের গান; সে গাইছে নব বসন্তের নব জীবনের গান আর তার সঙ্গী দেবযোনিদের আদেশ করছে এই নব বসন্তের কালে ফাউস্‌টের চিত্তদাহ প্রশমিত করতে, তার অন্তরে-প্রবিষ্ট সমস্ত অনুশোচনা-সায়ক উন্মুলিত করতে—বিস্মৃতি ও নিদ্রার সাহায্যে তাকে সবল করে' নব আলোকের দেশে উদ্বোধিত করতে। এর পর পালাক্রমে দেবযোনিদের গান। প্রথম দল গাইলে সন্ধ্যার কর্মবিরতি ও শান্তির গান, দ্বিতীয় দল গাইলে নিশীথের তারকিত আকাশ ও পূর্ণচন্দ্রের মহিমার গান, তৃতীয় দল গাইলে সুনিদ্রার পর নবশক্তি লাভের গান ও অরুণোদয়ের পূর্বে পর্বতমালার ও উপত্যকার নবসৌন্দর্যে বিভূষিত হবার গান, আর চতুর্থ দল গাইলে সূর্যের প্রকাশ-ক্ষণের গান—সেই প্রকাশক্ষণের মতো হোক জীবনের প্রকাশ:

অনন্ত আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা চাও—
তবে তাকাও পূব-গগনের ঐ অরুণছটার পানে!
তোমার জীবন ঘিরে আছে যে আবরণ তা ক্ষীণ—
নিদ্রার খোসা ভেঙে ফেলে এসো বেরিয়ে!

দিশাহারা জনারণ্যে
আনো ক্ষিপ্র সাহস !
চিরসফল সেই মহৎপ্রাণ
যার চিন্তা তীক্ষ্ণ কর্ম ত্বরিত।

এর পরে সূর্য প্রকাশিত হলো—কবি সেই প্রকাশ-ক্ষণকে বলেছেন মহাকোলাহলময়। এরিয়েল এই মহাঔজ্জ্বল্যময় প্রকাশের মহিমা গান করলে।

ফাউস্ট জেগে উঠলো—সর্বদেহে সে অনুভব করলে নব প্রাণ। তার দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে প্রকাশ পেল তার নব স্ফূর্তি, প্রভাত-আলোর বর্ণবৈচিত্র্য, পর্বতের শীর্ষে শীর্ষে উপত্যকায় উপত্যকায় বিচিত্র শোভা-সমারোহ। তার সেই উক্তির কয়েকটি চরণ এই :

······ওগো ধরিত্রী······
······জাগিয়েছ আমাতে মহৎ আকাঙ্ক্ষা
অস্তিত্বের শিখরাভিসারী হবার জন্যে।

ঝরণার ও কুয়াশার বর্ণনা কবি দিয়েছেন এইভাবে :

লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে, গভীর নীচে,
নামছে ঝরণা সহস্র ধারায়।
···তার উপরিভাগে সঞ্চালিত হচ্ছে উৎক্ষিপ্ত শিকর।
ঐ দেখ সেই সঞ্চালিত শিকর-দলে ফুটে উঠ্‌লো
বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্র ধনু ;
এই শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বলভাবে, এই যাচ্ছে মিলিয়ে,—
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে শিকরের স্নিগ্ধতা।
মানুষের প্রয়াস প্রতিবিম্বিত এতে—তার শ্রম ও সংগ্রাম।
যত ভাববে বুঝবে এই প্রতীককে যথার্থ বলে :
জীবন এম্‌নি আলোর প্রতিবিম্বিত মহিমা। *

* তুলনীয় :

Life like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity,

—শেলী।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সম্রাটের দরবার।

সম্রাটের ভাঁড়ের মৃত্যু হয়েছে, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মেফিস্টোফিলিস। এই দৃশ্যে কবি দেখিয়েছেন কুশাসন ও অরাজকতার ছবি। "আলাপে" তিনি ব'লেছেন :

> সম্রাটে দেখানো হয়েছে এমন এক শাসকের ছবি যাঁতে রাজ্য হারাবার সব গুণ বর্তমান, শেষে তিনি রাজ্য বাস্তবিকই হারাচ্ছেন। রাজ্যের ভাল ও প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, তাঁর খেয়াল শুধু আমোদ-প্রমোদের দিকে। রাজ্যে আইনের মর্যাদা নেই, সুবিচার লোপ পেয়েছে, বিচারকদের যোগ ঘটেছে অপরাধীদের সঙ্গে, ভয়ঙ্কর অপরাধও শাস্তি এড়িয়ে যায়। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, তারা বেতন পায় না। রাজকোষে অর্থ নেই···রাজার পারিবারিক জীবনেও সুবন্দোবস্তের অভাব। রাজসভাসদরা রাজ্যের অভাব অভিযোগ সম্রাটের গোচরে আনতে চেষ্টিত, কিন্তু মহামহিম সম্রাটের সময় নেই সে-সব কথায় কান দেবার, তিনি চান আমোদ।

এই অবস্থা মেফিস্টোর কৃতিত্ব প্রদর্শনের অনুকূল। রাজ্যের অর্থের অভাব মোচনের সম্বন্ধে সে বললে: মাটির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে স্বর্ণ, মনস্বী ও প্রকৃতির রহস্যবিদ্ মানুষ সেই স্বর্ণের সন্ধান দিতে পারে। এ প্রস্তাবে রাজ্যের প্রধান ধর্ম-নেতা আপত্তি করলেন তাঁর মতে প্রকৃতি পাপ আর মন শয়তান। ভাঁড়রূপী মেফিস্টো তখন বললে :

> এই থেকেই বুঝতে পারছি আপনারা মহাপণ্ডিত,
> আপনারা যার নাগাল পান না তা সুদূরপরাহত :
> যা করায়ত্ত করতে পারেন না, ভাবেন, তা মিথ্যা ;
> যা মূল্যবান্ জ্ঞান করেন না, তার কি আর মূল্য আছে !
> আপনাদের দ্বারা যার চলন হয়নি, ভাবেন, নিশ্চয় তা অচল।

রাজসভাসদদের চালচলন ও বুদ্ধি দেখে এই দৃশ্যের শেষে মেফিস্টো বলছে :

> ভাগ্য আর গুণপনা কত পরস্পরসম্বন্ধ
> সে কথা কখনো ভাবে না এই নির্বোধের দল :
> এদের যদি পরশপাথরও লাভ হতো
> তবে তাই নিয়ে এরা খুশী থাকতো,
> সন্ধান করতো না যে জানে তার প্রয়োগ তাকে।

তৃতীয় দৃশ্য—বিস্তীর্ণ হল, তার আশেপাশে নানা কক্ষ।

এই সব কক্ষ উৎসবের জন্য সজ্জিত হয়েছে, এই উৎসব দেখবার জন্য সম্রাট উদ্‌গ্রীব —ফাউস্ট এই উৎসবের আযোজন করছে।

এই দৃশ্যে নানা সঙের অবতারণা হয়েছে, সে-সবের সাহায্যে কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন মানুষের বিচিত্র ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ছবি।

প্রথমে এলো উদ্যান-ললনারা আর মালীরা। তারা যেন আদিম যুগের নরনারী,—প্রকৃতির ঋজুতা, সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতীক। এই উদ্যান-ললনাদের গানের একটি কলি এই :

চারু আমরা রূপ-লাবণ্যে
উদ্যান-ললনা, রসিকা ;
নারীতে যা স্বাভাবিক
শিল্পের তা নিকটবর্তী।

তারপর এলো মা ও মেয়ে—মেয়ের বর জুটছে না দেখে মা চিন্তিত ; অর্থাৎ জীবন আরো একটু জটিল হয়েছে যে অবস্থায় এরা তার প্রতীক। তারপর এলো জেলে, কাঠুরিয়া, মাতাল, প্রভৃতি—সমাজে যে ক্রমে ক্রমে নানা শ্রেণী ও নানা উৎপাত দেখা দিচ্ছে তার ছবি এরা।

তারপর কবি অবতারণা করেছেন কতিপয় গ্রীক পৌরাণিক চিত্রের—সমাজ সভ্যতায় পদার্পণ করে' যে শৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্য অর্জন করেছে তার প্রতীক এরা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীরা (Graces) হচ্ছে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও শোভার প্রতিমূর্তি—তাদের দিকে মানুষের দৃষ্টি রাখা চাইই ; ভাগ্যলক্ষ্মীরা (Fates) হচ্ছে বিধি-নিষেধের, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার, প্রতীক ; আর যাদের প্রতিহিংসার দেবতা (Furies) বলা হতো তাদের এখানে দেখানো হয়েছে অপরাধপ্রবণতা, অসংযম, অসূয়া ইত্যাদি সমাজ-সংহতি-বিরোধী শক্তিরূপে। এদের শাসনে রাখা চাই—তাই কবি এদের পরে অবতারণা করেছেন এক বিরাট জীবের শোভাযাত্রা, এই বিরাট জীব হচ্ছে রাষ্ট্র ; তার পরিচালক হচ্ছে সদ্‌বিবেচনা, তার দুই পাশে শৃঙ্খলিত উদ্দাম আশা আর অহেতুক ভয় (এই দুইই রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের পরিপন্থী), এই বিরাট জীবের উপরে সমাসীন মহিমান্বিত বিজয়া (Victoria)—সমস্ত কর্মোদ্যমের উৎস। এই বিরাট জীবের আশে পাশে চলেছে নিন্দুক-চূড়ামণি—জনজীবনে যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সময় সময় প্রকট হয়ে জনজীবনকে বিকৃত করে সে তার প্রতিমূর্তি।

তারপর এলো ড্রাগন-বাহিত রথ। সেই রথে একজন বালক-সারথি—প্রকৃতিতে চঞ্চল; এর রথী যিনি তিনি মহাঐশ্বর্যশালী, আর রথের চূড়ায় লোভবেশী মেফিস্‌টো। বালক-সারথি হচ্ছে কবিত্বের মূর্তি, রথী হচ্ছে রাজ-ঐশ্বর্য। টীকাকারেরা বলেছেন—বালক-সারথি কবি নিজে। † রথী সম্বন্ধে বালক-সারথি এই প্রশস্তি নিবেদন করছে:

এঁকে দেখেই মনে হয় রাজা, প্রভাময় ও করুণাময়;
ভাগ্যবান্ তারা যারা এঁর হাত থেকে লাভ করে অনুগ্রহ।
প্রয়োজন নেই এঁর উপার্জনের অথবা কাড়াকাড়ির;
দৃষ্টিমাত্রে বোঝেন তিনি কোথায় কোন্ অভিযোগ,
পূর্ণ আনন্দ এঁর দানে—
সম্পদ অথবা সুখের অধিকারী হবার চাইতে।

এই রথী যে ডিউক কার্ল আউগুস্‌ট আলাপ থেকে তা আমরা জানি।

বালক-সারথির শক্তিতে, অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের গৌরবে রাজসম্পদ যে আরো মহিমময় হয়েছে রথী সে-কথা বলছেন। কিন্তু শেষে তিনি বালক-সারথিকে বলছেন:

এখন সম্পূর্ণ মুক্ত তুমি, যাও তোমার আপন জগতে।
সে জগৎ এখানে নয়। বিপর্যস্ত উদ্দাম অদ্ভুত
আমাদের এখানকার বিচিত্র জগৎ।
যেখানে দৃষ্টি তোমার শান্ত নির্মল,
একেশ্বর তুমি, নির্ভর কর কেবল নিজের ’পরে,
যেখানে শিব ও সুন্দরের রাজত্ব,
সেই নির্জনতায় সৃষ্টি কর আপন জগৎ।

কবি ও ডিউকের পরস্পরের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা এইভাবে স্মরণীয় সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে।

এর পর রথী উন্মোচিত করছেন তাঁর সিন্ধুক। সিন্ধুক থেকে নির্গত স্বর্ণধারা দেখে জনগণ মহা উৎফুল্ল। তারপর সেই স্বর্ণধারা হলো আগুনের ধারা। এ সবই অবশ্য ভোজবাজি। জনগণ আগুন দেখে চারদিকে ছুটে পালাতে লাগলো। এই সব ও এর পর আরো কয়েকটি দৃশ্যের সাহায্যে কবি দেখাতে চেয়েছেন: রাজ্যের সম্পদ সাধারণত জনগণের সত্যকার উৎকর্ষ তেমন সাধন করে না যেমন তাদের মধ্যে এনে দেয় ধনলোভ ও মত্ততা, আর শেষে ঘটায় বিপ্লব। এই সব বর্ণনার মধ্যে এই চার ছত্র বিখ্যাত:

† "আলাপে" গ্যেটে কিন্তু বালক-সারথিকে বলেছেন ইউফোরিয়ন—সে ব্যক্তি নয়, ভাবমূর্তি—নব-কবিত্বের প্রতীক। ইউফোরিয়নের পরিচয় আমরা হেলেনা-অঙ্কে পাব।

ওগো তরুণ, ওগো তরুণ, কোনোদিন কি
সুখের বাসনা তোমার হবে না সংযমিত ?
ওগো রাজ-অধিরাজ, কোনো দিন কি
বিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করবে না তোমার সীমাহীন ক্ষমতা ?

চতুর্থ দৃশ্য—প্রমোদ-উদ্যান।

মেফিস্‌টো ও ফাউস্‌টের পরামর্শে নোট-প্রচলনের ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সবার অসন্তোষ দূর হয়েছে। কিন্তু এই সমৃদ্ধি তাদের মনে সত্যকার জাতীয় কল্যাণের প্রেরণা দিচ্ছে না, বরং এতে সবাই হয়ে উঠেছে ভোগপ্রিয়।

পঞ্চম দৃশ্য—অন্ধকার অলিন্দ।

ফাউস্‌ট ও মেফিস্‌টোর মধ্যে কথা হচ্ছে। ফাউস্‌ট বলছে রাজ-দরবারের সবাই আরো কিছু দেখাবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করছে, সম্রাট অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন যে তিনি প্রাচীন কালের হেলেনা ও প্যারিসকে দেখবেন। এ সবে মেফিস্‌টোর সাহায্য তার চাই।

মেফিস্‌টো আপত্তি করে বলছে—এমন না ভেবে চিন্তে রাজি হওয়া তার খুব অন্যায় হয়েছে। শেষে সে বললে: প্রকৃতিপন্থী গ্রীকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, তারা অন্য জগতের, তবে এই মাত্র সে বলতে পারে এজন্য ফাউস্‌টকে যেতে হবে পরমস্তব্ধ মাতৃদেবীদের জগতে। মাতৃদেবীদের নামে ফাউস্‌টের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। সে জানতে চাইলে কেমন করে' যাওয়া যাবে সেই দেশে। মেফিস্‌টো বললে, কোনো পথ নেই সে দেশে যাবার, ফাউস্‌টের যাত্রা হবে অনন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে, ধরা ছোঁয়া যায় এমন কিছুই নেই সেখানে—সে এক মহাশূন্য মহা 'নাস্তি'। ফাউস্‌ট বললে, মেফিস্‌টোর মহা 'নাস্তি' হয়ত তার জন্য হবে মহা 'অস্তি'। তার এ কথায় মেফিস্‌টো তার প্রশংসা করলে ও তাকে এক চাবি দিলে। ফাউস্‌ট বিস্মিত হয়ে বললে: এই সামান্য বস্তু! মেফিস্‌টো বললে: একে স্বল্পমূল্য মনে করো না, এর মূল্য শীগগিরই বুঝবে, এই চাবি তোমাকে সন্ধান দেবে আসল পথের, এর অনুগামী হয়ে যেতে পারবে মাতৃদেবীদের স্থানে। মাতৃদেবীদের কথায় সে তেম্‌নি ভয়চকিত হলো। মেফিস্‌টো বললে: নতুনের সাম্‌নে অমন বিচলিত হওয়া ফাউস্‌টের শোভা পায় না। ফাউস্‌ট তখন বললে:

নিষ্ক্রিয়তায় নেই আমার কোনো কল্যাণ:
ভয়ের শিহরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ;

যতই জগৎ অনুভূতিকে মহার্ঘ করুক,
ভয়ের কবলেই মানুষ অনুভব করে বিরাটকে।

চাবি হাতে নিয়ে ফাউস্ট এক নব প্রেরণা বোধ করলে। মেফিস্টো তাকে বললে: যেতে যেতে অবশেষে অতি গভীরে সে দেখতে পাবে এক উজ্জ্বল ত্রিপাদ-পাত্র, তার আলোকে দেখবে মাতৃদেবীদের, তাঁদের কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটছেন, যেমন খুশী; সংঘটন, পরিবর্তন, অনন্ত মনের অনন্ত বিনোদন, সমস্ত জীবের রূপ লীলাচ্ছলে ভাসছে সেখানে। মাতৃদেবীরা ফাউস্টকে দেখতে পাবেন না কেননা তাঁরা দেখেন মাত্র প্রেতমূর্তি। সাহসে ভর করে চাবি ছোঁয়াতে হবে সেই ত্রিপাদ-পাত্রে।

ফাউস্টের মধ্যে এখন আরো আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে; তার তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখে মেফিস্টো বললে: হাঁ ঠিক হয়েছে, এই ত্রিপাদ-পাত্র হবে তোমার অনুগত, ভাগ্যবলে উঠে আসবে তুমি মাতৃদেবীরা না জানতেই। এসে ত্রিপাদ-পাত্রের সাহায্যে দেখাতে পারবে হেলেনা ও প্যারিসকে।

চাবি হাতে নিয়ে মাটিতে পদাঘাত করে' ফাউস্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই দৃশ্যের রূপক সম্বন্ধে টীকাকারদের বক্তব্য মোটের উপর এই: মাতৃ-দেবীরা হচ্ছেন সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সমস্ত ধারণা কারণ প্রেরণা তাঁদের সেই রহস্যময় জগতে লীন হয়ে আছে, দেশে কালে সে সব রূপ লাভ করে; (অতি প্রাচীন কালে গ্রীসে মাতৃদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল); ত্রিপাদ-পাত্র হচ্ছে গভীরতম জ্ঞানবত্তা; আর চাবি হচ্ছে স্বজ্ঞা বা সহজ-অনুভূতি (Intuition), হেলেনা ও প্যারিস হচ্ছে নারী ও নরের সৌন্দর্যের পূর্ণ মূর্তি—গ্রীক শিল্পে তাদের প্রকাশ। সেই সৌন্দর্যের আদর্শ যদি ফাউস্ট (অর্থাৎ কবি) লোকের চক্ষুগোচর করাতে চায় তবে তাকে প্রবেশ করতে হবে সীমাহীন ভাব-জগতে, আর নিজের অন্তরতম সত্তায় অনুভব করতে হবে যেসব ভাবনা থেকে এই শিল্পের অভ্যুদয় ঘটেছিল সেই সব। প্রাচীন শিল্পের গভীর অনুধ্যান আর এক অসাধারণ সহজ-সৌন্দর্যবোধ এই দুয়ের সাহায্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর।—এমন দুস্তর সাধনার সামনে ভীত হওয়া ফাউস্টের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে এ পথে কিছু অগ্রসর হয়েই সে বল লাভ করলে।

আলাপে গ্যেটে বলেছেন: অন্যান্য জাতির শিল্পের সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হতে হবে, কিন্তু সর্বকালের জন্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদা গ্রীক শিল্পের।

ষষ্ঠ দৃশ্য—উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠসমূহ, দরবার চলেছে।

রাজসভাসদ্‌রা ব্যস্ত তামাসা দেখবার জন্যে। মেফিস্টোকে তাঁরা তাগিদ দিচ্ছেন। মেফিস্টো বললে, তার সঙ্গী এর জন্য খেটে চলেছে:

…গোপন সাধনায় তাকে আয়ত্ত করতে হচ্ছে মন্ত্র,
করতে হচ্ছে প্রাণপণ শ্রম ;
যে মানুষের সামনে তুলে ধরতে চায় সুন্দরকে
তাকে আয়ত্ত করতে হয় শ্রেষ্ঠ কৌশল, মহাজ্ঞানীর জাদু।

কিন্তু ফাউস্‌টের এই প্রাণঢালা সাধনা রাজসভাসদদের গণনার বস্তু নয়, তাঁরা চান স্ফূর্তি। মেফিস্‌টোকে রাজসভার সুন্দরীরা কেউ বলছেন তাঁর গায়ের চামড়া আরো মসৃণ করে' দিতে, কেউ বলছেন তাঁর পায়ের জড়তা দূর করে' দিতে যাতে তিনি ভাল করে' হাঁটতে আর নাচতে পাবেন, কেউ বলছেন তাঁর ভেগে-যাওয়া প্রেমিককে পুনরায় বশ করবার উপায় বলে' দিতে। মেফিস্‌টো তার অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে এসব কথার উত্তর দিলে। এই সম্পর্কে "সমে সঙ্গে" তত্ত্বের প্রচারক হানেমানের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সপ্তম দৃশ্য—সামন্তদের অভ্যর্থনা-গৃহ—অনুজ্জ্বল ; সম্রাট ও রাজসভা সমাসীন।

ফাউস্‌টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে হেলেনা ও প্যারিসকে দেখাবার আয়োজন হয়েছে। রাজ-জ্যোতিষী নাটমঞ্চে উঠে তার বক্তৃতার দ্বারা সভার মন তৈরী করে নিচ্ছে কেননা তার মতে যা অসম্ভব তা সম্ভব করতে হয় বিশ্বাসের দ্বারা।

নাটমঞ্চের এক পাশে ফাউস্‌টের মূর্তি জেগে উঠলো—তার হাতে উজ্জ্বল ত্রিপাদ-পাত্র। মাতৃদেবীদের উদ্দেশ্যে সে গম্ভীরভাবে স্তব নিবেদন করলে :

জননীগণ, আরম্ভ করি তোমাদের নামে, তোমাদের সিংহাসন
প্রতিষ্ঠিত সীমাহীন ক্ষেত্রে, চির-নিঃসঙ্গ তোমরা
তবু সঙ্গিপরিবৃত। প্রত্যক্ষ করছ তোমরা অস্তিত্বের সমস্ত রূপ,
নিষ্প্রাণ কিন্তু সঞ্চরমান, তোমাদের চতুর্দিকে।
ছিল একদিন যা মহিমায়, বিরাজ করছে তা এখনো—
ধ্বংস নেই তার ছিল একদিন যার অস্তিত্ব ;
নির্ধারিত করছ তাদের স্থান, ওগো সর্বশক্তিময়ীগণ,
দিনের শিবিরে আর রাত্রির গম্বুজতলে।
তার এক দলকে আয়ত্ত করে' জীবন চলেছে তার স্বচ্ছন্দ গতিপথে,
অপর দলকে আবিষ্কার করছে জাদুকর।
বিশ্বাস বলে দেখিয়ে চলেছে সে অজস্রভাবে
বিস্ময়াবহকে যা দেখতে উৎসুক প্রতিজন।

ত্রিপাদ-পাত্রে চাবি ছোঁয়াতেই তা থেকে হলো কুয়াশা-জালের সৃষ্টি, সেই কুয়াশাজাল থেকে উত্থিত হলো মধুর সুরতরঙ্গ, দেখা দিল গ্রীক-মন্দির; অবশেষে দেখা দিন সুদর্শন প্যারিস। মহিলারা নানা ভাবে তার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করলেন। এর পর দেখা দিল হেলেনা। তাকে দেখে মেফিস্টো বল্লে:

এই সে! আমার ঘুম নষ্ট হবে না এর চিন্তায়:
ভালই দেখতে, কিন্তু তেমনটি নয় যেমনটি আমি পছন্দ কবি।

মধ্যযুগের আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারার প্রতি গ্যেটে কালে কালে এত বিরূপ হন যে মেফিস্টোকে তিনি ভাবেন সেই ভাবধারাব প্রতীক, কাজেই সে পরিচ্ছন্ন, স্বভাবানুগ, বস্তুকেন্দ্রিক গ্রীক-ভাবধারার মর্মগ্রহণে অক্ষম।

মহিলারা হেলেনাকে দেখে পছন্দ করলেন না কিন্তু পুরুষরা মুগ্ধ হলেন। ফাউস্ট ত একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লো:

আছে কি আমাব দুই চোখ? আমার অস্তিত্বের গহনে
উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৌন্দর্যের উৎস সহস্রধারায়!
আমার ভয়ের অভিসারের লাভ হয়েছে দিব্য সম্পদ!
বিশ্বভুবন আমার জন্য ছিল রিক্ত, রুদ্ধ,
কিন্তু আমার পৌরহিত্যের ক্ষণ থেকে হয়েছে কত শোভাময়!
অনশ্বর অচপল মনোহর সে আজ!
আমার জীবনের জীবিতত্ব বিলীয়মান হোক
যদি কখনো ভ্রষ্ট হই তোমা থেকে:
যে-রূপ বহু পূর্বে প্রতিভাত হয়েছিল আমাব কল্পনা-নেত্রে,
মায়ামুকুরে + উদ্দীপ্ত করেছিল আমার আনন্দ,
বুদ্বুদ-আকৃতি সে তোমার রূপের তুলনায়!
আমার সমস্ত শক্তির উল্লাস, আমার অতলস্পর্শ হৃদয়াবেগ,—
প্রেম, কল্পনা, পূজা, উন্মাদনা—নিবেদিত হলো তোমাতে!

ফাউস্টের ভাববিহ্বলতা লক্ষ্য করে' মেফিস্টো তাকে বল্লে আত্মস্থ হতে। কিন্তু হেলেনা যখন প্যারিসকে চুম্বন করলে তখন ফাউস্ট বিচলিত হয়ে বল্লে:

তরুণের প্রতি এ অনুগ্রহ ভয়ঙ্কর!

আর শেষে যখন প্যারিস হেলেনাকে বহন করে' নিয়ে যাবার উপক্রম করলে তখন ফাউসট বিষম উত্তেজিত হয়ে তাকে নিষেধ করলে:

+ ফাউসট প্রথমখণ্ডের "ডাকিনীদের পাকশালা" স্মরণীয়। বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তি ফাউস্ট সেখানে আরশিতে ফুটে উঠ্‌তে দেখেছিল তা মার্গারেটেরও নয় হেলেনারও নয়।

কী? বলপ্রয়োগ! কেউ নই আমি এখানে?
নেই কি এই চাবি এখনো আমার হাতে?
বিভীষণ মরুভূমি তরঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিয়ে
এই চাবি উত্তীর্ণ করেছে আমাকে এই কঠিন ভূমিতে।
দাঁড়িয়েছি এখানে আমি দৃঢ়পায়ে! এখানে বাস্তবের অধিবাস!
আত্মা এখানে সাহসী হতে পারে আত্মাদের সঙ্গে যুদ্ধে,
নিজের জন্য জয় করে নিতে পারে দুই মহা রাজ্য।
কত দূরের সে—কেমন করে' আনবো তাকে নিকটে?
উদ্ধার করবো তাকে—করবো তাকে দ্বিগুণ ভাবে আপনার!
মাতৃগণ, মাতৃগণ, সফল কর আমার উদ্দাম প্রয়াস!
জেনেছে যে তাকে একবার কাঙ্ক্ষিতা সে তার চিরদিনের জন্য।

ফাউস্ট সবলে হেলেনাকে আকর্ষণ করলে, প্যারিসকে প্রতিহত করবার জন্য চাবি ছোঁয়ালে তার গায়ে। মহা শব্দ হলো, ফাউস্ট ভূলুণ্ঠিত হলো, হেলেনা ও প্যারিস কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। ভূলুণ্ঠিত ফাউস্টকে কাঁধে নিয়ে মেফিস্টো বল্লে:

…নির্বোধদের ভার নেওয়া বিড়ম্বনা,
খোদ শয়তানকেও শেষে পড়তে হয় বিপদে।

এই দৃশ্যের রূপকের ব্যাখ্যা এই: শিল্পীর মনে যখন তার সৌন্দর্যের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন সেই মানসী মূর্তি মানবী প্রিয়ার মতোই তাকে উতলা করে। কিন্তু উতলা হয়ে উদ্দাম প্রয়াসে সেই মানসীমূর্তি আয়ত্ত করা যায় না—সে-চেষ্টা করতে গিয়ে ফাউস্ট হলো ব্যর্থকাম, যেমন সে ব্যর্থকাম হয়েছিল ভূমিদেবতাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে। এর পরে দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার ফলেই ফাউস্ট অর্জন করলে সার্থকতা।

দুই রাজ্য বলতে আনা সোয়ানউইক বুঝেছেন প্রাচীন গ্রীসের ভাবজগৎ আর ফাউস্টের নিজের কল্পজগৎ—Arcadia—তৃতীয় অঙ্কের শেষে আমরা তার সাক্ষাৎ পাব। দুই রাজ্য বলতে ভাব ও আদর্শের বিচিত্র অনুসরণ ও তার সিদ্ধিও বোঝা যেতে পারে—প্রত্যেক ভাবুক ও শিল্পীর জন্যই এমন দুই রাজ্য রয়েছে। অবশ্য প্রকৃত সিদ্ধি এখনো ফাউস্টের অনায়ত্ত, তবে সে হাত বাড়িয়েছে সেই দিকেই।

দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্য—উচ্চছাদবিশিষ্ট অপ্রসর গথিক কক্ষ—ফাউস্টের পুরাতন পাঠাগার। মেফিস্টো মূর্ছিত ফাউস্টকে কাঁধে বয়ে এনে শুইয়ে দিলে সেই পাঠাগারে, বল্লে:

…যে হতচেতন হয়েছে হেলেনার দ্বারা
শীগগির ফিরবে না তার সংজ্ঞা।

সে দেখলে সেই পুরাতন কক্ষে যেখানে যা ছিল তেম্নি আছে, শুধু সেসব কালের প্রভাবে হয়েছে আরো মলিন আর বেড়েছে মাকড়সার জাল। ফাউস্টের ঢোলা পোষাক ঝুলানো দেখে তার খেয়াল গেল সেই পোষাক পরে আবার সে গুরু সেজে বসে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করবে। গুরুদের অভ্রান্ততার মনোভাব সম্বন্ধে সে বল্লে :

গুরুরা জানে কেমন করে' ধারণ করতে হয় এই ভাব ;
শয়তান এ থেকে বিদায় নিয়েছে বহু পূর্বে।

সেই পোষাক নাড়া দিতেই তা থেকে বহু পোকা বেরিয়ে ইতস্তত উড়তে লাগলো। কবি তাদের মুখে এক গানও বসিয়েছেন, তার শেষ লাইন ক'টি এই :

দুষ্টু বুকের ভেতরে
আছে আরামে লুকিয়ে,
পোষাকের পোকা
ধরা পড়ে শীগগির।

মেফিস্টো তাদের বল্লে :

যাও যাও যেখানে আছে যত ফাঁক-ফুকর আনাচ কানাচ
ঢোকো সেখানে—ঢোকো বইয়ের মধ্যে,
ঢোকো মলাটের পোকা-কাটা গর্তের মধ্যে,
ঢোকো জীর্ণ পুঁথির মধ্যে,
ভাঙাচোরা ভাণ্ডের মধ্যে,
মড়ার মাথার খুলির মধ্যে, তার চোখহীন কোটরের মধ্যে।
যেখানে আছে যত ছাতাধরা আবর্জনা
সেসব চিরদিনের আভাসভূমি পোকার দলের।

মেফিস্টো ফাউস্টের চেয়ারে বসে জোরে ঘণ্টাধ্বনি করলে। সেই তীব্র ঘণ্টাধ্বনিতে সব ঘর-দরজা কাঁপতে লাগলো। ভীত হয়ে বেরিয়ে এল এক শিষ্য, তার মনে হলো বাড়ীঘর বুঝি ভেঙে পড়বে। বিরাটাকৃতি ফাউস্টরূপী মেফিসটোকে দেখে সে আরো ভয় পেল। মেফিসটো তাকে ডাকলে আলাপ করার জন্যে, জানলে, এরা এখনো প্রতীক্ষা করছে ফাউস্টের প্রত্যাবর্তনের, তার জিনিষপত্র বিধিব্যবস্থা এরা এখনো রেখেছে অবিকৃত ; আর ফাউস্টের শিষ্য ভাগ্নার—এখন মহাসম্মানিত ভাগনার—তার নির্জন ল্যাবরেটরিতে কঠিন সাধনা করে' চলেছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে।

এই শিষ্য চলে গেলে এল আর এক শিষ্য। সে নবীন পন্থী—তারুণ্যের উল্লাস ও দম্ভ তাতে। এমন প্রশান্ত অচলায়তনে তীব্র ঘণ্টাধ্বনি শুনে সে খুশী হয়েছে। বৃদ্ধ আচার্যেরা তার চোখে নিতান্তই অকর্মণ্য। যতদিন রক্তের উত্তেজনা থাকে, তার ধারণায় কেবল ততদিন

মানুষের দিয়ে কিছু কাজ হতে পারে ; তাই যে ত্রিশ পেরিয়ে গেছে তাকে মৃত জ্ঞান করাই সঙ্গত—তাকে পাঠিয়ে দেওয়া চাই যমপুরে।

তার কথা শুনে মেফিস্টো বল্লে :

এ বিষয়ে শয়তানের এর বেশী বলবার নেই।

ছাত্র বল্লে :

আমার ইচ্ছার বাইরে শয়তানের অস্তিত্ব নেই।

মেফিস্টো জনান্তিকে বল্লে :

শয়তান এইবার দেবে তোমার পা ধরে টান।

ছাত্র তারুণ্যের জয়গান করলে এই ভাবে :

ছিলনা জগতের অস্তিত্ব যে পর্যন্ত আমি না করেছি তার সৃষ্টি ;
আমি তুলেছি সূর্যকে সাগর-গর্ভ থেকে ;
আমার সঙ্গে কমেছে বেড়েছে শশিকলা ;
আমার জন্য দিবা ধরেছে উজ্জ্বল বেশ ;
আমার জন্য ধরণী হয়েছে সবুজ, হয়েছে কুসুমিত ;
আমার নির্দেশে আদিম রাত্রির গহন থেকে
ফুটে বেরিয়েছে তারকা-দল !
আমি ভিন্ন কে দিয়েছে তোমাদের মুক্তি
প্রাত্যহিকতার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা থেকে ?
গর্বিত চির-স্বাধীন আমি, শুনি আপন মনের বাণী,
চলি আপন মনের আলোকে,
পেছনে ফেলে অন্ধকার, সামনে মহিমার হাতছানি !

ছাত্র চলে গেলে মেফিস্টো বল্লে :

বিচরণ কর আপন মহিমায় মহামৌলিক প্রতিভা !—
অন্তর্দৃষ্টি তোমাতে আনবে পীড়া !
সার অসার এমন কোন্ চিন্তা আছে
যা চিন্তিত হয়নি বহুপূর্বে ?
কিন্তু ভয় পাবারও কিছু নেই,
শীগগিরই যাবে বদলে ;
আঙুরের টাটকা রস যত অদ্ভুত ভাবেই গেঁজানি তুলুক,
হতে হয় শেষে তাকে মদ।

টীকাকাররা বলেছেন, ফাউস্টের ফেলে-রাখা ঢোলা জামায় যেসব পোকার বাসা হয়েছিল সেসব হচ্ছে কুণো পাণ্ডিত্যের অসার সংস্কার ও সিদ্ধান্ত; আর ফাউস্টরূপী মেফিস্টোর তীব্র ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে প্রাচীন সংস্কারের জগতে ভলটেয়ারের মতো চেতনার আবির্ভাব—প্রাচীন মত-বিশ্বাসের ভিত্তি-মূল তাতে হয় বিচলিত।

তরুণ ছাত্রের উক্তিতে নাকি রয়েছে দার্শনিক ফিক্‌টের মতের প্রতি গ্যেটের কটাক্ষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—লেবরেটরি—নানা ধরণের কাজের জন্য বিরাট ও বিচিত্র মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে।

ভাগনারের সামনে এক জ্বলন্ত হাপর, তাতে এক কাচের চোঙে কি তৈরী হচ্ছে, ভাগনার অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা দেখছে। মেফিস্টোফিলিস এলে তাকে সে চাপা গলায় বল্লে: এ এক মহাক্ষণ, আর একটু পরেই এই চোঙের মধ্যে মানুষ তৈরি হবে। মেফিস্টো বল্লে: এর মধ্যে ঢুকিয়েছে কোন্ প্রেমাকুল দম্পতিকে? ভাগনার বল্লে: প্রাচীন নির্বোধ রীতি আমরা বদলে দিয়েছি; পশুর জন্য ও-রীতি চলতে পারে কিন্তু এখন থেকে মহাশক্তিশালী মানুষের জন্ম হওয়া চাই মহত্তর পদ্ধতিতে।

মধ্যযুগের কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা হয়েছিল কৃত্রিম ভাবে মানুষ তৈরি সম্ভবপর। খ্যাতনামা পণ্ডিত প্যারাসেল্‌সাস এমন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর সেই নির্দেশ অনুসারে বহু ব্যর্থ পরীক্ষা হয়েছিল। এই কৃত্রিম মানুষের নামকরণ হয়েছিল Homunculus—মানবক।

ভাগনারের কাচের মধ্যে ধীরে ধীরে এক মানবক দেখা দিল, ভাগনারকে সে বাবা বলে সম্বোধন করলে। কিন্তু তার শরীরে কাচের আবরণ রয়েই গেল; সেই ভাবেই তার যাত্রা শুরু হলো। নিদ্রিত ফাউস্টের উপরে আলোকপাত করে' সে বর্ণনা করলে এক সুন্দর জলকেলির দৃশ্য যাতে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লেডা-র সান্নিধ্য লাভ করেছে রাজহংস (ছদ্মবেশী জেউস)—অর্থাৎ নিদ্রিত ফাউস্টের মনে যে সৌন্দর্যের স্বপ্ন চলেছে তাই। (এই লেডা ও রাজহংসের মিলন থেকে জন্ম হয় হেলেনার।)

তার কথায় মেফিস্টো বল্লে; তুমি দেখতে এত ছোট কিন্তু দেখ এত সব। আমি ত কিছুই দেখছি না।

মানবক বল্লে: তা ত হবেই কেননা মেফিস্টো উত্তরাঞ্চলের কুয়াশা ও আঁধারের সঙ্গে পরিচিত, দক্ষিণাঞ্চলের আলোকের মহিমা তার অজ্ঞাত। সে আরো বল্লে: ফাউস্টকে এখন নিয়ে যাওয়া চাই দক্ষিণের আলোকিত পরিমণ্ডলে, নইলে, এই আঁধার-ঘেরা পরিমণ্ডলে তার সংজ্ঞা ফিরে এলে হবে তার মৃত্যু।

এই মানবক কে? মোটামুটিভাবে বলা যায়, এ হচ্ছে মানুষের ভাব ও ভাবনা বা

তপঃশক্তি. অন্য কথায় বাস্তব-সত্তা-হীন মানস-চেতনা। এর বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাব পরের দৃশ্যে।

তৃতীয় দৃশ্য—ক্ল্যাসিক্যাল ভাল্‌পুর্গিস্ রাত্রি বা গ্রীক প্রেতোৎসব।

এই প্রসিদ্ধ দৃশ্য পাঁচ খণ্ড দৃশ্যে বিভক্ত, আর যেমন দীর্ঘ তেমনি জটিল। ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের ভাল্‌পুর্গিস্ রাত্রিতে বা টিউটন-প্রেতোৎসবে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটের তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ, এই গ্রীক প্রেতোৎসবে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রকৃতি-প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধ। ক্রোচে বলেছেন: প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর গৌরবময় জগতে এ কবির এক সকৌতুক মানস-ভ্রমণ।

মানবকের পরিচালনায় মেফিস্টো ফাউস্টকে বহন করে' এনেছিল। তারা উপনীত হলো দক্ষিণের পেনেউস-তীরে ফার্সেলীয় প্রান্তরে যেখানে খৃষ্টপূর্ব ৪৮ খৃষ্টাব্দে পোম্পেয়ী ও সীজার এই দুই রোমান প্রধানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল আর রোমে সীজারের স্বৈরতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল।

গ্রীক অঞ্চলে এসেই ফাউস্ট তার সম্বিৎ ফিরে পেল। জেগে উঠেই সে বল্লে: সে কোথায়?

মানবক বল্লে: সে উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন, তবে তাকে আশ্বস্ত করলে এই বলে' যে, যে মাতৃদেবীদের সন্নিধানে গিয়েছিল তার পক্ষে দুস্তরতর তপস্যা আর হতে পারে না।

ফাউস্ট নিজেকে সুস্থ ও সবল বোধ করলে আর এই স্থান ত্যাগ করলে তার লক্ষ্যের সন্ধানে।

ফাউস্ট এই পরিবেশে এমন স্বস্তি বোধ করলে, কিন্তু মেফিস্টো বোধ করলে শুধু অস্বস্তি ও বিরক্তি। গ্রীক-জগৎ তার চোখে শ্লীলতাহীন। সে বরং কিছু স্বস্তি বোধ করলে আসীরীয় গ্রিফিন, মিসরীয় স্ফিংক্‌স্, সীথীর একচক্ষু আরিমাস্‌পীয়ান, এই সব অদ্ভুত মূর্তির সান্নিধ্যে। তাদের কাছে সে নিজেকে পরিচিত করলে ইংরেজি নাটকের 'প্রাচীন পাপ' (old iniquity) নামে।

ফাউস্ট ঘুরতে ঘুরতে এই সব অদ্ভুত মূর্তির সামনে এসে কিন্তু এক আনন্দময় উদ্দীপনা বোধ করলে। সে স্মরণ করলে এদের ঘিরে যেসব কিম্বদন্তী ও সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সব কথা। স্ফিংক্‌স্‌দের সম্বোধন করে' সে বললে:

ওগো নারীমূর্তিচয়, শোনো আমার কথা, বলো
তোমরা কি কেউ দেখেছ হেলেনাকে?

স্ফিংক্‌স্‌রা বললে: হেলেনার আবির্ভাবের পূর্বেই গ্রীসে তাদের বংশ লোপ পেয়েছিল। তারা তাকে উপদেশ দিলে নর অশ্ব কিরোনের (Chiron) শরণাপন্ন হতে।

গ্রীক-পুরাণের এই কিরোন শনিদেব ও সমুদ্র-দুহিতা ফিলীরার (Philyra) পুত্র। হোমরের মতে, নর-অশ্ব বংশে সে মহাজ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ, মানুষকে সে শিখিয়েছিল দেবতাদের নামে শপথ-গ্রহণ, বলি-উৎসব আর সঙ্গীত। আস্ত্রাকস্, একিলীস, থিজিউস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গ্রীক বীর তার শিষ্য।

দ্বিতীয় খণ্ড-দৃশ্য—পেনেউস-তীর।

ফাউস্ট নদীর তরঙ্গধ্বনিতে নিবিড়ভাবে আমোদিত হলো। জলকুমারীরা তাকে বললে :

ভাল তোমার জন্যে এখানকার সুখ-শয়ন
সতেজ হোক এই স্নিগ্ধতায়
ক্লান্ত তোমার দেহ,—
এড়িয়ে-চলা বিশ্রাম
লাভ কর এখানে, হও বন্ধনহীন ;
আমরা কলতান তুলবো, মর্মর-ধ্বনি করবো,
বলবো কথা তোমার কানে কানে।

জলকুমারীরা স্নানে নেমেছিল। তাদের অতুলনীয় দেহ-সৌষ্ঠব দেখে ফাউস্ট আনন্দে বিহ্বল হলো। সে বললে : একি স্বপ্ন! অথবা স্মৃতি!—জলকুমারীরা সাঁতার কাটছিল, ঝাঁপাঝাঁপি করছিল, জল ছিটিয়ে চেঁচামেচি করছিল ; ফাউস্ট অনুভব করলে সেই সৌন্দর্যচ্ছবি তার দৃষ্টিকে নব স্বাস্থ্য দান করছে। রাজহংসদলও তাদের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করে' সাঁতার কেটে সামনে এগোচ্ছিল।

জলকুমারীদের কথায় ফাউস্ট সংবাদ পেলে কিরোনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে এসে পড়লো। ফাউস্ট তাকে অনুরোধ জানালে থামতে আর তার কথা শুনতে। কিরোন বললে সে থামে না, ফাউস্ট তার পিঠে চড়ে এসে বরং ধীরে সুস্থে বলতে পারবে তার কথা। ফাউস্ট তার পিঠে চড়ে বসলো।

কিরোনের শিক্ষায় মানবসমাজের কত উপকার হয়েছে ফাউস্ট গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথার উল্লেখ করলে। কিরোন সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে' বললে : মানুষের আচার-ব্যবহার দেখে মনে হয় কিছুমাত্র শিক্ষাদীক্ষা কোনো দিন তার লাভ হয়নি। ফাউস্ট তার বিনয়ের প্রশংসা করলে আর তার কাছ থেকে জানতে চাইলে অতীতের বীরশ্রেষ্ঠদের কথা। প্রসঙ্গক্রমে নরশ্রেষ্ঠ হার্কিউলিসের কথা উঠলো। কিরোন তার দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করলে, বললে, তার মহিমা যে কবিরা কথায় প্রকাশ করতে চেয়েছে আর শিল্পীরা প্রস্তরমূর্তিতে প্রকাশ করতে চেয়েছে সব বৃথা চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে ফাউস্ট শ্রেষ্ঠ নারীর কথাও জানতে চাইলে। কিরোন বললে : নারীর সৌন্দর্য তুচ্ছ ব্যাপার, তাই নারীমূর্তি প্রায়ই দেখায়

প্রাণহীন; ঔজ্জ্বল্যময়ী নারী তার চোখে প্রশংসার পাত্রী যখন সে কর্তব্যরতা; সৌন্দর্য নিজেকে নিয়েই খুশী; তার সঙ্গে যদি যোগ ঘটে মাধুর্যের তবে তা হয়ে ওঠে দুর্বার—হেলেনার মতো—যাকে এক সময়ে কিরোন তার পিঠে বহন করেছিল।

হেলেনার কথায় ফাউস্ট আনন্দে উদ্দীপ্ত হলো, জানতে চাইলে সে কবে তাকে বহন করে কোথায় নিয়েছিল। কিরোন বললে: যখন সে তার ভাইদের সঙ্গে দস্যুদের হাতে পড়েছিল—সেই সৌন্দর্য-মূর্তিকে পিঠে নিয়ে সে কত খুসী হয়েছিল! ফাউস্ট বললে: তখন ত হেলেনা সাত বৎসরের বালিকা। কিরোন বললে: ওসব ভাষাতাত্ত্বিকদের আহাম্মকি, কবির চোখে হেলেনা চিরযৌবনা, চিরমোহিনী—কালের অতীত।

হেলেনার এই কালাতীত রূপ ফাউস্টের উপজীব্য হলো। সে বললে:

…পারবো না কি আমি নিগূঢ়তম কামনার দ্বারা
জীবিত করতে সেই পরমমনোহর মূর্তি,—
চিরন্তন, দেবোপম,
সুকুমার ও মহীয়ান, অধৃষ্য ও মোহন?
দেখেছিলে তুমি তাকে একদা: দেখেছি আমি তাকে আজ—
সৌন্দর্যের স্বপ্ন, স্বপ্ন হেন সুন্দর!
তার নিগড়ে বন্দী হয়েছে আমার সমস্ত সত্তা, হৃদয় ও মস্তিষ্ক,
পারবো না আমি বাঁচতে যদি না পাই তাকে!

কিরোন বললে ফাউস্টের ত উন্মাদের দশা; তবে সৌভাগ্যক্রমে তারা যাচ্ছে উপদেবী মান্টো-র স্থানে, সেখানে সে আরোগ্যলাভ করতে পারবে। ফাউস্ট বললে, এই ব্যাধি থেকে সে আরোগ্যলাভ করতে চায় না। কিন্তু অচিরে তারা এসে পড়লো মান্টোর স্থানে। ফাউস্কে দেখিয়ে কিরোন মান্টোকে বললে: এই ব্যক্তি উন্মাদ হয়েছে হেলেনাকে লাভ করতে। মান্টো বললে:

অসম্ভব যাকে প্রলুব্ধ করে
সে আমার প্রিয়।

কিরোন ত্বরিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ফাউস্টকে নিয়ে মান্টো আঁধার পথে চললো ওলিম্পাস-পাদমূলে পার্সিফোনির স্থানে।

পার্সিফোনির সামনে ফাউস্ট হেলেনার জন্যে এক প্রাণস্পর্শী আবেদন জানাবে এটি গ্যেটের পরিকল্পনায় ছিল, কিন্তু সেটি আর তিনি লিপিবদ্ধ করেননি—পাঠকদের কল্পনার উপরে ছেড়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড-দৃশ্য—পেনেউসের উদ্যানে।

এর ব্যাখ্যায় টীকাকাররা একমত নন; এটি দুর্বোধ্যও বটে।

নদীতীরে সুকণ্ঠী 'সাইরেন'-রা গান ধরেছে; জলের মহিমা কীর্তন করে' তারা বলছে: যেখানে জল নেই সেখানে স্বাস্থ্য নেই। এমন সময়ে এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে ভূমিকম্পের সূচনা হলো—জলে স্থলে ভীষণ আলোড়ন দেখা দিল।

ভূমিকম্পের দেবতা নিজের গৌরব ঘোষণা করে বললে: তার আলোড়নের ফলে জগৎ উপত্যকায় অধিত্যকায় বিভক্ত হয়ে এমন সুন্দর হয়েছে। (এখানে হয়ত বিপ্লবপন্থীদের প্রতি গ্যেটের কটাক্ষ রয়েছে।) এই ভূমিকম্পের ফলে ভূগর্ভ থেকে যে সব সোনা উঠলো গ্রিফিন ও তার অনুচরেরা তা আত্মসাৎ করলে। বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে যারা স্বার্থসিদ্ধি করে তারাই বোধ হয় এখানে হয়েছে গ্রিফিন ও তার অনুচর।

এরপর আছে কতকগুলো যুদ্ধের ব্যাপার যাতে নির্দোষদের উপরে অত্যাচার হলো, আর সেই অত্যাচারের প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা অত্যাচারিত পক্ষের মনে প্রবল হয়ে রইল।

এই দৃশ্যে মেফিস্টোফিলিসকে দেখা যাচ্ছে দিশাহারা ভাবে ঘুরতে—নিজের মনের মতো পরিবেশ সে আর পাচ্ছে না। অবশেষে গ্রীক-চিন্তায় যা বীভৎসতার চরম সেই ফোর্কীস-কন্যাদের (Phorkys) মধ্যে সে স্থান গ্রহণ করলে। এই ফোর্কীস-কন্যারা তিন বোন, এরা অন্ধকার ও বিপর্যয়ের সন্ততি; তিন বোনের এক দাঁত ও এক চোখ—যখন যার দরকার হয় ব্যবহার করে।

এই দৃশ্যে মানবককেও দেখা যাচ্ছে সার্থকতার সন্ধানী। সে দুই গ্রীক দার্শনিক আনাক্সাগোরাস ও থালেস-এর (Thales) উপদেশপ্রার্থী হলো। এরা দুজনেই প্রকৃতির রহস্যের সন্ধানী—আনাক্সাগোরাস গ্রহণ ভূমিকম্প ও উল্কা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল, থালেসের মতে সব-কিছুর উদ্ভব জল থেকে। কিন্তু এই পণ্ডিতদের বিতণ্ডাই সে শুনলে, তারা তাকে কোনো সঠিক নির্দেশ দিতে পারলে না। থালেস মানাবককে বললে সমুদ্রে যে উৎসব চলেছে সেই দিকে অগ্রসর হতে।

চতুর্থ খণ্ড-দৃশ্য—ঈজিয়ান সাগরের নিরুপদ্রব পার্বত্য অঞ্চল।

চন্দ্র মাথার উপরে কিরণ দিচ্ছে, সাইরেনরা পাহাড়ের মাথায় মাথায় বাঁশি বাজাচ্ছে ও গান গাচ্ছে। মৎস্য-কন্যারা সেই উৎসবে যোগ দিলে। সাইরেনরা তাদের বললে আরো ভাল করে' এই উৎসবে যোগ দিতে। মৎস্য-কন্যারা দল বেঁধে অগ্রসর হলো সামোথ্রেস দ্বীপের দিকে—সেখান থেকে মহান্ 'কাবিরি'দের নিয়ে আসতে। এই কাবিরিরা হচ্ছে ফিনিসীয়দের দেবতা, সংখ্যায় কারো মতে তিন কারো মতে সাত, এরা দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী ছিল; এরা নাকি নাবিকদের জাহাজ-ডুবি থেকে উদ্ধার করতো। গ্যেটে এদের অবতারণা করেছেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে। কাবিরি শব্দ নাকি হিব্রু "কাব্বিরীম" ও আরবী "কবীর" শব্দের সমর্থক।

থালেস মানবককে নিয়ে উপনীত হলো সমুদ্রবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ নেরেউস-এর (Nereus)

কাছে। নেরেউস মানুষের কল্যাণকামী, কিন্তু মানুষের নির্বুদ্ধিতার জন্যে তাদের উপরে খুব অসন্তুষ্ট। থালেস মানবকের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নেরেউসের উপদেশপ্রার্থী হলো। নেরেউস বললে: উপদেশ কেউ শোনে না, প্যারিসকে সে বিদেশিনী হেলেনা সম্বন্ধে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তার কথায় প্যারিস কর্ণপাত করেনি, ঘটিয়েছে ট্রয়ের শোচনীয় ধ্বংস। নেরেউস কিছুতেই উপদেশ দিতে রাজি হলো না, বললে, তার কন্যাদের তরঙ্গোৎসব আজ সে দেখবে, আজ সমুদ্রের উপরে তার কন্যা আফ্রোদিতে-স্থানীয়া গালাতিয়া-র রথযাত্রা—তার এই আনন্দ-মুহূর্ত সে বিপন্ন করবে না। সে মানবককে বললে বহুরূপী চিরচঞ্চল 'প্রোটিয়াসে'র কাছ থেকে জীবনের রহস্য জানতে। নেরেউসের বিকাশ শেষ হয়ে গেছে, তাই বোধ হয় নববিকাশোন্মুখ মানবকের শিক্ষক হতে সে অসম্মত হলো। শিক্ষাদানের মূলে চাই উদ্দীপনা।

মৎস্য-কন্যারা কাবিরিদের নিয়ে এল। তিনজন এল, চতুর্থ জন আসতে অস্বীকৃত হলো। এই তিনজন কারা? সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের, প্রাচীন মিসরীয় ধর্মের ও প্রাচীন গ্রীক ধর্মের প্রতিনিধি—আসতে অস্বীকৃত হলো প্রতীকদ্বেষী ইহুদি-ধর্মের প্রতিনিধি কেননা এই গ্রীক প্রেতোৎসব প্রতীকবহুল। আর তিন জন এখনো ভবিষ্যতের কোলে—তারা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম আর মুসলমান ধর্ম। মৎস্য-কন্যারা খবর দিলে অষ্টম কাবিরিও আছে কিন্তু তার কথা কেউ ভাবে না। টীকাকাররা বলেছেন এই অষ্টম কাবিরি বা অষ্টম ধর্ম ভবিষ্যতের ধর্ম বা গ্যেটের নিজের ধর্মমত। এই সব ধর্ম সম্বন্ধে মৎস্য-কন্যারা বললে:

এরা অতুলনীয়,
চিরপ্রধাবিত,
উদগ্রকামনাময়
চির-অধৃষ্যের জন্য!

ধর্মের এই সব প্রাচীন প্রতিনিধিদের দেখে মানবক খুশী হলো না, বল্লে: এরা দেখ্‌তে অদ্ভুত। প্রোটিয়াস অদৃশ্য থেকে টিপ্পনী করলে: বিচিত্র কাহিনীর ভাণ্ডারী সে, সে জানে যা যত অদ্ভুত তা তত সম্ভ্রান্ত। তখন থালেস ও মানবক প্রোটিয়াসের দর্শন প্রার্থনা করলে। প্রোটিয়াস বিচিত্র মূর্তি ধারণ করলে, অবশেষে এক মহৎ রূপ ধরে দেখা দিলে। মানবককে দেখে সে বল্লে: এত ক্ষুদ্র! এমন ত কখনো দেখিনি!

থালেস মানবকের পরিচয় দিয়ে বল্লে: মনোগত গুণপনার অভাব তাতে নেই, কিন্তু ধরা-ছোঁয়া যায় এমন সব কিছুর অভাব তাতে বড় বেশী।

প্রোটিয়াস বল্লে: মানবককে জীবন আরম্ভ করতে হবে বিরাট সমুদ্রের কোলে, সামান্য সূচনা থেকে নিম্নতম পর্যায়ের জীবন আত্মস্থ করে' ও আনন্দে অতিক্রম করে' তাকে উঠ্‌তে হবে উপরের স্তরে। এই ভাবেই সে প্রস্তুত হতে পারে বড় কিছুর জন্যে।

সমুদ্রে যে উৎসব চলেছিল তার হাওয়ায় মানবক আমোদ বোধ করলে। তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রোটিয়াস উৎসবের কেন্দ্রের পানে অগ্রসর হলো। থালেসও তাদের সঙ্গে গেল।

পঞ্চম খণ্ড-দৃশ্য ঃ—রোড্স্ দ্বীপের পৌরাণিক ধাতুশিল্পীরা সমুদ্র-ঘোড়া ও সমুদ্র-ড্রাগনের পিঠে চড়ে এসেছে—তাদের হাতে সমুদ্রেশ্বর নেপচুনের ত্রিশূল।

তারা সমুদ্রেশ্বরের মহিমা গান করলে, তাদের উপাস্যদেবতা চন্দ্রের স্তব করলে, তাদের দেশ রোড্স্-এর আলো-বাতাসের প্রশংসা কীর্তন করলে, আর তারাই যে প্রথম দেবতাদের মানব-মূর্তিতে পরিকল্পনা করেছিল সেকথাও বল্লে।

প্রোটিয়াস তাদের এই আত্মশ্লাঘা তুচ্ছ জ্ঞান করলে, বল্লে, সব মহিমা উদার সূর্যালোকের —ধাতুশিল্পীদের সব সাধের মূর্তি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে। সে ডোলফিন মাছের রূপ ধরে' মানবককে তার পিঠে নিলে সমুদ্রের সঙ্গে তাকে যুক্ত করার জন্যে। থালেস এই কাজ অনুমোদন করলে, বল্লে অনন্ত রূপের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হতে হতে শেষে মানবক হবে মানুষ। প্রোটিয়াস বল্লে, মানুষ হবার পরে আর কিছুই সে হবে না।—এখানে ডারুইনের অভিব্যক্তি-বাদের পূর্বাভাস রয়েছে।

গালাতিয়ার রথযাত্রা চলেছিল। তাকে এখানে জ্ঞান করা হয়েছে মানুষের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রতীক। তার অনুচরেরা তার স্তবগান করে বললে: বিচিত্র ভঙ্গিতে চলেছে গালাতিয়ার রথ, জগতের রাজশক্তির উত্থানপতনের দ্বারা তার গতি ব্যাহত হয় না।

গালাতিয়ার পিতা নেরেউস তাকে দেখে খুশী হলো, কিন্তু তাকে যে দুদণ্ড কাছে রাখবে তার সম্ভাবনা নেই—কাল চিরচলন্ত, পরিবর্তনশীল।

এই সত্য ও সৌন্দর্য-মূর্তিকে দেখে থালেসও উৎফুল্ল হলো। নূতন করে জলের মহিমা গান করে' সে বললে: জলের দ্বারা লালিত হযে জগৎ রয়েছে সরস।—গ্যেটে বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন, জগতের অভিব্যক্তির ধারায় জল ও বাতাসের শক্তি বেশী কার্যকরী হয়েছে এই ছিল তাঁর ধারণা।

সৌন্দর্যবতী গালাতিয়ার সামনে মানবকের কাচের আবরণ থেকে এক মধুর ধ্বনি নির্গত হলো আর কাচ শিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো। এই সৌন্দর্যবতীর সিংহাসনে লেগে মানবকের কাচের আবরণ চূর্ণ হয়ে গেল আর তার অস্তিত্ব সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। অর্থাৎ সৌন্দর্যবতীর সামনে মানবক যখন কামনার প্রভাব অনুভব করলে তখন থেকে আরম্ভ হলো তার অস্তিত্ব বিচিত্র ভাবে।

এই গ্রীক প্রেতোৎসবে আদিম বর্বর দশা থেকে গ্রীক শিল্পের অভিব্যক্তি-ধারার ইঙ্গিত রয়েছে—হার্কিউলিস-মূর্তিতে সেই শিল্পের উৎকর্ষের সূচনা। এর পরে হচ্ছে হেলেনা-অঙ্ক। আফ্রোদিতের স্থলাভিষিক্তা জলকন্যা গালাতিয়ায় সেই হেলেনার পূর্বাভাস।

তৃতীয় অঙ্ক দৃশ্যে বিভক্ত নয়।

এর পরিচিত নাম হেলেনা। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এটি Helena : a Classico-Romantic Phantasmagoria এই নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড ফাউস্টের সঙ্গে এর যোগও সামান্য।

মূল ফাউস্ট-কাহিনীতে ফাউস্ট ও হেলেনার বিবাহের কথা আছে। এই হেলেনা রচনায় কবি হাত দেন ইতালি থেকে জার্মানীতে ফিরে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেলেনার মেনেলাউস-ভবন ত্যাগ পর্যন্ত লেখা হয়। ক্রোচে এই অংশকে এক স্বতন্ত্র কাব্যখণ্ড রূপে বিচার করেছেন।

হেলেনা গ্রীক জগতের অপূর্ব সৌন্দর্য-মূর্তি। তার জন্য পরম উন্মাদনায় দীর্ঘ দশ বৎসর ধ'রে যুদ্ধ করেছিল গ্রীসের ও এশিয়া মাইনরের যত বীর; ট্রয়ের পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধেরাও তাঁদের দেশে হেলেনার পদার্পণে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন। ক্রোচের মতে গ্যেটের হেলেনা গ্রীকদের সেই দিব্যপ্রভাময়ী প্রলয়ঙ্করী হেলেনা—তার অপরূপ সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের সম্মোহন, সেই সম্মোহনের ফলস্বরূপ ধ্বংস, সবই তার সুবিদিত —তাই সে ট্র্যাজিক (প্রলয়-চিহ্নিত) চরিত্র—তার এমন দৈবলব্ধ শক্তি ও তার সেই শক্তির এমন পরিণামে প্রকাশ পাচ্ছে এক বিশ্বরহস্য।

ক্রোচের এই হেলেনা-ব্যাখ্যা সুন্দর; সেই সঙ্গে আরো একটু লক্ষ্য করবার আছে যে হোমরের হেলেনা পরমমাধুর্যময়ী আর গ্যেটের হেলেনা পরমমহিমময়ী। অবশ্য দুয়েরই মূর্তি কেমন বিষাদমাখা, সেই বিষাদ এদের দান করেছে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য ও স্বাতন্ত্র্য।

হেলেনা-কাব্যকে গ্যেটে শেষ পর্যন্ত যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন তাতে এটি মোটের উপর হয়েছে এক রূপক কাব্য—গ্রীক শিল্পাদর্শের পরিচ্ছন্নতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি যেন সম্মিলিত করতে চেয়েছেন রোমান্টিক আদর্শের আবেগ-প্রাবল্য; যেন ইঙ্গিত করেছেন—এই দুই আদর্শের মিলনজাত সন্ততি হচ্ছে আধুনিক কবিপ্রতিভা যার পরিচয় হেলেনা-ফাউস্টের সন্তান ইউফোরিয়নে। ("আলাপে" ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক রীতি সম্পর্কে কবির আলোচনা স্মরণীয়।)

কাব্যের সূচনায় স্পার্টারাজ মেনেলাউসের প্রাসাদের সামনে হেলেনার স্বগতোক্তি—দীর্ঘ হোমরীয় ষট্‌পদী ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে সহজেই গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। হেলেনা বলছে :

বহুবন্দিতা ও বহুনিন্দিতা আমি, হেলেনা,
সদ্যপ্রত্যাগত হয়েছি সমুদ্রতীর থেকে
তরঙ্গদোলার ঘূর্ণি কাটেনি আমার এখনো······
সেই সমুদ্রতীরে বীর-সঙ্গি-সমভিব্যাহারে,
রাজা মেনেলাউস উপভোগ করছেন প্রত্যাবর্তনের আনন্দ;

প্রার্থনা করি তোমার স্বাগত-সম্ভাষণ ওগো উচ্চচূড় প্রাসাদ,
পিতা তীন্দারেউস নির্মাণ করেছিলেন যাকে ঢালু পাহাড়ের 'পরে...
পুনর্বার নির্মুক্ত হোক আমার জন্য তোমার দ্বার, যেন রাজার আদেশ
পালন করতে পারি যথাযথভাবে যোগ্যা মহিষীর মতো ;
প্রবেশ পথ দাও তোমার অভ্যন্তরে, পড়ে থাকুক বাইরে
এতদিন আমার জীবন ঘিরে ঘূর্ণিত হয়েছে যে প্রলয়-ঝঞ্ঝা !

এই কাব্যের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ গ্রীক-নাটকের রীতিতে রচিত। গ্রীক নাটকের কোরাস-এর সঙ্গে কিছু মিল রয়েছে আমাদের দেশের যাত্রার 'জুড়ি'-র। কোরাসও মূলত গায়ক-দল, তাদের গানের ভিতর দিয়ে নাটকের দৃশ্যান্তর, দৈব-অভিপ্রায়, ইত্যাদি নির্দেশিত হতো।

প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে হেলেনা দ্বিধান্বিতা তার ভাগ্য সম্বন্ধে। সমুদ্রে দীর্ঘ পথ তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তখন তার স্বামী তার সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করে নি ; সে বুঝতে পারছে না তাকে আনা হয়েছে রাণীর মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, না বন্দিনী রূপে ; সে ভাবছে দেবতারা তাকে দিয়েছেন রূপ, কিন্তু সেই রূপের সঙ্গে দিয়েছেন দুই অবিশ্বাসী অনুচর—খ্যাতি আর দুর্ভাগ্য। কোরাস তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তার অতুলনীয় রূপের কথা যে-রূপের সামনে নতশির হয় দুর্দান্ততম পুরুষ, মেনেলাউস-ভবনের বহুদিনের সংগৃহীত মণিকাঞ্চন প্রতীক্ষা করছে সেই রূপের স্পর্শের। কিন্তু হেলেনা এসব কথায় তেমন কান দিচ্ছে না। সে স্মরণ করছে—তার স্বামী তাকে আগে পাঠিয়েছে বলির জন্য সব প্রস্তুত করে রাখতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ছে কি বলি দেওয়া হবে সে-সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ সে দেয় নি। সে ভাবছে :

সহজেই সন্দেহ জাগে এতে : কিন্তু আর দুশ্চিন্তা নয়,
ঘটুক যা উর্ধ্বের দেবতাদের অভিপ্রায়,
তাঁরা চিরদিন সাধন করেন যা তাঁদের মনে চায় ;
মানুষের বিচারে সেসব ভাল হোক আর মন্দ হোক
তাদের ভাগ্য হচ্ছে সেসব সহ্য করা।
কতবার পুরোহিতের দারুণ কুঠার
উদ্যত হয়েছে বলির পশুর অবনমিত গ্রীবার পরে,
কিন্তু হয়েছে ব্যর্থকাম শত্রুর আগমনের ফলে
কিংবা দেবতার প্রতিবন্ধকতায়।

কোরাস তাকে বললে বিপদের কথা না ভেবে সাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হতে। হেলেনা মনস্থির করে' গৃহে প্রবেশ করলে কিন্তু অচিরেই ভয়চকিত হয়ে ফিরে এল। কিছু আশ্বস্ত হয়ে সে বলছে :

সাধারণ ভয়ে ভীত হওয়া শোভা পায় না জেউসের সন্ততির পক্ষে,
ভয়ের চপল হস্ত অক্ষম তাকে স্পর্শ করতে :
কিন্তু যে বিভীষণ ভীতি প্রথম নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল
আদিম রাত্রির গর্ভবাস থেকে, তারপর ধারণ করেছিল বিচিত্র রূপ
আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বসিত দিগন্তপ্রসারী ধূমপুঞ্জের মতো,
তাতে কম্পিত হয় বীরেরও বুক।
নরকের অধিস্বামীরা আজ তেম্‌নি ভীতিচিহ্ন অঙ্কিত করেছেন
আমার প্রবেশ-দ্বারে—আমি প্রস্তুত হয়েছি
অনাহূত অতিথির মতো ত্যাগ করে আসতে
আমার বহুপরিচিত বহুকাঙ্ক্ষিত গৃহদ্বার।
কিন্তু আর নয়। পেছনে হটে এই দাঁড়িয়েছি আমি আলোকে ;
এখান থেকে আর নিষ্ক্রান্ত করতে পারবে না আমাকে তোমরা যে
দেবতাই হও!
আমি ব্যবস্থা করবো পাবনের, আর এমনি ভাবে পূত হলে,
গৃহ-অগ্নি বরণ করবে প্রভুপত্নীকে—যেমন প্রভুকে।

হেলেনা যাকে দেখে এমন ভয় পেয়েছিল সে হচ্ছে বীভৎসতার প্রতিমূর্তি পূর্ববর্ণিত ফোর্কীউস—ছদ্মবেশী মেফিসটোফিলিস। সে বেরিয়ে এল বিরাটবপু বৃদ্ধা দাসীর বেশে। কোরাস-দলের সঙ্গে চল্‌লো তার বিচিত্র ইঙ্গিতের গালি-বিনিময়। শেষে হেলেনার আদেশে সে কিঞ্চিৎ সংযত হলো। কিন্তু হেলেনার সঙ্গে কথায়ও চললো হেলেনার অতীত জীবনের প্রতি তার অর্ধপ্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ; কেমন করে' কৈশোরে হার্কিউলিস হেলেনাকে হরণ করেছিল, তারপর তার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েছিল কাসটার পোল্লাক্‌স প্রমুখ বীর, তারপর মেনেলাউস তাকে বরণ করেছিল পত্নীত্বে, তারপর মেনেলাউসের অনুপস্থিতি কালে প্যারিসের সঙ্গে হয়েছিল তার পরিচয়—এই সব। প্যারিসের উল্লেখে হেলেনা বললে :

কেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ সেই অর্ধবৈধব্য,
আর আমার জীবনের উপরে তার যত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা!

কিন্তু এই বীভৎসতার প্রতিমূর্তি এমনিভাবে তাকে ক্রমাগত আঘাত করে' চললো। শেষে হেলেনা মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

মূর্ছাভঙ্গে সে আত্মস্থ হয়ে অগ্রসর হলো বলির আয়োজনে। ফোর্কীউস বললে :

প্রাসাদে সমস্তই প্রস্তুত—ধূপাধার, ত্রিপাদ-পাত্র, ধার দেওয়া কুঠার,
অভিষেকের জন্য গন্ধ-দ্রব্য ; কিন্তু বলি কোথায়?

হেলেনা বললে :

রাজা সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেন নি।

ফোর্কীউস খুব দুঃখ প্রকাশ করে' বললে :

বলেন নি ? বড় নিষ্ঠুর কথা !

হেলেনা বললে :

এমন অভিভূত হয়ে পড়লে কেন ?

ফোর্কীউস বললে ?

রাণী, সেই বলি তুমি নিজে !

রাণী ও তার অনুচরীরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হলো। রাণীকে আরো ভয় দেখাবার জন্মে ফোর্কীউস ডাকলে তার বামন-অনুচরদের—তাদের মুখ বাঁধা আর তারা খুব চটপটে—সে তাদের বললে :

এই স্বর্ণশৃঙ্গ বেদী বসাও যথাস্থানে !
শান দেওয়া কুঠার রাখো কাত করে'
পাত্র সব ভরে' রাখো জলে, যেন শীগগির ধুয়ে ফেলা যায়
রক্তের যত কালো ভয়াবহ দাগ,
এই ধুলির উপরে বিছাও কার্পেট,
যেন বলি নতজানু হয়ে বসতে পারেন রাণীর গৌরবে,
আর তারপর তার ছিন্নশির দেহ যেন কার্পেটে আবৃত হয়ে
অনতিবিলম্বে সগৌরবে নীত হয় সমাধি-ভবনে।

কোরাস ফোর্কীউসকে অনুনয় জানালে এখন মুক্তির উপায় কি তাই বলে দিতে। ফের্কীউস বললে, রাণী হুকুম করলেই সে বলতে পারে। হেলেনা বললে :

আমার অনুচরীরা ভীত হয়েছে হোক ! আমি অনুভব করছি বেদনা,
ভয় নয় কখনো,
তবু উদ্ধারের উপায় তুমি যদি জান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করবো।

এই অবস্থায়ও হেলেনার পতনের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে আঘাত দিতে ফোর্কীউস বিরত হলো না—এমন আঘাত দেওয়াতেই তার আনন্দ। শেষে সে প্রকাশ করলে এক নতুন জাতি ও তাদের রাজার কথা—যে-জাতির লোক তাদের শৌর্যের দ্বারা গ্রীকদেরও বিব্রত করে তুলেছে, হেলেনা ইচ্ছা প্রকাশ করলেই এই রাজার দুর্গাশ্রয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর।

অনুচরীরা রাণীর সম্মতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। হেলেনার চিত্তও দোদুল্যমান। তবু সে বললে ঃ

এই ভয় কি পোষণ করবো আমি যে রাজা মেনেলাউস
এমন অমানুষ হবেন যে আমার উপরে গ্রহণ করবেন প্রতিশোধ ?

ফেকীউস স্মরণ করিয়ে দিলে হেলেনার প্রতি অনুরক্ত প্যারিস-সহোদর ডিফোরুস-কে মেনেলাউস কি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সে টিপ্পনী করলে: সৌন্দর্য অবিভাজ্য, তাকে একবার যে ভোগ করেছে সে বরং তার ধ্বংস সাধন করবে তবু ভাগ করে' ভোগ করবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হেলেনা ফোর্কীউসের প্রস্তাবে রাজি হলো। কুয়াসার আবরণে সে ও তার অনুচরীরা নূতন রাজা ফাউস্‌টের দুর্গে উপনীত হলো।

ফাউস্‌ট মধ্যযুগের 'নাইটে'র বেশে এসে হেলেনাকে অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলে। শাহ্‌নামার প্রণয়ীযুগল বাহরাম ও দিলারা-র ভঙ্গিতে ফাউস্‌ট ও হেলেনা সমিল বাণী বিনিময় করলে (গ্রীক ছন্দ সমিল নয়)।

তাদের মিলন হলো অপূর্বসুখময়। (এই মিলন প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যযুগের সংস্কৃতির মিলনও বটে।) তাদের মধ্যে যে বাণী-বিনিময় হলো তার কয়েকটি ছত্র এই:

হেলেনা:

অনুভব করছি কত দূরে আমি তবু কত নিকটে,
পরম আনন্দ আমার এই কথাটি বলায়—এই আমি এই আমি!

ফাউস্‌ট:

যেন পড়ছে না আমার নিশ্বাস, কাঁপছে আমার দেহ,
বাণী যাচ্ছে মিলিয়ে,
এ যেন স্বপ্ন—নিশ্চিহ্ন হয়েছে দেশ ও কাল।

হেলেনা:

মনে হয় অসার্থক পুরাতন আমি তবু কত নূতন—
সম্মিলিত হয়েছি তোমার সঙ্গে ওগো অজানা, সত্য

ফাউস্‌ট:

জানতে চেয়ো না এমন সৌভাগ্যের তলকূল,
জীবন কর্তব্য—হোক না তা ক্ষণিক।

তাদের আনন্দে ফোর্কীউস কিঞ্চিৎ বিঘ্ন উৎপাদন করলে এই সংবাদ দিয়ে যে রাজা মেনেলাউস সসৈন্যে ফাউস্‌টের রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। ফাউস্‌টের নিপুণ শাসন-ব্যবস্থায় সহজেই তার রাজ্য শক্তিশালী হয়েছিল, ফাউস্‌ট নিজের প্রবলতর শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ রইল। তার নিজের রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ কেমন যোগ্যভাবে শাসিত হচ্ছে, জনগণ সে সব প্রদেশে কেমন সুখী ও সক্ষম তা সে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে। এই সম্পর্কে তার এই উক্তি বিখ্যাত:

প্রকৃতি যেখানে সঞ্চরণ করে অনাবিল ধারায়
সেখানে পরস্পর-সম্বদ্ধ হয়েছে (লৌকিক ও অলৌকিক) সমস্ত জগৎ।

ফাউস্টের এই আদর্শ রাজ্যের নাম আর্কেডিয়া, যার সর্বময় কর্ত্রী—বিধানদাত্রী ও প্রেরণাদাত্রী—হেলেনা অর্থাৎ চিরজাগ্রত সৌন্দর্য বোধ।

এই সুখনীড়ে ফাউস্ট ও হেলেনার এক পুত্রলাভ হলো—নাম ইউফোরিয়ন। জন্মেই সে হলো দুর্দান্ত, তার হাসি-উল্লাস-চীৎকারে কম্পিত হলো এই সুখনীড়। কবি তাকে বলেছেন নগ্ন প্রতিভা—শয়তানের মতো কিন্তু শয়তানী-বর্জিত।

এই ইউফোরিয়ন হচ্ছে মূর্ত কবিপ্রেরণা। কোরাস জানালে সেকালের জেউস পুত্র হার্মেসের অর্থাৎ মার্কিউরি-র সঙ্গে রয়েছে এর সৌসাদৃশ্য—শিশু হার্মেস পিতা জেউসের বজ্র অপসারণের চেষ্টা করেছিল।

ইউফোরিয়নকে লাভ করে' হেলেনা ও ফাউস্ট তাদের মিলন সার্থক জ্ঞান করলে, হেলেনা বললে :

প্রেম যদি মানবজীবনে আনন্দময় হতে চায়
তবে প্রকাশিত হোক মহদাশয় দম্পতিতে ;
আর যদি আমাদের দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চায়
তবে প্রকাশিত হোক শোভন ত্রয়ীতে।†

ইউফোরিয়নের আনন্দময় নর্তন তাদের হৃদয় পুলকপূর্ণ করলো। কিন্তু অচিরে ইউফোরিয়ন একান্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলো। যা সহজে লাভ হয় তাতে তার আনন্দ নেই, তার আনন্দ জয় করে' নেওয়ায়, লুট করে নেওয়ায়। এক কিশোরীকে সে বলে আকর্ষণ করলে, কিশোরী বললে : যে নির্বোধ তাকে বলে লাভ করতে চায় তাকে সে দেয় পুড়িয়ে।

ইউফোরিয়নের প্রাণ গৃহের আওতায় অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে উঠলো, সে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো—সে বললে :

স্বাধীন গৃহে বসবাস করতে চাও ?
তবে হও অস্ত্রে সুসজ্জিত, ছোটো সংগ্রামে !
স্ত্রীদের কর বীরাঙ্গনা
আর পুত্রদের কর বীর।

তার পিতামাতা তাকে সংযত হবার জন্যে বহু উপদেশ দিলে, বহু অনুনয় বিনয় করলে। কিন্তু সব বৃথা। সে উদ্দাপনায় পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মৃত ইউফোরিয়নের মুখে ফুটে উঠলো এক পরিচিত চেহারা

† তুলনীয় :

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্॥

শকুন্তলা—সপ্তম অঙ্ক।

—অর্থাৎ কবি বাইরনের চেহারা। তার দেহ ধূমকেতুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল, তার পোষাক ও বীণা পড়ে রইল। এক মহা শোকধনি উত্থিত হলো।

বাইরনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব গ্যেটের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল আমরা জানি। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর মৃত্যু গ্যেটেকে তাঁর হেলেনা-কাব্য পূর্ণাঙ্গ করতে প্রেরণা দেয়। ইউফোরিয়নের উদ্দামতায় সাধারণভাবে রোমান্টিক কবির ও বিশেষভাবে বাইরনের ছবি ফুটেছে।

ইউফোরিয়নের মৃত্যুতে কোরাস শোকগাথা গাইলে, সেটি স্পষ্টভাবেই বাইরনের উদ্দেশ্যে গ্যেটের শোক। তার কয়েকটি স্তবক এই :—

…আমাদের সাহস হয় না তোমার জন্ম শোক করি,
ঈর্ষান্বিত হযে আমরা গাই তোমার সৌভাগ্যের গান :
তোমার সঙ্গীত ও বীর্য প্রকাশ পেয়েছে
উজ্জ্বল সূর্যালোকে, ঝঞ্ঝার বিক্রমে।

জন্মেছিলে তুমি সংসারে ভাগ্যবান্ হবার জন্যে,
ছিল তোমার শক্তি ও কুলগৌরব
তারুণ্যের ভুলে, আবেগ-প্রাবল্যে,
হায় অকালে দীর্ণ হলো তোমার যৌবন!
ছিল তোমার বিশ্বভেদী দৃষ্টি
ছিল প্রতি অবিচারের জন্ম বেদনা ;
শ্রেষ্ঠা নারীর বুকে ছিল তোমার জন্ম প্রেম,
ছিল তোমার প্রাণমাতানো নিজস্ব গান।

ছুটেছিলে তুমি বাধাবন্ধহীন
খেয়ালের ফলাও জালের পানে :
বিষম সাহসে ছিন্ন করেছিলে
আচারের বন্ধন, বিধানেরও বন্ধন :
কিন্তু অবশেষে মহৎ চিন্তা
গৌরবদান করেছিল তোমার সাহসকে :
মহত্তমের জন্ম হয়েছিলে তুমি প্রয়াসী,
কিন্তু হায়, সাফল্য নয় তোমার ললাট-লিখন।

কার ভাগ্যে তবে সেই সাফল্য? কঠিন প্রশ্ন এ,
বিধি মুখ বুজে শোনে এই প্রশ্ন,

আর দীর্ঘায়িত দুর্দিনে
নীরব ব্যথায় কাঁদে জনগণ।
কিন্তু তবু ধ্বনিত হবে তাদের কানে এই নতুন গান :
অবনমিত হয়ে থেকো না আর !
এই সঙ্গীতের জন্ম হবে মাটির বুক থেকে
যেমন জন্ম হয়েছে চিরকাল।

ইউফোরিয়নের শোকে অধীর হয়ে হেলেনা বললে :

হায়···সুন্দরের ভাগ্যে সুখ চিরদিন অচিরস্থায়ী।

সে তার পুত্রসহ পার্সিফোনির শরণাপন্ন হলো। ফাউস্টকে সে আলিঙ্গন দান করলে, তার দেহ বিলীন হয়ে গেল, ফাউস্টের হাতে রইল তার পোষাক ও গুণ্ঠন। ফোর্কীউস ফাউটস্কে বললে এই বহুমূল্য চিহ্ন সবলে আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু এই পোষাকও আকাশে বিলীয়মান হলো, আর ফাউস্টকে বেষ্টন করে' তাকে ঊর্ধ্বগ্রামে নিয়ে গেল। ফোর্কীউস ইউফোরিয়নের পোষাক ও বীণা কুড়িয়ে নিয়ে বললে :

যা পেয়ে গেছি তারও দাম খুব !
জ্বলন্ত শিখা গেছে নিভে,
তাতে ঘটেনি জগতের কোনো শোকের কারণ।
যতটুকু আছে তাতেই চলবে কবিদের,
তা দিয়েই ছড়ানো যাবে তাদের দলে ঈর্ষা-বিদ্বেষ :
প্রতিভা দান করবো এমন ক্ষমতা আমার নেই,
কিন্তু দিতে পারবো অন্তত প্রতিভার পোষাক।

হেলেনার অনুচরীদের নায়িকা বললে, সে করবে তার কর্ত্রীর অনুগমন, একাগ্র সেবার পথেই তার লাভ হবে জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। কিন্তু অনুচরীরা আর তাদের কর্ত্রীর অনুগমন করলে না কেননা তারা বৈশিষ্ট্যলাভ করেনি কোনো দিক দিয়ে—তারা বিলীন হলো প্রকৃতির ফলে ফুলে পল্লবে সরিতে শৈলে।

হেলেনার পোষাক ফাউস্টকে ঊর্ধ্বগ্রামে বহন করে' নিয়ে গেল—অর্থাৎ সৌন্দর্যের দুর্লভ অনুভূতি ও চর্চা তাকে মহত্তর মানসলোকে উন্নীত করলে। সৌন্দর্য-চর্চার এই দীপনী শক্তি সম্বন্ধে গ্যেটে ও শিলার নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এই চিন্তা তাঁদের ও তাঁদের যুগের বিশিষ্ট দান।*

* সৌন্দর্য-বোধের দীপনী শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আস্থা স্মরণীয়।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্য—উচ্চ পর্বতমালা। একখণ্ড মেঘ এসে নামলো এক পর্বতশীর্ষে, তারপর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। মেঘ থেকে বেরিয়ে ফাউস্ট বললে:

নিম্নে গভীর স্তব্ধতার পানে তাকিয়ে,
আমি দৃঢ়পদে বিচরণ করছি এই শিখরের নির্জন পথে,
আমার মেঘের রথ করেছি বর্জন, তাতে
রৌদ্রালোকিত দিনে সুখে সঞ্চরণ করেছি জলস্থলের উপর দিয়ে।§

যে মেঘ তাকে বহন করে এনেছিল তার বিচিত্র রূপ-পরিবর্তন সে আনন্দিত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। সেই মেঘ শেষে ধারণ করলে এক মহীয়সী দেবী-মূর্তি—যেন জুনো, লেডা, অথবা হেলেনার মূর্তি। তা বদলে গিয়ে হলো যেন তুষার-মণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ। তাও বদলে গিয়ে এক কোণে ধারণ করলে এক অতি মনোহর মূর্তি—ফাউস্টের প্রথম-প্রণয়িনী-মূর্তি। ফাউস্ট অনুভব করলে এই মূর্তি তার কত বড় আনন্দ-ধন—এর সঙ্গে তুলিত হতে পারে এমন কিছুই নেই জগতে। সে বললে:

আত্মার সৌন্দর্যের মতো এই প্রসন্ন মূর্তি উধ্বর্গামিনী হয়েছে,
বিলীন হতে জানে না এ, আরোহণ করছে উধ্বর্তর গ্রামে,
এর অনুগামী হয়েছে আমার অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অর্থাৎ—ফাউস্টকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার উধ্বের্ উঠিয়েছে তার সৌন্দর্য-বোধ আর প্রথম জীবনের গভীর প্রেম।

রূপকথার মায়াজুতার সাহায্যে মেফিস্টোফিলিস উপস্থিত হলো এই উত্তুঙ্গ ক্ষেত্রে, বললে:

হাঁ, অনেক দূর এগিয়ে এসেছ বটে!
কিন্তু বল আমাকে কি সুখ পাচ্ছ
এমন ভয়ানক স্থানে বাস করে',
এমন চোখা-মাথা পাথরের স্তূপের মধ্যে?

কী ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর কুক্ষি থেকে এই সব পাহাড়ের জন্ম হয়েছিল সে সম্বন্ধে সে বিস্তারিত বর্ণনা করে' বললে, যা ছিল নীচেকার ব্যাপার এখন সে সব উঠেছে উপরে। ফাউস্ট বললে:

পর্বতের স্তূপ আমার কাছে অপরূপ ভাবে মূক
জানতে চাই না আমি তারা এল কোথা থেকে, কেন।

---

§ শকুন্তলার শেষ দৃশ্যে দুষ্মন্তের মেঘের দেশে ভ্রমণ স্মরণীয়।

প্রকৃতি যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বোধ করেছিল আপন সত্তায়,
তখন শোভা পেয়েছিল তার বুকে পূর্ণগঠিত ধরিত্রী,
শোভা পেয়েছিল পাহাড়ের চূড়া আর গভীর খদ,
উঠেছিল পাথরের পর পাথরের স্তুপ, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ,
ধীরে নেমেছিল পাহাড়ের ঢাল,
তার পাদমূলে ব্যাপ্ত হয়েছিল উপত্যকা।
তার আনন্দ সবুজের ও শস্যের সমারোহে
প্রয়োজন নেই তার উন্মত্ত পরিবর্তনের।

সবপ্রকার বিপ্লববাদের প্রতি এ গোটের এক পূর্ণাঙ্গ উত্তর। —জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর এই মত অবশ্য বহুমূল্য কেননা "বড় ব্যাপার হচ্ছে গঠন, ধ্বংস নয়, সেই গঠনেই মানুষের অনাবিল আনন্দ।" কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়—সঙ্গতও হয়ত নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর এই সীমানির্দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষাকৃত অসাফল্যের হেতু, এক শ্রেণীর সমালোচকের এই মত।

এই সমুন্নত ক্ষেত্রে ফাউস্টের মনে এক মহৎ পরিকল্পনার উদয় হলো। মেফিস্‌টোকে সে তার মনের সেই ভাব অনুমান করতে বললে। মেফিস্‌টো বললে ফাউস্ট কোনো জনাকীর্ণ নগরের অধিস্বামী হতে চাচ্ছে, কিংবা সুন্দরীসমাকীর্ণ এক প্রাসাদ চাচ্ছে। এইভাবে সে ফাউস্টকে প্রলুব্ধ করতে চাইলে প্রভুত্ব ও ভোগ-বিলাসের দিকে। কিন্তু যখন জানলে, এসবে ফাউস্টের রুচি নেই তখন তাকে বিদ্রূপ করলে এই বলে যে সে চন্দ্রলোকের কাছাকাছি উঠেছে, হয়ত সেই চন্দ্রলোকে যাবার খেয়াল তাতে জেগেছে। ফাউস্ট বললে, এই পৃথিবীতেই এখনো মানুষের জন্য রয়েছে অনেক বড় কাজের অবসর। সে প্রকাশ করলে, সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ আর সেই তরঙ্গ-ভঙ্গের ফলস্বরূপ উপকূলের বিস্তীর্ণ অনুর্বরতা তার অসহ্য, সে চায় প্রাকার রচনা করে সেই তরঙ্গভঙ্গের সীমানির্দেশ করবে আর, এমনিভাবে এক নূতন সমৃদ্ধ বসতি গড়ে তুলবে। সে মেফিস্‌টোকে আহ্বান করলে তার এই ইচ্ছা সফল করতে। (অর্থাৎ সৌন্দর্য-ধ্যান থেকে ফাউস্টের গতি হলো মহৎ কর্মব্রতের দিকে।)* মেফিস্‌টো বললে একাজ কঠিন নয় কিন্তু আগে সমুদ্রতীর পত্তন নিতে হবে; সেই সুযোগ এখন উপস্থিত, কুশাসনের ফলে সম্রাটের এক প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে, এই যুদ্ধে তারা যদি সম্রাটকে জয়ী করতে পারে তবে সহজেই পেয়ে যাবে এই পত্তন। এই সম্পর্কে কুশাসনের মূল কারণ সম্বন্ধে ফাউস্টের এই উক্তি বিখ্যাত:

…শাসন-ভার যার হাতে
তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রকাশ পাক সেই শাসনে
…ভোগাকাঙ্ক্ষা ঘটায় তার অধোগতি।

* রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা ও বিচিত্র শুভ-সাধনা স্মরণীয়।

এখানে নাকি রয়েছে নেপোলিয়নের পতনের কারণের প্রতি গ্যেটের ইঙ্গিত। এই সম্পর্কে ফাউস্টের অন্য একটি উক্তিও স্মরণযোগ্য!

কর্মই সার, কীর্তি অসার।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সেতুমুখ।

নীচে বাজছে যুদ্ধের বাজনা। সম্রাটের শিবির স্থাপিত হয়েছে।

সম্রাটের সেনাপতি খুব কৌশলে ব্যূহ রচনা করলে। কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রবল হলো। মেফিস্টোর জাদুবিদ্যা ও শত্রুপক্ষে ভেদসৃষ্টির ফলে শেষে সম্রাট-পক্ষ জয়ী হলো। মেফিস্টো যুদ্ধে নেমেছিল তিন জবরদস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে। তার এই সব অনুচরে প্রকাশ পেয়েছে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক নৃশংসতা ও লোভ।

তৃতীয় দৃশ্য—শত্রু-শিবির।

মেফিস্টোর তিন জবরদস্ত অনুচর ইচ্ছামতো লুটতরাজ করলে। তারপর প্রবেশ করলেন সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে সম্রাট। সঙ্কটে পড়ে সম্রাট মনে করেছিলেন এবারে তিনি চলবেন ঠিক পথে, কিন্তু কাজে আর তা হয়ে উঠ্‌লো না। তিনি রাজ্যের ভার ন্যস্ত করলেন তাঁর সামন্তদের উপরেই, জনসাধারণের উপরে ইচ্ছামতো কর ধার্য করবার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হলো। প্রধান যাজক গির্জার জন্য বহু ভূমি ও বিত্ত লাভ করলেন বিশেষ করে যুদ্ধে সম্রাট যে জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়েছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। পাপাত্মা ফাউস্টকে সমুদ্রতীর পত্তন দেওয়া হয়েছিল, তারও উপরে তিনি দাবি জানালেন। এই প্রধান যাজক তাঁর সম্প্রদায়ের লোভ ও চক্রিতার প্রতিমূর্তি।—রাজ্যের অশান্তির মূলে প্রধানত যাজক-সম্প্রদায়, গ্যেটে এই মত পোষণ করতেন।

পঞ্চম অঙ্কের সাতটি দৃশ্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে এক ধর্মভীরু বৃদ্ধ দম্পতির অনাড়ম্বর কিন্তু সদয়তাপূর্ণ জীবনযাত্রার ছবি আঁকা হয়েছে; আর সেই সঙ্গে আভাস দেওয়া হয়েছে ফাউস্ট সমুদ্রকূলে বাঁধ দিয়ে এক বড় সমৃদ্ধ বসতির আয়োজন করেছে।

তৃতীয় দৃশ্য—ফাউস্টের প্রাসাদ; তাতে প্রশস্ত উদ্যান, তার পাশে যত্নে কাটা খাল, অতি বৃদ্ধ ফাউস্ট পায়চারি করছে, তাকে দেখাচ্ছে গম্ভীর।

অদূরের বৃদ্ধ দম্পতির পারিবারিক গির্জার ঘণ্টাধ্বনি তার কানে গেল। সে খুব বিরক্তি বোধ করলে, আরো এই জন্যে যে বৃদ্ধ দম্পতির ভাঙা কুটির তার প্রাসাদ-অঙ্গনের গৌরব ও পরিকল্পনা ক্ষুণ্ণ করেছে।

শীগগিরই মেফিস্টো এসে হাজির হলো তার তিন জবরদস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে। তারা গিয়েছিল বাণিজ্যে। বাণিজ্যের সঙ্গে এদের চলেছে লুটতরাজ; এ সম্পর্কে মেফিস্টোর এই শ্লেষ বিখ্যাত :

যুদ্ধ বাণিজ্য আর লুণ্ঠন,
এই তিন এক—অবিচ্ছেদ্য।

কিন্তু এই সব ধনরত্ন দেখে ফাউস্ট খুশী হলো না। তাকে লোভের জালে বন্দী করবার জন্য মেফিস্টোর গূঢ় অভিসন্ধি এইভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

ফাউস্ট মেফিস্টোকে হুকুম করলে এই বৃদ্ধ দম্পতির জন্য যে নতুন বাড়ী তৈরি হয়েছে সেখানে তাদের সরিয়ে দিতে।

চতুর্থ দৃশ্য—নিশীথ রাত্রি।

ফাউস্টের প্রাসাদের রক্ষী দেখলে বৃদ্ধ দম্পতির কুটীর দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে হায় হায় করতে লাগলো। তার আর্তস্বরে ফাউস্ট বাইরে বেরিয়ে দেখলে এই অগ্নিকাণ্ড! সে নিজেকে বোঝালে, বাড়ী গাছপালা সব পুড়ে গেলেও নতুন বাড়ীতে সুখে বাস করে' বুড়োবুড়ী এই ক্ষতির কথা ভুলে যাবে।

মেফিস্টো আর তার তিন অনুচর এসে সংবাদ দিলে বুড়োবুড়ী সহজে নড়ল না দেখে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। ফলে বুড়োবুড়ী পড়ে মারা যায়; তাদের বাড়ীর লোকদের সঙ্গে তাদের হলো ধ্বস্তাধ্বস্তি, তাতে শেষ পর্যন্ত বুড়োবুড়ীর বাড়ীতে আগুন লেগে গেল, সেই আগুনে বুড়োবুড়ীর সৎকার হয়েছে।

এই সংবাদে ফাউস্ট একান্ত দুঃখিত হলো। সে এমন অত্যাচার করতে হুকুম করেনি, সে মাত্র চেয়েছিল বুড়োবুড়ীকে নতুন বাড়ীতে সরিয়ে দিতে। মেফিস্টো আর তার অনুচরদের সে খুব তিরস্কার করলে। তারা চলে গেল।—ক্ষমতালাভের সঙ্গে পর-পীড়ন কত অপরিহার্যভাবে যুক্ত হয়ত এই ইঙ্গিত কবি এখানে দিয়েছেন। অন্যায় যত সামান্যই হোক তার পরিণাম সাধারণত ভয়াবহ, সেই ইঙ্গিতও এখানে রয়েছে মনে হয়।

পঞ্চম দৃশ্য—অভাব, অপরাধ, দুশ্চিন্তা, অস্বস্তি, এই চার বুড়ী ফাউস্টের গৃহের সামনে দেখা দিল। তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ফাউস্টের বদ্ধ দ্বারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারলে। তাকে দেখে ফাউস্ট হুকুম করলে চলে যেতে, কিন্তু সে বললে: আমি এখান থেকে নড়বো না⋯এর পূর্বেই দুশ্চিন্তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি? ফাউস্ট বললে: সে আকাঙ্ক্ষা করেছে আর সংসারের পথে বীর-বিক্রমে ছুটে চলেছে, থেমে দাঁড়ায়নি কোনো দিন; দুশ্চিন্তা অনুশোচনা এসব শক্তিমানের জন্য নয়, জগৎ তার জন্য অর্থপূর্ণ—মিটমিটে চোখে তাকে পরকালের পানে চাইতে হয় না, যা তার পাবার এখানেই সে পেতে পারে। (গ্যেটের বিখ্যাত Here and Now "উপস্থিত ক্ষেত্রে ও উপস্থিত কালে" তত্ত্ব স্মরণীয়)।

কিন্তু দুশ্চিন্তা-বুড়ীর নিশ্বাসে ফাউস্ট অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ হয়ে সে অনুভব করলে তার অন্তর পূর্ণভাবে আলোকিত হয়েছে, ঈশ্বরের বাণী এখন তার একমাত্র বল

—অর্থাৎ তার বিবেক পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়েছে। সে তার আরব্ধ কর্ম পূর্ণ উদ্যমে সম্পন্ন করে' চললো।

ষষ্ঠ দৃশ্য—ফাউস্‌টের প্রাসাদের বিস্তীর্ণ বহিরাঙ্গন। মজুরেরা বাঁধ তৈরির কাজে খেটে চলেছে। ফাউস্‌ট হাতড়াতে হাতড়াতে তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। মজুরদের কোদালের শব্দে সে গভীর আনন্দ বোধ করলে।

এক পার্বত্য অঞ্চলের নীচেকার জলাভূমি থেকে জল বের করে' তাকে বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে এই হচ্ছে ফাউস্‌টের নতুন পরিকল্পনা। সে বলছে :

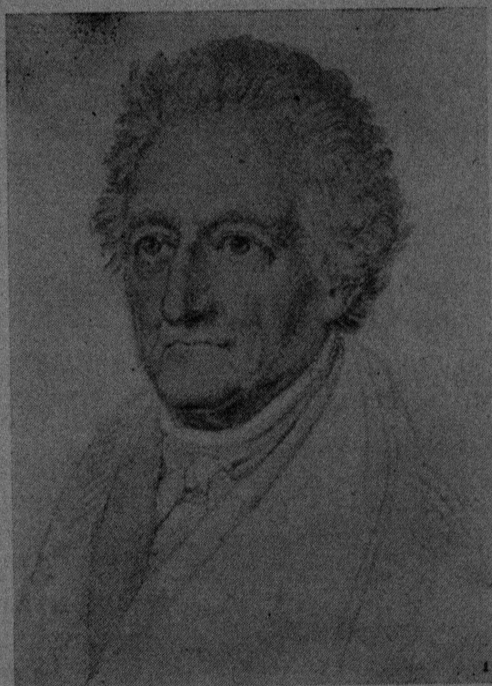
এর মধ্যদেশে শোভা পাবে নন্দনতুল্য ক্ষেত্র ;
পাশে গর্জন করে' ফিরবে সমুদ্র,
তাকে করবে দংশন, কিন্তু বলে ভাঙ্‌তে পারবে না বাঁধ,
সমস্ত অধিবাসী সহজভাবে সম্মিলিত হবে তার রক্ষা হেতু।
হাঁ! এই চিন্তা আমার দৃঢ় অবলম্বন,
এর 'পরে মুদ্রিত রয়েছে চরম জ্ঞানের স্বাক্ষর :
স্বাধীনতা ও জীবন তারই লভ্য ও ভোগ্য
যে প্রত্যহ নতুন করে' জয় করে এ দুটি।
এমনিভাবে বিপদ-ঘেরা পরিবেশে অতিবাহিত হবে
বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়কালের শক্তিগর্বিত দিন :
আমার চোখের সামনে দেখতে পাব কর্মনিরত জনসঙ্ঘ—
স্বাধীন ভূখণ্ডের উপরে স্থান গ্রহণ করবো স্বাধীন জনগণের মধ্যে !
চলমান মুহূর্তকে তখন বলতে পারবো :
আর একটুকু থাকো—এত সুন্দর তুমি !
আমার পার্থিব জীবনের চিহ্ন
তখন আর কালে লবে না বিলীন।
সেই মহিমময় স্বার্থকতার ভাবনায
অনুভব করছি এখন পরম মুহূর্ত !

এই ব'লে ফাউস্‌ট শেষ নিশ্বাস মোচন করলে।

ফাউস্‌ট যাকে পরম মুহূর্ত বললে মেফিস্‌টোর চোখে তা অর্থহীন। সে ফাউস্‌টের এত দিনের জীবনযাত্রার কথা ভেবে বললে :

খুশী করতে পারেনি তাকে কোনো স্ফূর্তি, আনন্দিত করতে
পারেনি কোনো সুখ !

সে পিছু নিয়েছিল বহুরূপী মূর্তির।



একটি শেষ প্রতিকৃতি

এই শেষ হীনতম বিফলতম মুহূর্তকে
সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল চিরদিনের ধন বলে'।
আমাকে সে প্রতিহত করেছিল এমন প্রবল শক্তিতে,
কিন্তু সবার প্রভু কাল, বৃদ্ধ এখন শুয়েছে ধূলার পরে!
......সব হলো এইবার শেষ!

সে উত্তেজিত হয়ে বললে:

......সব শেষ তার অর্থ অনন্ত নাস্তি!
তবে কেন এই সৃষ্টির অন্তহীন খেলা?
যদি সবেরই গতি বিনাশের দিকে?
"সব হলো শেষ"—কি অর্থ এর?
কিছু না হলেই ত হতো ভাল।
চলেছে এই খেলার চক্র, যেন আছে এর অর্থ
আমি হলে চাইতাম—অনন্ত শূন্যতা।

মেফিস্টো ভাবলে সে ফাউস্টকে আয়ত্ত করতে পেরেছে কেননা ফাউস্ট স্বীকার করেছে সে খুশী হয়েছে। সে ডাকলে তার অনুচরদের ফাউস্টকে নরকে নিয়ে যাবার জন্যে। মেফিস্টোর বিকটমূর্তি অনুচরেরা এসে হাজির হলো; নরক তার বিভীষণ মুখ ব্যাদান করলে। কিন্তু উপর থেকেও নেমে এলো স্বর্গের আশীর্বাদ: দেবদূতরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। সেই পুষ্পবৃষ্টি শয়তানদের জন্য হলো অগ্নিবৃষ্টি। তারা আসর ছেড়ে সরে দাঁড়াতে লাগলো আর আসর দখল করলে দেবদূতরা। বালকবেশী দেবদূতদের পরমমনোহর মূর্তি দেখে মেফিস্টো মোহিত হলো। এমন মোহে যখন সে বিহ্বল তখন দেবদূতরা ফাউস্টের অমর অংশ আয়ত্ত করে' আকাশগামী হলো।

এই সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে মেফিস্টোকে এখানে কতকটা জোর করে' হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা যে রূপজ মোহ শেষ মুহূর্তে তাতে দেখা দিল আর তার ফলে সে ফাউস্টের আত্মার উপরে অধিকার হারালো তা তাতে আরোপ করা হয়েছে, তার প্রকৃতি-অনুযায়ী হয়নি।

কিন্তু এ সমালোচনা সঙ্গত মনে হয় না। মেফিস্টোর চরিত্রে শেষ মুহূর্তে যে দুর্বলতা দেখা দিল সেটি গ্যেটের জীবনে উল্‌রিকার প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়, কাজেই 'অস্বাভাবিক' নয়। কুশাগ্রবুদ্ধিরাও মাঝে মাঝে এমন জালে পড়ে এই হয়ত কবির ইঙ্গিত। তাছাড়া মেফিস্টোর যে ধারণা যে ফাউস্ট তার অধিকারে এসেছে যেহেতু সে সন্তোষ জ্ঞাপন করেছে সেটি ত ভুল কেননা ফাউস্ট যেজন্যে সন্তোষ জ্ঞাপন করলে তা মেফিস্টোর ধারণার বহির্ভূত ব্যাপার—ফাউস্টের সেই খুশীর মুহূর্ত তার মতে হীনতম বিফলতম মুহূর্ত। অন্য কথায় ফাউস্ট তার অতন্দ্রিত শুভ-ইচ্ছা ও শুভ-

সাধনার দ্বারা নিজেকে যে স্তরে উন্নীত করেছে সেখানে সে প্রকৃতই মেফিস্‌টোর অধিকারের বাইরে গিয়ে পড়েছে। "আলাপে" গ্যেটে বলেছেন: ফাউস্‌টের মুক্তির মূলে রয়েছে তার স্বভাবদত্ত কর্মশক্তি যা ক্রমাগত হয়ে চলেছে মহত্তর ও নির্মলতর, আর তার সঙ্গে তার লাভ হয়েছে ঊর্ধ্বের শাশ্বত করুণা।

সপ্তম দৃশ্য—পার্বত্য অঞ্চল, অরণ্য, মরুভূমি।

যেমন ফাউস্‌ট প্রথম খণ্ডের স্বর্গে প্রস্তাবনার উপরে পড়েছে বাইবেলের Book of Job-এর ছায়া তেমনি ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ডের এই শেষ দৃশ্যের উপরে পড়েছে দান্তের "ডিভাইন কমেডি"র স্বর্গবর্ণনার ছায়া। মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি নয়—এই ধারণা গ্যেটে পোষণ করতেন আমরা জানি।

এই দৃশ্যের সূচনায় পুণ্যচরিত যতীদের স্তব, সেই স্তবে বলা হয়েছে পর্বত ও অরণ্যের বিরাটত্বের কথা, গর্জমান নির্ঝরের কথা, আর শান্তস্বভাব সিংহদের কথা—এই প্রদেশকে তাঁরা বলেছেন প্রেম ও করুণার ধাম।*

এর পর তিন ভক্তপ্রধানের স্তব। ভারতীয় ভাষায় এঁদের নামকরণ হতে পারে ভাবানন্দ, গম্ভীরানন্দ, তুরীয়ানন্দ। ভাবানন্দের স্তবে রয়েছে ঊর্ধ্বতর গ্রামে উন্নীত হবার জন্য আত্মার আকুলি-বিকুলি, গম্ভীরানন্দের স্তবে রয়েছে গভীর সত্যদৃষ্টি ও পরিচ্ছন্ন আলোক লাভের জন্য কামনা, আর তুরীয়ানন্দের স্তবে রয়েছে অধ্যাত্মদৃষ্টিলাভে উল্লাস।

এর পর করুণা-অভিষিক্ত বালকদের গান—যারা জন্মক্ষণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। জীবনের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা তাদের লাভ হয়নি, তাই আধ্যাত্মিক জগতেও আজো তারা অবিকশিত, তারা শুধু কিঞ্চিৎ জীবনানন্দ। তারা বিকশিত হবে যখন তাদের অন্তরে জাগবে বিকাশের আগ্রহ।

ফাউস্‌টের অমর অংশ নিয়ে দেবদূতরা ঊর্ধ্বতর গ্রামে আরোহণ করছে আর গান গাচ্ছে:

এই মহৎ আত্মা এখন হয়েছে মুক্ত
মন্দের বাঁধন থেকে।
যে কেউ অগ্রগামী হয় অবিচলিত প্রযাসে
তাকে আমরা করতে পারি উদ্ধার।
তার সঙ্গে যদি লাভ হয় তার
স্বর্গের করুণা—তবে ঊর্ধ্বের
করুণা-অভিষিক্ত দেবদূতগণ
বিজ্ঞাপিত করবে তাকে স্বাগতম্।

* তুলনীয়: স্বর্গাদধিকতরং নিবৃত্তিস্থানম্...।—আমাদের মনে হয়েছে শকুন্তলার শেষ অঙ্কের কিঞ্চিৎ ছায়াও ফাউস্‌টের শেষের অংশের উপরে পড়েছে; তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা উদ্ধৃত করেছি। সমালোচকরা অবশ্য একথা বলেন নি।

তরুণ দেবদূতরা উল্লাস প্রকাশ যে শয়তানের দলকে হারিয়ে দিয়ে তারা ফাউস্টের অমূল্য আত্মার উদ্ধার সাধন করতে পেরেছে, আর পরিণতিপ্রাপ্ত দেবদূতরা বললে :

দুর্বহ হয়েছে আমাদের জন্য
এই মাটির-ঋণে-আবদ্ধ আত্মার ভার ;
······স্বভাবত নির্মল হলেও
হতে পারতো না নিষ্কলঙ্ক।
মনের প্রবল শক্তির বেগে
যখন জট পাকিয়ে যায় উপাদানে উপাদানে,
তখন কোনো দেবদূতের সাধ্য হয় না
সেই জটিল বন্ধ মোচন করা ;
কেবল শাশ্বত প্রেম
খুলতে পারে সেই জট।

দেবদূতদের পরে ফাউস্টের আত্মাকে আরো উর্ধ্বগ্রামে নিয়ে যাবার ভার পড়লো করুণা-অভিষিক্ত বালকদের উপরে। ফাউস্টের মাটির বন্ধন ক্রমেই খসে পড়তে লাগলো আর তার জ্যোতি ও মহিমা বেড়ে চললো। বালকেরা বললে তাদের বিকাশের গুরু হবে অশেষ-অভিজ্ঞতাশালী ফাউস্ট।

ফাউস্টের আরো উর্ধ্বগতির জন্য করুণা-মূর্তি মেরী-মাতার কাছে প্রার্থনা জানালে খৃষ্টান-জগতের মার্জনাপ্রাপ্তা তিন বিখ্যাত পাপিনী আর মার্গারেট। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মার্গারেটের অনুসরণে ফাউস্ট উঠতে লাগলো উর্ধ্বতর লোকে যেমন বিয়াত্রিচের অনুসরণে দান্তে অধিরোহণ করেছিলেন উচ্চ হতে উচ্চতর স্বর্গলোক।

এই সব রূপক সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন :

> এমন সব অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের বর্ণনায় আমাকে হয়ত অস্পষ্টতায় তলিয়ে যেতে হতো যদি খৃষ্টান ধর্মের সুস্পষ্ট রূপ-কল্পনা ও প্রতীকের সাহায্যে আমি আমার বক্তব্য শোভন ও পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে চেষ্টা না করতাম।

সর্বশেষে এই কোরাস গান, নাম Chorus Mysticus—রহস্যময় কোরাস

নশ্বর যা কিছু
সবই প্রতীক ;
যা অপূর্ণ
এখানে বিকশিত হয় পূর্ণতায় ;

যা অবর্ণনীয়
রূপায়িত হয় তা এইখানে :
শাশ্বতী নারী
চালিত করে উর্ধ্বপানে।

শাশ্বতী নারী বলতে বোঝা হয়েছে নারীর আত্মভোলা প্রেম যাতে নারীর চির-দিনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কেউ কেউ বলেছেন, এই সঙ্গে নারীর মনোহারিতাও বোঝা হয়েছে।

ফাউস্ট নাটকের শেষে গ্যেটে যাকে চরম জ্ঞান বলেছেন—

স্বাধীনতা ও জীবন তারই লভ্য ও ভোগ্য
যে প্রত্যহ নতুন করে' জয় করে এ দুটি

সে-আদর্শকে একালের খ্যাতনামা লেখক আভিং ব্যাবিট (এবং বোধ হয় তাঁরই অনুসরণে কবি টি, এস্, এলিয়ট) স্বল্পমূল্য জ্ঞান করেছেন এই বিবেচনায় যে মানুষের সত্যকার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে আত্মজয়, সেই আত্মজয় উপেক্ষা করে' এখানে সদয় কর্মতৎপরতার কথা বলা হয়েছে। আমাদের ধারণায় ব্যাবিট (এবং টি, এস্, এলিয়ট) এখানে গ্যেটেকে ভুল বুঝেছেন। বৃদ্ধ দম্পতিকে বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে যে দুর্ঘটনা ঘটলো মহদাশয় ফাউস্টের জীবনে সেইটি হচ্ছে শেষ ভুল। তারপর সে অন্ধ হয়ে গেল ও অন্তরে লাভ করলে পূর্ণ আলোক ; ভগবানের বাণী—অর্থাৎ পূর্ণ-উদ্‌বোধিত বিবেকের বাণী—হলো তার একমাত্র বল। সমুদ্রকূলে তার বাঁধতৈরিও শুধু প্রকৃতি-শাসন নয় প্রবৃত্তি-শাসনের ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীকও বটে। শুধু আত্মজয়কে গ্যেটে অবশ্য মানুষের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান করেন নি কোনোদিন—ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টারের সুন্দর-আত্মার কাহিনীর শেষ অংশ স্মরণীয় —একই সঙ্গে আত্মজয় আর প্রকৃতিজয়, অথবা নিজের জন্য ও বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ-সাধন, তিনি যে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ কাম্য জ্ঞান করেছেন এর চাইতে অর্থপূর্ণ আদর্শের কথা ভাবা কঠিন। সেই সঙ্গে তাঁর এই গূঢ় ইঙ্গিত স্মরণে রাখার যোগ্য যে আত্মজয় অতি কঠিন ব্যাপার, মানুষের সজাগ ইচ্ছাশক্তি যেন এর জন্য যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে যাঁদের সিদ্ধিলাভ ঘটে তাঁদের বলা যেতে পারে ভাগ্যবান্।

এই কঠিন আত্মজয়ের—কবির ভাষায় "বিকাশের আনন্দে"র—বিচিত্র ছবি ও বিচিত্রতর ইঙ্গিত ফাউস্টে আছে বলেই জীবন আলেখ্য আর জীবন-দর্শন হিসাবে এর মত মর্যাদা। জগতের যেসব সত্যকার মহাকাব্য—যথা মহাভারত, ওল্ড্ টেসটামেন্ট, শাহ্‌নামা, ডিভাইন কমেডি—সেসবের পাশেই এর গৌরবময় আসর। ইলিয়াড, গ্রীক নাটক ও শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক গঠনের পরিচ্ছন্নতায় এসবের চাইতে হয়ত মহত্তর কিন্তু ভাবের বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় নয়।

তিরোধান

বার্ধক্য বলতে যা বোঝায় গ্যেটের জীবনে তা ঘটেনি বলা যায়। একেবারে শেষের দিকে দেহ যদিও বা সামান্য অপটু হয়েছিল কিন্তু তাঁর মনের তেজ বেড়ে গিয়েছিল যেন আরো বেশী। শুধু যে তাঁর পরলোকগমনের অল্প কয়েকমাস পূর্বে তিনি ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করেন তাই নয়, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের দুই প্রধান বৈজ্ঞানিক Cuvier ও Geoffroy St. Hilaire এর মধ্যে যে মতভেদ ঘটে তা তাঁর গভীর কৌতূহলের বিষয় হয়। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত তিনি রামধনু সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ বয়সে তাঁর প্রভাবময় মূর্তি যেন দেবরাজ জুপিটারের শোভা ধারণ করেছিল। ঔপন্যাসিক থ্যাকারে তাঁকে দেখেছিলেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে—তখন থ্যাকারে উনিশ বৎসরের যুবক—তিনি লিখেছেন, গ্যেটের চোখের অসামান্য দীপ্তির সামনে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এই শেষ বয়সে একদিন কবি বাগানে পায়চারি করছিলেন—তাঁর গায়ে ছিল দীর্ঘ নীল ওভারকোট, মাথায় নীল টুপি, হাত দুখানি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পেছনের দিকে রাখা—তাঁর মূর্তি দেখে এক বৃদ্ধ চাষী এমন অভিভূত হলো যে পথ ছেড়ে দাঁড়াবার কথা সে ভুলে গেল।

লুডভিগ তাঁর গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণরূপে ব্যবহার করেছেন গ্যেটের এই দুই লাইন:

আরো আরো ঊর্ধ্বে করবো আরোহণ,
আরো আরো দূরে করবো দৃষ্টিপাত।

সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর উদ্ধৃত গ্যেটের শেষ বয়সের এই সব উক্তি:

বন্ধুদের সম্বন্ধে:

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে নেই…যাদের কাছে অন্তর্বিকাশের অর্থ আছে তারা এমন দেখা-সাক্ষাৎ থেকে দূরে থাকুক, কেননা মতের অসঙ্গতি শুধু আনে অস্বস্তি আর পূর্বের স্মৃতি হয় আচ্ছন্ন।

বিপক্ষদলের সম্বন্ধে:

ওদের রুগ্‌ণ নাক উঁচিয়ে ওরা খুঁৎখুঁৎ করছে
যে গান কাব্যলক্ষ্মীর দান তার চারপাশে,
বেচারা লেসিঙের মন ওরা দিয়েছিল বিষিয়ে—
আরাম করছেন তিনি গোরে,
কিন্তু আমাকে—মাভৈঃ!

ভবিষ্যতের মানুষের যৌথ-জীবন সম্পর্কে কবির শেষ বয়সের উক্তি এঃ •

পিঠ বুঝে চাপাও বোঝা
ভাবো সবার কথা—
বুড়োদের দাও সম্মান আর বিশ্রাম
যুবাকে দাও স্ত্রী আর কাজ,—
বাগানে বাগানে বেড়া দিয়ে হয়ো না বিচ্ছিন্ন,
সহযোগে
তৈরি কর তোমাদের কুটির,
সব প্রতিবেশী মিলে গড় বন্ধু-সমবায়।
থাকবে তোমাদের ভাল ভাল রাস্তা, তার পাশে
থাকবে সরাই, অবসর কালে সেখানে করবে স্ফূর্তি,
মাঠের প্রচুর ফসল
যোগাবে বিদেশীরও খাদ্য।
দেখছি তেমন রাজ্য সামনে,
চল যাই সে দেশে,
চল যাই পিতৃভূমিতে
ওগো নেতা, ওগো সাথীদল।

আমেরিকার উদ্দেশ্য লেখা তাঁর কবিতাটিও—এটিও তাঁর শেষ বয়সের লেখা—আমরা পল কেরাসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি :

আমেরিকা, তোমার জন্য আশা করি
ইয়োরোপের চাইতে প্রসন্নতর ভাগ্য।
নেই তোমাতে প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদ,
নেই তোমাতে তপ্ত আগ্নেয়গিরি।†

অতীত তোমার জন্য আনেনি বিঘ্ন :
তোমার বিপুল আধুনিক জীবনে
অস্বস্তি আনেনি বিফল প্রাচীন স্মৃতি,
বিফল প্রাচীন বিসম্বাদ।

সদ্ব্যবহার করে' চল বর্তমানের,
আর তোমার সন্তানরা যদি লেখে কাব্য
যেন সৌভাগ্য হয় তাদের
দস্যু যোদ্ধা আর প্রেতের কাহিনী না লেখা।

† তখন ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ছিল আমেরিকায় আগ্নেয় গিরির চিহ্ন নেই।

এই দুটি চতুষ্পদী তাঁর শেষ রচনা :

(বেটিনার পুত্রের খাতায় লেখা)
যদি প্রত্যেকে ক'রে যেতে আপন আপন কাজ
তব শহর রক্ষা পেত কুৎসা রটনা থেকে :
মুখে যা বলা হয় তাই যদি করা হতো কাজে
তবে সবারই হতো ভাল।

(তরুণ কবিদের উদ্দেশ্যে লেখা)
হে তরুণ, রেখো মনে
—যখন হৃদয় মন উচ্ছ্বসিত—
কল্পনাদেবী সুন্দরী সঙ্গিনী বটেন
কিন্তু অক্ষম তিনি পথ-নির্দেশে।

বৃদ্ধ বয়সে গ্যেটে সমস্ত ইয়োরোপের পূজা লাভ করেন—ভাইমার এক আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক তীর্থে পরিণত হয়। তাঁর দ্ব্যশীতিতম জন্মদিনে কার্লাইল স্কট লকহার্ট ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁকে যে অভিনন্দন পাঠান লুইসের গ্রন্থে তা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার কয়েকটি ছত্র এই :

আমাদের নগণ্য উপচার—হয়ত মানুষের প্রতি মানুষের অনাবিলতম নিবেদন—এখন আপনার সামনে, আপনি গ্রহণ করুন। এর প্রতি আপনার সমাদরে পরিব্যক্ত হোক আমাদের নিবিড় যোগ যদিও আমাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে সমুদ্র।

তাঁর এই জন্মদিনের উদ্দীপনা থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি তাঁর পৌত্রদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর চিরপ্রিয় ইলমেনাউ-নিবাসে গমন করেন। সেখানে দেওয়ালের গায়ে তাঁর নিজের হাতে লেখা ছিল তাঁর যৌবনের এই বিখ্যাত কবিতা :

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
ছড়িয়ে শান্তি,—
গাছের মাথায় মাথায়,
—কান পেতে শোনো—
নেইক মর্মর।
পাখীরা ঘুমায় নীড়ে নীড়ে ;
আর নেই দেরী, এমনি
তুমিও করবে বিশ্রাম।

অজ্ঞাতসারে ডিউক কার্ল আউগুস্ট প্রমুখ তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল। কবিতাটির শেষ চরণ আবৃত্তি করে' তিনি বললেন:

হাঁ আর নেই দেরী, এম্‌নি তুমিও করবে বিশ্রাম।

কবির এই বিশ্রামের কাল অপ্রত্যাশিতভাবেই উপস্থিত হলো। ১৬ই মার্চ তারিখে (১৮৩২) তাঁর পৌত্র তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ করতে এসে দেখলে তিনি বিছানায় শুয়ে—তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে ব্যবস্থা করলেন এবং ১৭ তারিখে তিনি এত ভাল বোধ করলেন যে তাঁর সেক্রেটারিকে মুখে বলে এক দীর্ঘ পত্র লেখালেন। সবাই ভাবলো বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু ১৯ তারিখে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন—অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সেই অস্বস্তি কমে এল বটে কিন্তু তেমন ভাল তিনি আর বোধ করলেন না।

২২ তারিখে সকালে তাঁর ভৃত্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আজ মাসের কোন্ তারিখ? ভৃত্য উত্তর দিলে: ২২ তারিখ হুজুর। তিনি বললেন: তাহলে বসন্ত আরম্ভ হয়ে গেছে, হয়ত এর ফেলে সেরে উঠবো।

নয়টার পরে তাঁর বিছানার পাশের চেয়ারে তিনি বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর একটু ঘুম এলো। এর পর তাঁর সম্বিৎ আর তেমন ফিরে এলো না। এই অবস্থায় একবার তিনি বললেন: খড়খড়িগুলো খুলে দাও—আরো আলো আসুক।—এই তাঁর বিখ্যাত "আরো আলো" উক্তি।

তিনি কিছু কিছু ভুল বকে চললেন। বারোটার দিকে তিনি চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে শুলেন। সেবিকা মুখে তর্জনী স্থাপন করে' ইঙ্গিত করলেন কবি ঘুমিয়েছেন।

সেই ঘুম ভাঙবার নয়।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

গ্যেটে

গ্যেটে

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	৩০	কি	কিন্তু
৬৩	২২	এখন	এমন

২৮ পৃষ্ঠায় ১৮ ও ১৯ লাইনের মধ্যে বস্‌বে—দেখছি আমি তোমারই মতো

গোটের জন্ম ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে—জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। সে সময়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট ছিল এক বিশ্ব বন্দর।

ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহে বিদ্যাভ্যাস করেন। বালক-বয়সেই তাঁর অপূর্ব মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহে বিদ্যাভ্যাসের পরে তিনি যথাক্রমে লাইপৎসিগ ও স্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তখন থেকেই তাঁর পূর্ণ সাহিত্যিক জীবনেরও আরম্ভ, আর অচিরে তিনি "তরুণ ভেটরের দুঃখ" ও "গোৎস্ফোন বের্লিখিঙেন" লিখে ইয়োরোপময় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ফাউস্টও এই বয়সেই তাঁর হাতে রূপ লাভ করতে আরম্ভ করে।

ভাইমারের ডিউকের আমন্ত্রণে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাইমার দরবারে যোগদান করেন; কয়েক বৎসর পরে সেখানে প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন। যৌবনেই তিনি সাহিত্যের মতো বিজ্ঞানেও অনুরক্ত হন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ইতালিতে বাস করেন ও প্রাচীন গ্রীক ও ইতালীয় শিল্পকলা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ফরাসী-বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লব তাঁর গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তাঁর ফাউস্ট প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ৬০ বৎসর বয়সে আর ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ড রচনা শেষ হয় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বাশীতিতম জন্মদিনে। তিনি পরলোক গমন করেন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে।

ফাউস্ট ভিন্ন তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা হচ্ছে 'ইফিগেনিয়া' ও 'তাসসো' নাটক, 'ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার' উপন্যাস, 'হেরমান ও ডোরোতেয়া' ও 'প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান' কাব্য, আত্মচরিত, একেরমানের সোরেটের সঙ্গে আলাপ' আর 'প্রমেথেউস'-আদি খণ্ড কবিতা। তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তিনি শুধু কবি ও মনীষী নন, তাঁর জীবনের ঘটনাও পরম বৈচিত্র্যময়। তাঁর কোনো কোনো চরিতকার বলেছেন, তাঁর মহাগ্রন্থ ফাউস্টের চাইতেও বেশী মর্যাদা তাঁর জীবন-সাধনার।

রেনেসাঁসের 'বরফল' ইয়োরোপের নব মানবিকতার মহাসাধক এই গোটে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ইয়োরোপের কবিকুলগুরু আর জনৈক আধুনিক ইংরেজ সাহিত্যিক এঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

> আমরা সবাই গোটের শিষ্য তা আমরা জানি আর না-ই জানি, যে কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন। যাঁরা নৈতিক পদ্ধতির চাইতে কাম্য জ্ঞান করেন নৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে চান আন্তর্জাতিক সহযোগ, সাহিত্যে জীবনে রাজনীতিতে ও চিন্তায় স্বপ্নচারিতার চাইতে বেশী মর্যাদা দেন প্রয়োজনের অনুশীলনকে, তাঁরা এই একটি লোকের জীবন দৃষ্টান্ত ও রচনা থেকে—তাঁর দৈবাৎরচিত চিঠিপত্র ও বচন-কণিকাও এই সব রচনার অন্তর্ভুক্ত—অফুরন্ত প্রেরণা বীর্য ও আলোক লাভ করবেন।

ভারত-ভাগ্য-বিধাতার অপূর্ব দান রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য যে গোটেকে বুঝবার প্রয়োজন আছে এই গ্রন্থের পাঠকরা সেবিষয়ে অবহিত হবেন।